কবি অরুণ মিত্র

কবি অরুণ মিত্র

সম্পাদনা

শঙ্খ ঘোষ । অরুণ সেন

কবি অরুণ মিত্র সংবর্ধনা সমিতি

প্রথম প্রকাশ :
২০ ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
অশোক ভট্টাচার্য / শুভ বসু
কবি অরুণ মিত্র সংবর্ধনা সমিতি
পরিচয় । ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলকাতা ৯

মুদ্রক :
অরিজিৎ কুমার
টেক্‌নোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৬

বেঁধেছেন :
দীনেশ বিশ্বাস
বিশ্বাস বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্‌
১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন । কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিবেশক :
অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন । কলকাতা ৯

সূচি

১

২

৩

সূচনা

কোনো কোনো কবিতা আছে, পড়বার সঙ্গেসঙ্গেই পাঠককে যা আন্দোলিত করে তোলে, একজন থেকে আরেকজনের মুখে মুখে ফিরে অনায়াসে যা হয়ে ওঠে সকলের। কিন্তু আরেকরকম কবিতা আছে, যার বাইরের কোনো ঠমক নেই, জৌলুশ নেই, অর্ধমনস্ক পাঠককে কাছে টেনে নেবার মতো কোনো বড়রকমের আড়ম্বর নেই, আছে কেবল কথাবলার একটা মগ্ন স্রোত। একবার সেই স্রোতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলে যেন দরজার পর দরজা খুলে যেতে পারে আমাদের চৈতন্যের সামনে, অল্পে-অল্পে তখন আমাদের সমস্ত শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেইসব কবিতা, অনেকদিন ধরে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হল, ঘুমের দরজা ঠেলে, সেইরকমই এক কবিতার জগতে আমাদের নিয়ে চলেছেন অরুণ মিত্র।

'পঞ্চাশ বছর' কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ ঠিক হল না। কেননা কবিতাচর্চার সূচনাপর্বে বেশ কয়েক বছর জুড়ে, তাঁর কবিতায় ছিল মুহূর্তমধ্যে আলোড়িত হয়ে উঠবার মতো ওই প্রথম ধরনটাই। সে-আমলে যাঁরা তাঁর কবিতার অনুরাগী ছিলেন, তাঁদের সে-অনুরাগের টান ছিল প্রখরতায়, ঝংকারে, ঘোষণায়। 'লাল ইস্তাহার' বা 'কসাকের ডাক: ১৯৪২'-এর মতো কবিতার লাইন আজও তাঁদের সহজ স্মৃতিতে দুলে ওঠে, তাঁরা মনে করতে পারেন শম্ভু মিত্রের ভরাট আবৃত্তিতে সেসব কবিতা কতদূর উন্মুখ এবং আবিষ্ট করে তুলত সেদিনকার শ্রোতাদের। কবির সামনে, পাঠক আর শ্রোতার যেন কোনো প্রভেদ ছিল না সেদিন। কিন্তু অল্পস্থায়ী সেই প্রথম পর্বের পর যে ভিন্ন ধরনের কবিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এই কবি, অভ্যস্ত করে তুললেন বাংলা কবিতাকে, তাতে শ্রোতাকে হয়ে উঠতে হল অন্তর্নিবিষ্ট পাঠক। সে-কবিতা পড়বার জন্য দরকার যেন এক ভিন্নরকমের উচ্চারণ। সবার সামনে বাগ্মীর ধরনে নয়, যেন প্রায় স্বগতোক্তির মতো সেখানে কবি বলতে পারেন: 'বেরোবার সময় আমি বুকপকেটটাকে বাজাতে বাজাতে বলি এসব কিছু নয় নিজেকেই আমার বলা তবু শব্দগুলো আকাশ থেকে ফিরে আসে মাটি থেকে আবার লাফিয়ে ওঠে যেন মস্করা এ-স-ব—কি-ছু--ন-য়'! অরুণ মিত্রের কবিতাপড়া যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন এসব স্বগতোক্তি কীভাবে তাঁর স্বর থেকে হাতের মুদ্রা পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

প্রতিটি শব্দকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেন তিনি মূর্ত করে তোলেন তাঁর এই ইচ্ছে : 'তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উলটে দেয় তেমনি ক'রে উলটোও কথাগুলোকে তবেই তাদের উপর থরে থরে চারা জন্মাবে চোখ ছাপানো ফসল।'

কথাগুলিকে উলটে দেবার এই আয়োজনেই অরুণ মিত্রের কবিতার একটা বড় অংশ শুধু 'শব্দ' আর 'কথা'রই প্রসঙ্গ নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে। আমাদের চারপাশের শব্দগত মিথ্যাচারের মধ্য থেকে সত্যকে যখন ছুঁতে চান কোনো কবি, তখনো তো শব্দই তাঁর অবলম্বন। তাই শব্দ দিয়েই মুছে নিতে হবে শব্দের মিথ্যে। জীবনানন্দকে একদিন বলতে হয়েছিল যে, মানুষের অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে আমাদের কথা তো 'নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল'! আমাদের এই কবি, অরুণ মিত্র, তাঁকেও প্রায় তেমনি করেই বলতে হয়, ওপরের হলঘরে 'বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় / জড়াজড়ি করে ফুঁসে উঠে / দমবন্ধ শুয়ে পড়ছে মেঝেতে হাওয়া নেই...'। সবরকমের 'ধান্দাবাজি নাটুকেপনা বকবকানি অন্ধ ঘোরা ধাপ্পা ভাঙাগলা' থেকে সরিয়ে নেবার জন্য কথাগুলোকে তাদের অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নেবার অবিরাম আয়োজন করতে হয় তাঁকে। এই আয়োজনে, তাঁর কবিতায়, একদিকে যেমন ভেঙে যায় পরিচিত শব্দজোট, অন্যদিকে তেমনি মিলে যেতে থাকে অভিজ্ঞতার দূরতম আপাতবিপরীত প্রান্তগুলি। তখন তাঁর চায়ের টেবিলে পাহাড়ের কিনার ঝুলে পড়ে, বাতাসে পাষাণ হয়ে থাকে গান, আঁশ আঁশ সব আস্বাদ সোঁত হয়ে রাস্তায় ফেরে, কিংবা বাকলের গন্ধ মেখে কয়েকটা গলা রাস্তায় এসে পৌঁছয়। এমনকী 'শব্দ' বা 'কথা'কে নিয়েও যখন কথা বলেন এই কবি, তখন আমরা সেই 'শব্দ'কেও যেন প্রায় দেখতে পাই ছুঁতে পাই, যেন শব্দেরও হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা পৌঁছতে পারি তার কাছে।

এটা লক্ষ করবার বিষয় যে আমাদের আধুনিক কবিরা তাঁদের ভাবনার প্রধান পটভূমিতে রেখেছিলেন ইংরেজিমার্কিন কবিতাপড়ার অভিজ্ঞতাকে। আর সেই সূত্রেই আধুনিকতা তার মস্ত একটা ঝোঁক তৈরি করেছিল মেধায়, মননে, বুদ্ধিতে। অরুণ মিত্রের কবিতা আমাদের সরিয়ে নিতে চায় এর

আধিপত্য থেকে, আর বাংলা কবিতায় সেইখানেই হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব ভূমি। যুক্তির শাসন ভেঙে জীবনকে তিনি ছুঁতে চান তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে, কিংবা বলা যায়, অন্তঃশরীর দিয়ে। 'গর্জনের সামনে' দাঁড়িয়ে বুলার হাত ধরে তিনি তাই বলতে চান: 'আমরা বুঝেছি আমাদের যে বুদ্ধি আছে তা দিয়ে কোনো হিসেব মেলানো যায় না। আমরা তাই এইভাবেই বলি।' এভাবে বললে, কবি জানেন, সঙ্গে সঙ্গে তার সাড়া জাগে না, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। 'মাটি একটু তাতুক, জল ঝরে যাক / তখন শব্দগুলো গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে / তাদের সমস্ত কোণ স্পষ্ট ফুটবে' আর তখনই সবকিছু আমাদের 'বোধের' এলাকায় এসে যাবে। এই বোধের উৎসের দিকে যাবার ইন্দ্রিয়ময় অনেক প্রশ্রয় আছে বলেই তাঁর কাছে অন্তরঙ্গতর হয়ে আসে আধুনিক ফরাসি কবিতার জগৎ, স্যাঁ-ঝন্ পের্স বা র‍্যনে শার্-দের সুরিয়ালিস্ট জগৎ, যা 'বাস্তবের অনুলিপি' না হয়েও 'বাস্তবের সাক্ষ্য' দিতে চায়। আমাদের পরিচিত আরাগঁ বা এলুয়ারের কথাও যখন বলেন অরুণ মিত্র, তখন তিনি প্রধানত মনে রাখেন এঁদেরও সুরিয়ালিস্ট চারিত্র, দেখেন কীভাবে এলুয়ারের মতো কবি কথা বলেন 'ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে', কীভাবে 'প্রতিরোধ-আমলে সর্বজনীন চেতনার আলোয় নেমে এলেও হৃদয়ের অস্ফুট রহস্যের জগৎ থেকে বিচ্যুত' হন না তিনি। স্যাঁ-ঝন্ পের্সের কবিতার এই কথাটি আমাদের তিনি মনে করিয়ে দেন: 'কোন্ সবুজ বসন্তের উৎসবে এই আঙুল ধুতে হবে, বইপত্রের তাকের ধুলোয় কলঙ্কিত এই আঙুল', আর ওইসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সমধর্মী এই কবিরও প্রায় অনুরূপ উচ্চারণ: 'বইয়ের অক্ষরগুলো শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়েই দিল। তারা আমার কাকুতিমিনতি শুনতে পেয়েছিল!'

অবশ্য, বইপত্রের শুকনো থাবা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া কিংবা যুক্তির শাসন ভাঙা—এর মানে ইতিহাসকে এড়িয়ে যাওয়া নয়। বরং ইতিহাসকে তার অন্তস্তলে ধরতে চাইবারই চেষ্টা থেকে অরুণ মিত্র পৌঁছতে চান যুক্তির বাইরে। তাঁর প্রিয় কবি স্যাঁ-ঝন্ পের্সের কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে একই বিষয় একই শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ, কিন্তু তাঁকে বেষ্টন করে থাকে 'বস্তুর সাগর', তাঁর সমস্ত ঝোঁক থাকে মানুষের উপর। অরুণ মিত্রও পৌঁছতে চান সেখানে, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বিশেষ-কোনো ঘটনাকে

প্রত্যক্ষে না রেখেও তার তপ্ত শ্বাসটুকু অনুভব করা যায়। আর সেই শ্বাসের মধ্যেই আছে ঘটনার মূল সত্য। কোনো সময়ের কথা কোনো ঘটনার কথা তেমনভাবে আসে না তাঁর পরিণত কবিতায়, কিন্তু যে-সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, তার অলক্ষ্য এক অগ্নিবলয় সবসময়েই থেকে যায় এর চার-পাশে। তার ফলে কখনো যদি কোনো জাহান্নামের সীমায় এসে ঝুঁকে পড়তে হয় তাঁকে, অযান্ত্রিক সরলতায় তিনি বলতে পারেন সেই সর্বনাশের কথা, বলতে পারেন : 'আমার গলায় বসছে জঙ্গলের নখ'। কিন্তু সেইখানেই যে শেষ নয় তাও তিনি জানেন। 'তাপ ছেঁকে ছেঁকে আলোর ছোপ' আপাদমস্তক মেখে তিনি দাঁড়ান অন্ধকারের সামনে, তিনি জানেন যে অফুরন্ত জীবনের বাঁকে বাঁকে নতুন উদ্যম নিয়ে বারেবারেই চলতে হবে তাঁকে, তাঁর সময়ের ইতিহাসকে, হাওয়া থেকে রস টেনে নিতে নিতে বলতে হবে ভবিষ্যতের কথা : 'এ কেমন ছোঁয়া একদিন আমি দেখাব, দেখাবই।'

সেই অরুণ মিত্রের এখন সাতাত্তর বছর বয়স। আজও তাঁর যে-কোনো নতুন কবিতা একটা সজীব আভা নিয়ে আমাদের সামনে এসে পৌঁছয়, কখনো সেখানে মনে হয় না যে অভ্যাসবশে নিছক কোনো পুরনো কথার অনুবর্তন করছেন কবি। তাঁর এতদিনকার সৃষ্টি তাই আমাদের ইতিহাসেরই গর্ব হয়ে থাকে। সেই গর্বের স্মারক হিসেবে তাঁর অনুরাগী পাঠকেরা তাঁকে সমবেত সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন বলে সকলে মিলে তৈরি হয়েছিল এক সংবর্ধনা-সমিতি, এরই উপলক্ষে এই বইটির প্রকাশ। বইয়ের প্রবন্ধগুলি কোনো অনুপুঙ্খময় বিশ্লেষণের ইচ্ছে নিয়ে লেখা হয় নি, এ কেবল কবির প্রতি তাঁর পাঠকদের ভালোবাসার কিছু চিহ্ন। সেই ভালোবাসায়, লেখকেরা খুবই অল্পসময়ের মধ্যে লিখে দিয়েছেন তাঁদের প্রবন্ধগুলি।

মাত্র পনেরো দিনে বইটি ছেপে দিলেন টেক্‌নোপ্রিন্টের অরিজিৎ কুমার। তাঁকে আর তাঁর প্রেসের সমস্ত কর্মীকে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। স্বযাচিতভাবে এইকটা দিন আমাদের অনুক্ষণ সাহায্য করেছেন তারাপদ আচার্য, সুব্রত রুদ্র, সব্যসাচী দেব এবং স্বপন মজুমদার। বইয়ের মধ্যে অরুণ মিত্রের যে ছবিটি রইল, সেটি তুলেছেন বাংলাদেশের নাসির আলী মামুন। এঁরা সকলেই আমাদের আপনজন।

শঙ্খ ঘোষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

—

বয়স যাঁকে ছুঁতে পারে নি

১৯৩৮ সাল।

সন তারিখ আমার মনে থাকার কথা নয়। স্মৃতিশক্তি আমি খুইয়েছি বছর এগারো বয়সে টাইফয়েড হওয়ার পর থেকেই।

এক্ষেত্রে সালটা মনে থাকার কারণ আমার একটি কবিতা 'চীন : ১৯৩৮'।

আমি তখন গদ্যে হাতে-খড়ির পর গদ্য ছেড়ে পদ্যের দিকে ঝুঁকেছি। তাও অনেক কষ্টে। অন্যের প্ররোচনায়। তারা চাইছিল আমি যেন আরেক কাঠি ওপরে উঠি। শুধু লেখক নয়, আমি যাতে কবি হই। আরও একটা দ্বন্দ্ব ছিল লেখা-না-লেখার। আগে দেশের স্বাধীনতা, পরে লেখালেখি।

ডাকে-পাঠানো লেখাগুলো অমনোনীত হতে হতে যখন একটা-দুটো সবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে মনোনীতের কোঠায় উঠেছে, ঠিক সেই সময় শারদীয়া সংখ্যা 'আনন্দবাজার'-এর কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট এল : আমার 'চীন : ১৯৩৮' ওঁদের ভালো লেগেছে। একবার যেন দেখা করি। নীচে স্বাক্ষর : 'অরুণ মিত্র'।

'আনন্দবাজার'-এর পুজো আর দোল -সংখ্যায় সে-সময় যেসব আধুনিক কবিতা থাকত তার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হত অরুণ মিত্র, সত্যশান্তি ঘোষাল আর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। সেসব কবিতায় থাকত টান-টান জোরালো ভাব। বেশি জোর থাকত বলবার কথায়।

পরে জেনেছিলাম আমাদের অনেক আগেই অরুণ মিত্র কমিউনিস্ট হয়েছিলেন।

তাঁর সেই চিঠি হাতে নিয়ে বড়বাজারে তখনকার 'আনন্দবাজার'-এর পুরনো আপিসে অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

অরুণবাবু তখন 'আনন্দবাজার'-এর বার্তা-সম্পাদক। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ সান্যাল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার—এঁরা সবাই তখন একই বাড়িতে কাজ করেন।

তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'রও অন্য চেহারা। সাদরে ছাপা হয় হীরেন মুখার্জির বক্তৃতা, চীন-সোভিয়েট বিষয়ে বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ। ভিন্নমতাবলম্বীরা তখন একই চায়ের আড্ডায় বসে চুলচেরা তর্কে মাতলেও তাতে পরস্পরের ভাব চটে যেত না।

প্রথম দর্শনেই অরুণবাবুকে আমার ভালো লেগে গেল।

ওঁরা তখন আছেন পূর্ণ থিয়েটারের কাছে এক অসম্পূর্ণ নতুন বাসায়। তার অল্পদিন পরেই ওঁরা উঠে আসেন সদানন্দ রোডে।

কাগজের কাজ। কাজেই যেতে হয় বেলায়। সেই থেকে আমাদের সকালের আড্ডা স্যাঙ্গুভ্যালি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে উঠে এল অরুণবাবুদের একতলার ছোট্ট ঘরে।

বাড়ির কর্তা অকৃতদার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। দরকার হলে আমাদের কাউকে ওপরে ডেকে পাঠানো ছাড়া উনি কদাচিৎ নীচের ঘরে ঢুঁ মারতেন। অরুণবাবুর স্ত্রী শান্তিদি সত্যেনবাবুর ভাগ্নী। অরুণবাবু ওঁর ছেলের মতো। সত্যেনবাবু অত বড় ছেলেকে যখন খোকা বলে ডাকতেন আমরা মজা পেতাম। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন সত্যেনবাবুর আরেক বোনের ছেলে।

আমি আর রমাকৃষ্ণ মৈত্র, আমরা তখন আশুতোষে আই-এ পড়ি। হেমন্ত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিঙে। গানের জগতে ডুবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হেমন্তও ছিল এই আড্ডায় আমাদের নিত্য সহচর।

গোগোল তখন শান্তিদির কোলে। শৈশবে ওর চোখের মণি ছিল নীল। কী সুন্দর দেখতে ছিল বলার নয়। মেয়ে টুম্পু হয়েছিল ক-বছর পরে।

এইভাবে হুস্ করে কেটে গিয়েছিল দশটা বছর।

সকালে সদানন্দ রোড। সন্ধেবেলায় কবিতা-ভবন। রাজনীতির ব্যস্ততায় সন্ধের আড্ডায় ক্রমশ ডুমুরের ফুল হতে হল।

বিষ্ণু দে-র বাড়ির আড্ডাতেও কমবেশি যেতাম। তখন সমর সেন থাকতেন ঠিক পাশের বাড়িতে। ক্রমশ সে-পাটও উঠে গেল।

একমাত্র অরুণবাবুর বাড়িতেই বয়স, পড়াশুনো কিংবা কুলশীলের কোনো বাধা ছিল না। শান্তিদির আনুকূল্যে বাড়ির হেঁসেলেও ছিল আমাদের অবাধ প্রবেশ। এমনকী সমীহ করে যাঁকে এড়িয়ে চলতাম, সেই সত্যেনবাবুও মাঝেমধ্যে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিয়ার খেতে খেতে হেসে এটাওটা জিগ্যেস করতেন।

এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা আমাদের কাকা বলেই ডাকতে শিখেছিল—নামের শেষে বাবু যোগ করে নয়। অতটা না হলেও, কবিতা-ভবনেও আমরা ছোটদের কাছ থেকে সেই আত্মীয়তার সম্ভাষণ পেয়েছি।

অরুণবাবুর নিকটসান্নিধ্যে প্রথম যৌবনের একটানা দশটা বছর কেটে গিয়েছিল। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগে উত্তাল পুরো একটি দশক।

যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। হিটলারের বাহিনী সোভিয়েটে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। অরুণ মিত্র তখন 'আনন্দবাজার'-এ যুদ্ধের খবর দেখাশুনো করেন। ঘাবড়ে গেলেই ওঁর কাছে চলে যাই। অরুণবাবু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বোঝান। হিটলারের জার্মানি যে হারবেই এ বিষয়ে তাঁর ধারণার কখনো নড়চড় হয় নি। যুদ্ধের কূটকৌশল না বুঝলেও ওঁর কথায় আশ্বাস পেতাম। অরুণবাবু বুঝতেন যুক্তি দিয়ে। সোভিয়েটের প্রতি অচলা ভক্তিতে নিজেকে আমি বুঝ দিতাম।

নতুন কিছু লিখলে কিংবা নিজের কবিতা ইংরিজিতে অনুবাদ করলে অরুণবাবু পড়ে শোনাতেন। শুনে মুগ্ধ হওয়ার মতোই ছিল ওঁর পড়া। বাংলা-ইংরিজি দুটোই।

লিখতেন খুবই কম। লেখা নিয়ে খুব একটা বলতেও চাইতেন না। লেখকমহলে খুব একটা ঘেঁসতেনও না।

সাহিত্যে কোনো গোষ্ঠীভুক্ত না হওয়ায় যে নামযশ, যে ইনাম-পশার ওঁর পাওয়ার ছিল, তা উনি পান নি। অবশ্য তা নিয়ে খেদ করবার পাত্র

উনি নন। গোষ্ঠীতে থাকা মানেই নিজেদের ওঠানো আর অন্যদের পাকে-প্রকারে নামানো। তাতে রুচি ছিল না বলেই অরুণ মিত্র সাহিত্যে কখনও কোনো দলে থাকেন নি। তাছাড়া পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে কবেই বা উনি চেয়েছেন!

অগ্রজ বড়-কবিদের মধ্যে এই একজনকেই দেখেছি যিনি আমাদের সমতলে এসে আপনজনের মতো মিশে যেতে পেরেছেন। আমাদের শ্রদ্ধা পেতে তাঁকে কোনো কৃত্রিমতার আড়াল নিতে হয় নি।

চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধের কথা মনে পড়ে।

রাত্রে মিটিং সেরে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে আমরা দক্ষিণের লোকেরা গান গাইতে গাইতে ফিরতাম। আমাদের উচ্ছ্বাসটা নিশ্চয় ছিল ছোঁয়াচে। নইলে আমার মতো কারো কারো গলা বেসুরো হলেও সহযাত্রীরা কেউ কখনো কানে আঙুল দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। 'অরণি' নিয়ে তখন হাজার ব্যস্ত হলেও আমাদের সেই গানমুখর ট্রামযাত্রায় অরুণ মিত্র ছিলেন আমাদের নিত্যসঙ্গী।

তারপর কলকাতাকে কানা করে দিয়ে অরুণ মিত্র হঠাৎ একদিন পাড়ি দিলেন ফরাসিদেশে।

কিছুদিন কী যে ফাঁকাফাঁকা লেগেছিল বলার নয়। মাঝেমাঝে শান্তিদির কাছে যেতাম। প্যারিস থেকে আসত অরুণবাবুর মজা করে লেখা চিঠি। শান্তিদি পড়ে শোনাতেন।

তারপর তো আমি চলে গেলাম জেলে।

অরুণবাবুও ফিরে এলেন। আমিও জেল থেকে বেরলাম।

আমার বিয়ের খবর পাঁচকান হওয়ার আগে শান্তিদি আর অরুণবাবুই প্রথম জেনেছিলেন।

গীতার প্রশংসা করে অরুণবাবু বলেছিলেন, কী ভালো রান্নার হাত ওর। প্যারিসে যা মাছ রাঁধত!

তারপর কলকাতার মায়া কাটিয়ে অরুণবাবুরাও এখানকার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন এলাহাবাদ, আমরাও চলে গেলাম বজবজে।

অরুণবাবুর জীবনের ধারা এবার আমূল বদলে গেল।

আর সাংবাদিকতা নয়। না দৈনিকের, না সাপ্তাহিকের। একবার যারা কাগজে কাজ করেছে, তারা জানে এর কী নাছোড়বান্দা নেশা। তাছাড়া কলকাতা নিজেই কি কম নেশার এক বস্তু ?

প্রায় মাঝবয়সে এসে পেশাবদল কম কথা নয়।

দৈনিক 'আনন্দবাজার'-এর নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে কপাল ঠুকে টালমাটাল ঝড়ে সাপ্তাহিক 'অরণি'র হাল ধরা, তারপর বউ ছেলেমেয়ে ফেলে অধ্যবসায়ী ছাত্রের মতো বিদেশে গিয়ে পি-এইচ. ডি. করা, ফিরে এসে ডেরাডাণ্ডা তুলে দিয়ে এলাহাবাদে প্রবাসযাপন—কঠিন ধাতুর মানুষ না হলে এই পালাবদল সকলের সয় না।

এলাহাবাদে চলে গেলেও চিঠিপত্রে আমাদের যোগ থেকে গিয়েছিল।

কলকাতা ছেড়ে থাকার ফলে একটা মন-কেমন-করা হুতুশে ভাব গোড়ার দিকের চিঠিতে যতটা স্পষ্ট ছিল, পরে অনেকখানি তা কেটে গিয়েছিল। কেননা পুরনো আড্ডার লোকেরাও তো ততদিনে অনেকটা ছত্রভঙ্গ।

একবার এলাহাবাদে অরুণবাবুদের বাড়িতে গিয়ে থাকার ফলে টের পেয়েছিলাম স্থানীয় মানুষজনদের সঙ্গে কীভাবে ওঁর আত্মিক একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

তবু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পাট চুকিয়ে কলকাতায় ওঁর ঘরে ফেরাটাই হয়েছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের।

কিন্তু কোন কলকাতা ? এক শহরে থেকেও আমরা সবাই আজ আলাদা আলাদা এলাকায় বিচ্ছিন্ন। বাড়ি থেকে বেরিয়েও বাসস্টপ থেকে ফিরে আসতে হয়। প্রার্থিত বাস হয় নেই, না হয় পাদানিতে ভিড়ের চাপে রাস্তায় ছিটকে পড়তে হয়।

মেঘে মেঘে বেলাও তো হল।

হয় নি অরুণ মিত্রের। কলকাতায় ফিরে তাঁর কবিতার ফোয়ারা দেখে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয় যে, বড় জাতের কবিদের বয়স কখনও ছুঁতে পারে না।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

—

সমানে হেঁটে চলেছেন

আমি যখন কলেজের ছাত্র (১৯৩৮-৪২) তখন আমাদের যশোরের তিন ব্যক্তি, বলা যায় তিন 'মিত্র'—শচীন্দ্রনাথ, সুকুমার ও অরুণ 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা কলেজের অথবা আমাদের অঞ্চলের নানা খবর তাঁদের কাছে লিখে পাঠাতাম, ওই দুটি কাগজে প্রকাশ করবার জন্য। অবশ্য অরুণবাবুর নাম সাংবাদিক রূপে নয়, 'কবি' হিশেবেই প্রচারিত ছিল। বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা প্রকাশিত ও আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁর 'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?' কবিতাটি অনেকের মুখে মুখে ফিরত। ১৯৩৬ সালে প্রগতি-লেখকসঙ্ঘের লখনৌ-সম্মেলন ও পরে কলকাতা-সম্মেলন বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার এনেছিল। বামপন্থী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র. সমর সেন, অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় তরুণ সাহিত্যরসিক তথা প্রগতিশীলদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'আনন্দবাজার' থেকে পদত্যাগ করে চলে আসেন এবং 'অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁকে অর্থসাহায্য করেছিলেন আংশিক ভাবে নলিনীরঞ্জন সরকার ও একজন বাংলাভাষী অবাঙালি ভদ্রলোক। বউবাজার স্ট্রিটে 'অরণি'র আপিস, দোতলায়, একতলায় 'আর্থিক জগৎ'-এর। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাণিজ্য-পৃষ্ঠার সম্পাদক যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য এই 'আর্থিক জগৎ' চালাতেন, 'আনন্দবাজার' ছেড়ে দিয়ে। 'অরণি'র আপিস চালানো, লেখাসংগ্রহ, প্রেসে ছোটা, নানা প্রসঙ্গে লেখা, প্রুফদেখার

বেশির ভাগ কাজ একা চালাতেন অনিল কাঞ্জিলাল। আমি ১৯৪২ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'অরণি' আপিসে ওঠা-বসা করি। তখন এখানে ছোট একটি ঘরে বেশ বড় আড্ডা। সেই আড্ডায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গোস্বামী, সরোজ দত্ত আসতেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবীণ বন্ধুরাও আসতেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর মিত্র—অর্থাৎ 'যুগান্তর' পত্রিকার এঁরাও আসতেন। এই 'অরণি'তে সুকান্তর 'ক্ষুধা' নামের গল্পটি ছাপা হয়। সুকান্তকে তখন আমরা চোখে দেখি নি। সে একটি কবিতা নিয়ে এসেছিল, তখন সে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। সে পরিচয় দিতেই সবাই তাকে সমাদর করলেন। এমনি ছিল 'অরণি'র আড্ডা।

আমি এম. এ. পরীক্ষার পর (১৯৪৪) কিছুদিন 'আনন্দবাজার'-এ শিক্ষানবিশি করি। তখন ওই পত্রিকায় আমার পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন অরুণ মিত্র, গঙ্গাপদ বসু ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই আমাকে সহায়তা করতেন কাজ শিখতে। 'অরণি'তে আমার দু-তিনটি গল্প বার হয়। একদিন অরুণবাবু আমাকে বললেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়' অংশে গল্প লিখতে। লিখলাম, ছাপাও হল গল্পটি 'সৃষ্টি-রাজ্যেব'—বস্ত্রসংকট নিয়ে লেখা। অরুণবাবু পড়ে বললেন 'বড় অ্যাট্রোশাস্।' কথাটি ঠিক। কয়েকমাস চাকরির পরে শারীরিক কারণে 'আনন্দবাজার' থেকে চলে আসি এবং বিদ্যাসাগর কলেজে (সিউড়ি শাখা) যোগ দিই। তার কিছুকাল পরে দিগিনবাবুর চাকরি যায়, অরুণবাবু ও গঙ্গাপদবাবু চাকরি ছেড়ে দেন। অরুণবাবু তখন 'অরণি' দেখতেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতেই থাকতেন, সদানন্দ রোডে। তারপর অরুণবাবু ফ্রান্সে চলে যান স্কলারশিপ নিয়ে। অনেকদিন দেখা হয় না। পরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেবার পর মাঝেমাঝে দেখা হত। তখন ফরাসি কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে অরুণবাবুর কবিতার গঠন, ভাষা, চিত্রকল্প পালটে গেছে। সাধারণ পাঠক আর তাঁর কবিতাকে তেমন নিতে পারছে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে কবিতায় বক্তব্য বা ব্যঞ্জনা গূঢ় ও গভীর হয়েছে, প্রত্যয় রয়েছে। সময়ের সংকট অনুপস্থিত নেই, প্রকাশের রূপ ভিন্নতর হয়েছে।

সদাপ্রফুল্ল, স্মিত-আনন, উজ্জ্বল মুখশ্রী তাঁর শাদা চুলকে পরাস্ত করেছে। জীবনের প্রতি মৃত্যুহীন ভালোবাসায় তিনি সমানে হেঁটে চলেছেন। এখন মাঝেমাঝে দেখা হয়। একটি উপন্যাসও লিখে ফেলেছেন।

অরুণবাবু পরিচ্ছন্ন শাদা পাঞ্জাবি ও জহরকোট পরতেন। কখনো পান খেতে দেখি নি। সিগারেট খেতেন তবে তাও বেশিমাত্রায় নয়। আসলে তাঁর রুচিমান্ মনের পরিচয় তাঁর পোশাকে, চলাফেরায়, কথাবার্তায় ধরা পড়ত। তিনি বক্তৃতা দিতেন না, স্বল্প সতেজ কয়েকটি কথায় তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরতেন। কখনো নিজেকে কোনো ক্ষেত্রে কলহে কুৎসায় জড়ান নি। কিন্তু মন্তব্য করতেন, প্রয়োজন হলে, কঠোর ভাবে। একদিনের কথা মনে আছে। সেই ১৯৪৫ সালের গোড়ায়, কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ তখন প্রবল। কটূক্তি, অভদ্র ব্যবহার প্রশ্রয় পেত কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলে। পত্রিকার অফিসে এমন কয়েক ব্যক্তি তখন ছিলেন যাঁরা ওইসব কটূক্তির বাণ ছুঁড়ে একধরনের আনন্দ পেতেন। একদিন যখন এইসব সজোরে চলেছে, অরুণবাবু ধৈর্য রেখেই বললেন, 'দেখুন ওই ধরনের কথা বলে-বলে নিজেদের কেন নীচে নামাচ্ছেন? এর কি কোনো দরকার আছে?' পরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'স্পেন্ডার-এর সম্পাদিত "পোয়েমস্ অন স্পেন" বইটা বিনয় ঘোষের কাছে আছে, আপনি তো চাইছিলেন?' —যেন কিছুই হয় নি। ফল হল এই, কুৎসা-বিলাসীরা অচিরেই নিজেদের টেবিলে ফিরে গেলেন।

স্বমিতবাক্, সদালাপী, সৌজন্যপ্রতীক অথচ বিশ্বাসে কঠিন তিনিই বলতে পারেন, 'যেন রসনায় মম / সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম।' এই অরুণ মিত্রকে বন্ধুরূপে আমি গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে জানি।

যথার্থ সুধী অরুণবাবু দীর্ঘজীবী হোন, বাংলা কবিতার কণ্ঠ আরো অরুণান্বিত হোক।

অবন্তীকুমার সান্যাল

—

অরুণ মিত্র নামে মানুষটি

অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার কত দিনের পরিচয় ? আজ হিশেব করতে গিয়ে অবাক হচ্ছি, পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি ! সুদূর মফস্বল থেকে উনিশ শ একচল্লিশ সালে যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলাম. যে-কয়েকজন আধুনিক কবি সম্পর্কে মুগ্ধতা ছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন অরুণ মিত্র। তাঁর একটি কবিতার যে-শব্দগুলি আলোড়ন তুলেছিল সদ্যযৌবনে, কতকিছু ভুলে-যাওয়া, কতকিছু ভুলে-থাকা, প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর এই ব্যবধানেও, বার্ধক্যের মহলে ঢুকে পড়লেও, আজও সেই শব্দগুলি সরব হয়ে ওঠে যখন-তখন :

> প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
> লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
> ঝল্‌সাবে কাল জানো !

অরুণ মিত্র যশোবের লোক, সেই যশোরেরই শচীনদা তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে নিয়ে গিয়ে। একহারা গৌর-বর্ণের সুন্দর শালীন চেহারা, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। বুদ্ধিদীপ্ত সহাস্য দৃষ্টিতে বিপ্লবীর বাঁকানো ভুরুর চিহ্নমাত্র নেই। সঙ্গে ছিল আরেক অনুরাগী বন্ধু রবীন চৌধুরী, অবাক হয়ে ফিস-ফিস করে বলেছিল : অরুণ মিত্তির ?—'শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া / দেব্‌তারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো ?' —সেই অরুণ মিত্তির ?

তারপর অরুণ মিত্রের সঙ্গে পরিচয় গাঢ়তর হয়েছে নানা সূত্রে—তবে মুখ্যত 'অরণি' ও সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার), বিজনদার (বিজন ভট্টাচার্য আমাদের দেশের লোক, তখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্মী) সূত্রে ;

সত্যেনদার সদানন্দ রোডের বাড়িতে, 'অরণি'-র অফিসে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের ধর্মতলার চারতলায় অফিসবাড়িতে। সত্যেনদা 'আনন্দবাজার' ছেড়ে 'অরণি' শুরু করলেও অরুণ মিত্র 'আনন্দবাজার'-এর কাজ ছাড়েন নি, কিন্তু প্রায়ই বিকেলে সাক্ষাৎ মিলত 'অরণি'র আসরে। এই আসরেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের (অনামী) সঙ্গে, তাঁদের সকলেই আজ গত। বলতে গেলে, 'পরিচয়'-এর প্রথম দিন থেকেই তাঁদের সম্বোধন করেছি 'দাদা' বলে এবং শেষদিন পর্যন্ত সেটাই বহাল ছিল। কিন্তু কেন জানি না 'দাদা' বলতে পারি নি অরুণ মিত্রকে। তাঁর অতিমার্জিত অথচ হার্দ্য ব্যবহার এবং অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও ছিল একধরনের সম্ভ্রমজাগানো দূরত্ব, যা কাছে টানলেও, বয়সের অসমতা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ সম্পর্ককে 'তুমি'র পর্যায়ে নামায় নি। আমি আজও তাঁকে বলি 'অরুণবাবু', তিনিও বলেন 'আপনি'। আজ না-হয় আমার তেষট্টি, কিন্তু সেদিন আমার ছিল সতেরোর শেষ, আর তাঁর তিরিশ। ব্যাপারটা সেদিন একটা খটকা হয়েই ছিল মনের মধ্যে ; আজ কিন্তু তার অর্থ পরিষ্কার, যখন তাঁকে দেখি তৃতীয় প্রজন্মের কনিষ্ঠতমদের সঙ্গে আলাপচারী হতে। আসলে, অহম্মন্যতার সামান্যতম স্পর্শ থেকেও তাঁর মনটি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। প্রখর যুক্তিবাদী মানুষটি নিজের যুক্তির যাথার্থ্য যাচাইতে প্রত্যেকের যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের পার্থক্য করার মতো স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতারও তিনি ঊর্ধ্বে। কনিষ্ঠকে তিনি সমপর্যায়ের বয়স্কের সম্মান দেন। আমার সদ্যযৌবনের নিবিড় পরিচয়ের 'দাদা'দের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম।

আমরা কয়েকজন ছিলাম অরুণবাবুর কবিতার বিশেষ ভক্ত, কিন্তু সংখ্যায় বেশি নয়। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কঠিন নিটোল অব্যর্থ শব্দ-প্রয়োগে মুগ্ধ হতাম। অভিভূত হতাম তাঁর মিতভাষণের গভীর ব্যঞ্জনায়। কিন্তু আবার সেই সময়ে তাঁকে অসাধারণ জনপ্রিয়তা দিয়েছিল তাঁর সেই সরব চিৎকৃত 'কসাকের ডাক' কবিতাটি। তখনকার দিনে রাজনৈতিক সভার মাঝে কিংবা শেষে একটা রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কবিতা আবৃত্তির। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, ওয়েলিংটন স্কোয়ার কি মহম্মদ আলি পার্কে—যেখানেই

কমিউনিস্ট পার্টির সভা হোক—আবৃত্তি হত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি', নয়তো অরুণ মিত্রের 'কসাকের ডাক'। শম্ভু মিত্রের কম্বুকণ্ঠের 'কসাকের ডাক' আবৃত্তির রোমাঞ্চের ধারণাই করতে পারবে না এ প্রজন্মের কোনো কেউ। 'আজভের পিঠের উপরে / চাবুকের শিস শোনো'—পঙ্‌ক্তি দিয়ে শুরু কবিতাটি ক্লাইম্যাক্সে উঠে যখন থমকে দাঁড়াত সেই লাইনটিতে—'জনসাধারণ অসাধারণ'—তখন হাজার হাজার শ্রোতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যৌথ উত্তেজনার শরিক হয়ে বারংবার মনের মধ্যে ঢেউ তুলত মায়াকোভ্‌স্কির বিচ্ছিন্ন একটি লাইন: **'A song and a verse/Is a bomb and a banner'**।

অরুণবাবুর কবিতার মেজাজ পালটেছে 'প্রান্তরেখা' থেকে ধীরে ধীরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। তিনি হয়েছেন ক্রমশই অধিকতর মিতভাষী, নৈঃশব্দ্যের, আত্মমুখিনতার পরম অভিলাষী, যা তাঁর 'লাল ইস্তাহার' বা 'কসাকের ডাক' কবিতার বিপরীতধর্মী। তবু সেদিনের সেই রাজনীতিতপ্ত, সরব, কিছুটা 'নাইভ', জনতা-প্রিয় কবিতাগুলোর জন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই তাঁর। সেগুলো লেখার জন্যে দলীয় রাজনৈতিক নির্দেশ-নামাকে দায়ী করে কৈফিয়ত দেবার মতো মানসিকতা তাঁর নেই। 'লাল ইস্তাহাব' বা 'কসাকের ডাক'-এর কবি বললে এতটুকু বিব্রত বোধ করেন না। দুটোকেই তিনি স্থান দিয়েছেন তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে।

অরুণবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আটচল্লিশ সালের মাঝামাঝি। সিটি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছিলাম ছেচল্লিশ সালের ১৫ আগস্ট, পরদিন থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাতচল্লিশের এপ্রিলের শেষে চিঠি পেলাম চাকরি খতম। ব্রাহ্ম আচার্য অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, জুলাই মাসে নতুন করে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে, অর্থাৎ গ্রীষ্মের ছুটির দুমাসের বেতন ফাঁকি দেওয়া হবে এবং এটাই নাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রীতি। সেই সংকটের দিনে দুমাস বেকার! সত্যেনদা বললেন, খবরের কাগজে আয়। তিনি তখন 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক। প্রায়ান্ধ সত্যেনদার সম্পাদকীয়ের অনুলেখক হিশেবে যোগ দিলাম তাঁর পত্রিকায়। তারপর ১৫ আগস্টে স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু পরিবারের বাস্তু খোঁজার যন্ত্রণা, এবং

বছর না ঘুরতেই আটচল্লিশের মার্চে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি, সবকিছু ছত্রভঙ্গ—সে এক অদ্ভুত, অনিশ্চিত, অস্থির পরিস্থিতি। এরই মধ্যে পি-টি-আই রয়টারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের সংবাদসূত্রের প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত হল। সত্যেনদা বললেন, দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার বারোটা বাজল, আগের পেশায় ফিরে যাবার চেষ্টা করো। সত্যেনদা 'স্বরাজ' ছাড়লেন, 'গ্লোব এজেন্সি' খুললেন। কিন্তু কোথায় কলেজের চাকরি? পূর্ববঙ্গের কলেজগুলো থেকে দলে দলে প্রবীণ অধ্যাপকরা এসে কলকাতা ও আশে-পাশের কলেজে সামান্য বেতনে ঢুকছেন। (প্রসঙ্গক্রমে বলি, জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখি 'স্বরাজ' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য ক্রোড়পত্রের ভার-প্রাপ্ত সহ-সম্পাদক রূপে। তিনি পরে কোনো এক অখ্যাত কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন।) বহু চেষ্টায় কলেজের চাকরি জুটল বাংলার বাইরে, পরে পশ্চিমবঙ্গে মফস্বলের এক কলেজে এসে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে জানলাম অরুণ মিত্র সরবনে গিয়েছেন ফরাসি সাহিত্যে গবেষণা করতে। সেদিনও সাংস্কৃতিক জগতে অরুণ মিত্রের অতিরিক্ত সম্মান ছিল ফরাসি ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁর অধিকারের জন্যে। যতদূর মনে পড়ছে, 'প্রগতি'তে (যাতে 'লাল ইস্তাহার' ছাপা হয়েছিল) ছাপা আঁদ্রে জিদের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

অরুণবাবুর সঙ্গে আবার নতুন করে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল পঁচিশ বছর পরে। এই দীর্ঘকাল তিনিও ছিলেন এলাহাবাদে। জানতাম ড. অরুণ মিত্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। 'পরিচয়'-এ এবং অনিয়মিত এখানে-ওখানে ছাপা তাঁর লেখা হাতে এলেই সাগ্রহে পড়তাম, তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের খোঁজ রাখতাম, লক্ষ করতাম তাঁর কবিতার ঋতুবদলের প্রকৃতি। পঞ্চাশের শেষদিকে আচমকা একদিন দেখা হয়েছিল বিনয়দার যাদবপুরের বাসায়, সঙ্গে হাস্যময়ী শান্তিদি এবং টুসু। তারপর একেবারে চুয়াত্তরের মাঝামাঝি, যখন আবার কলকাতায় ডেরা বেঁধেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শ্রীমানী মার্কেটে সারস্বত লাইব্রেরিতে, সেখান থেকে ছাপা হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন তিনি পাকাপাকি কলকাতায়,

গোগোল আমেরিকায়, টুমুর বিয়ে হয়েছে, মেয়ে হয়েছে, বাসায় তাঁরা দুজন মাত্র। ঠিকানা দিলেন।

অরুণবাবুর নতুন সঙ্গলাভের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনাও যুক্ত হয়ে গেল। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় মন দিয়েছিলাম, বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পাশও করেছিলাম। কলকাতায় এসে দায়িত্ব নিয়েছিলাম রম্যাঁ রলাঁর 'ভারতবর্ষ' অনুবাদের দুরূহ কাজে। শুধু ভাষাজ্ঞানের জোরে বইটির অনুবাদ সম্ভব নয়। উনিশ শ পনেরো থেকে তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-জহরলাল-সুভাষচন্দ্র প্রমুখের সাক্ষাৎকার ও বহু বিতর্কিত (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সহ) বিষয়-সংক্রান্ত বিরাট গ্রন্থটির অজানা বহু প্রসঙ্গের পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেন তিনিই, ভাষা জেনেও যিনি সুদীর্ঘকাল রাজনীতিমনস্ক এবং সত্যিকারের পড়ুয়া লোক। এমনই একজন যাঁকে খুঁজছিলাম তিনি যে নিঃসন্দেহে অরুণ মিত্রই, এই ভেবে দারুণ উল্লসিত হয়েছিলাম।

পরদিনই হাজির হয়েছিলাম জামির লেনের বাসায়। একটা বড় বাড়ির তেতলার ছাদের একটা চিলেকোঠা. পাশে কাঠ-এ্যাসবেস্টসের নড়বড়ে একটা রান্না-কাম-ভাঁড়ার ঘর, বাথরুম দোতলায়। হাত দিয়ে সিলিং ছোঁয়া যায়. গ্রীষ্মের দুপুর যে কী দুঃসহ তা সহজেই অনুমান করা চলে। দেয়ালে লম্বা তাক বসিয়ে গাদাকরা বই। এখানেই থাকেন অরুণবাবু-শান্তিদি। কোনো কুণ্ঠা নেই, অভিযোগ নেই, অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কোনো তিক্ততা নেই। হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করলেন ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্র্য।

প্রথম দিনেই তাঁর বইয়ের তাকে আবিষ্কার করেছিলাম ফরাসি প্রতিরোধ যুগে গোপনে ছাপা এলসা ত্রিওলের 'মায়াকোভ্‌স্কি'। বললাম, এটা তাঁকে অনুবাদ করতে হবে বাংলায়। সেটা তিনি অনুবাদ করেছিলেন কিছু পরে, 'বিচিন্তা' নামের একটি পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল কিস্তিতে। বইয়ের আকারে ছাপার অনুমতি চেয়ে অরুণবাবু চিঠি লিখলেন আরাগঁকে, বহু দিন চলে গেল, কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। প্রকাশক বিনা অনুমতিতেই ছাপার ঝুঁকি নিতে রাজি, কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো গেল না অরুণ-

বাবুকে, সেটা তাঁর মূল্যবোধের পরিপন্থী। অবশেষে আমার এক ফরাসি বন্ধুর সাহায্যে আরাগঁ-এলসার পালিত পুত্রের কাছ থেকে অনুমতির ব্যবস্থার পর ছাপা সম্ভব হল বইটির। জামির লেন থেকে আমার পরিচয় শুরু মানুষ অরুণ মিত্রের সঙ্গে।

তিনি বাড়ি পালটালেন। এবার তিনতলার ছাদ থেকে একেবারে এক-তলায়। বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে, ভাতিয়া কারখানার রাস্তায় পুরনো একটা বাড়ির একতলায় একখানা মাঝারি ঘর, দেড় চিলতে বারান্দা, স্যাঁৎসেঁতে, আলোর অভাব। তারই মধ্যে গুছিয়ে বসেছেন, তাকে বই, লেখার ডেস্ক সাজিয়ে। বৃষ্টি হলে জল জমত জামির লেনের বাড়ির দরজায়, এখানে জল ঢোকে শোবার ঘরে। একবার প্রলয়বৃষ্টিতে কী হাল জানতে জল ভেঙে গিয়ে দেখি ঘর-বারান্দা জলে ডুবেছে। চৌকি আশ্রয়। হাসতে হাসতে শান্তিদি বললেন, রান্নাঘর তো দূরের কথা, বাথরুমেও জল ঢুকেছে, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ।

হন্যে হয়ে অরুণবাবু খুঁজছিলেন একটি ডেরা—কোনো সরকারি আবাসনে। পুরনো রাজনৈতিক সম্পর্কিত এক অধ্যাপক এম-এল-এ তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তারই জন্যে এ্যাসেমব্লি হাউসে তাঁকে যেতে দেখেছি নিজের চোখে। কিন্তু সবই ধোঁকা। (এমন ধোঁকায় পড়ে দিনের পর দিন বৃথাই ঘুরতে দেখেছি আশি-উত্তীর্ণ রাধারমণ মিত্রকেও।) অবশেষে শিকে ছিঁড়ল অরুণবাবুর ভাগ্যে। তিলজলার কুষ্টিয়া হাউজিং এস্টেটের দোতলায় পেলেন নিম্নতম-আয়গোষ্ঠীর জন্যে বরাদ্দ ব্যারাকে একটি দেড় কামরার ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাট, তার পরিবেশের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রায় দশ বছরে অরুণবাবুর গুণমুগ্ধ জনদের মধ্যে সেখানে যান নি এমন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। বিদেশি দূতাবাসের ঝকমকে গাড়িও তিলজলার সেই পরিবেশে ঢোকে, বিদেশি অতিথি সেই অপরিসর ঘরে বসে আলাপ-চারী হন। ওখানেই রেডিও, টি-ভি-র সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আসেন। রুগ্ণা শান্তিদি কম্পিত হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দেন (একদা শান্তিদি যে ভালো ছোটগল্প লিখতেন তা হয়তো ভুলেই গেছেন)। কিছুদিন আগে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় অরুণবাবু তাঁর এই ফ্ল্যাটপ্রাপ্তি এবং পরিবেশের বিবরণ ও বর্ণনা দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায়।

তখন তিনি আমার নিকট-প্রতিবাসী। তাই প্রায় সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর আসরে আমার উপস্থিতি ছিল অবধারিত (রবিবারের সকালটা বরাদ্দ ছিল নির্মাল্য বাগচীর সাহচর্যের জন্যে)। এই পর্বে তাঁকে জেনেছি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে। আমাকে বিস্মিত ও প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে তাঁর জ্ঞানের পরিধি, জ্ঞানের বিচিত্র দিক সম্পর্কে অফুরন্ত কৌতূহল। খাঁটি কবি হয়েও তাঁর মানসিকতা যুক্তিপ্রবণ, আবার একদিক থেকে খাঁটি 'অ্যাকাডেমিক'; যুক্তিকে তিনি দাঁড় করান তথ্যের ভিত্তির উপরে। জাগতিক কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো অনীহা চোখে পড়বে না, যতদূর সম্ভব সাংসারিক কর্তব্য (বাজার-করা, রেশন আনা, ইলেকট্রিক মেরামতি) নিজেই করেন। প্রখর তাঁর আত্মসম্মান বোধ ; চিন্তায়, বুদ্ধিতে, কথায় বা চলনে জরার চিহ্নমাত্র নেই। জীবনযাপনের প্রাত্যহিক তিক্ততাকে পরিহাসরসের মাধুর্যে সহনীয় করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁদের দুজনের।

অরুণবাবু রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন। ইন্দো-জি. ডি. আর. মৈত্রী সমিতি ও তাঁর অনুরাগীদের উদ্যোগে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল, ড. নীহাররঞ্জন রায় সানন্দে তার সভাপতিত্ব করলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, যে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে তিনি একদা কাজ করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের কী নীরব উদাসীনতা তাঁর সম্পর্কে !

যে-কোনো দিন সকালে কি সন্ধ্যায় যে-কেউ তাঁর বাসায় গেলে দেখতে পাবেন তিনি লিখছেন, লিখে চলেছেন—কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণা। তিনি লিখেছেন সার্ত্র্ সম্পর্কে, আরাগঁ সম্পর্কে, অনুবাদ করেছেন প্রাচীন ও আধুনিক ফরাসি কবিতা, এল্যুয়ারের কবিতা, সম্প্রতি করেছেন ভিক্তর উগোর মূল্যায়ন। বাংলায় ফরাসি সাহিত্যের এমন পরিবেশন তাঁর মতো আর কি কেউ করেছেন ? তাঁর কবিতা কিংবা গদ্য যে চায় সে-ই পায়। কবি-যশঃপ্রার্থী মফস্বলের তরুণদের প্রতি তাঁর অগাধ মমতা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বারুইপুর বা চাংড়িপোতার কবিসম্মেলনে হাজির হতেও তিনি গররাজি হন নি।

ছেচল্লিশ বছর আগে পরিচিত সদ্যযৌবনের সেই শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজদের মধ্যে প্রায় কেউ আর এ জগতে নেই। যে কয়েকজন এখনো আছেন

তাঁদের অনেকের প্রতিই শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। শ্রদ্ধাস্পদের বিবেক অপরিচ্ছন্ন হলে তা বড়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু অসাধারণ ব্যতিক্রম অরুণ মিত্র। তাঁকে দেখলে, তাঁর সঙ্গে কথা বললে, মনে হয়, মানুষের মনের একটা কিছু গুণ আছে যাকে আয়ত্ত করলে অচরিতার্থতার ক্ষোভ থেকে মুক্ত থাকা যায়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির উদ্‌বেগ শান্ত হয়, পরিবেশের কুশ্রীতা উপেক্ষা করা যায় রুচি ও বৈদগ্ধ্যের অনুশীলনে। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ যে আত্মসম্মান এবং পরিচ্ছন্ন বিবেক, এই সত্যটি উপলব্ধি করেছি তাঁর আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী, এই কারণে। তাঁর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন আমার পক্ষে তাই সহজসাধ্য নয়। কবি অরুণ মিত্র, ড. অরুণ মিত্র আর প্রাত্যহিক জীবনযাপনকারী অরুণ মিত্র নামে মানুষটি আমার চোখে একাকার।

२

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

পাথর জল রাত্রি রৌদ্র

কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না।
কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না,
কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে
এক অনমনীয় পাথরে ॥

'নির্ভর', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'

অরুণ মিত্রের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি। তখন তাঁর 'প্রান্তরেখা' কাব্যগ্রন্থটি সবে বেরিয়েছে। বৌবাজারে তখন 'অরণি' অফিস। সেটাও ছিল বইটির বিক্রয়কেন্দ্র। সেখানে গিয়েছিলাম বইটি কিনতে। আমি বোধহয় বইটির প্রথম ক্রেতাদের একজন। প্রচ্ছদে কোনো ছবি নেই; নিরাভরণ অক্ষরসজ্জা; নামটুকু মাত্র। এমনকী শক্ত মলাটও নয়—যুদ্ধের সময়ের কাগজ। যাঁরা বইখানি আমার হাতে দিলেন তাঁরা অনেকবার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। সুকান্ত পড়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। একজন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-কবিকে যা যা পরামর্শ দেওয়া তাঁরা সমীচীন জ্ঞান করেছিলেন, সবই তাঁরা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মাথায় ধাক্কাচ্ছিল একটা আশ্চর্য সনেটের শেষ পঙ্‌ক্তি 'হে হৃদয় মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে'। অনেকদিন বইটি আমার সঙ্গী ছিল। তার 'দিবসে ঘুমানো রাতজাগা পাখি সারা রাজ্যের যত' আমাকেও জ্বালাত। 'কসাক-১৯৪২' ঢেউ তুলত। অরুণ মিত্রকে আমি তখনো চিনতাম না। রিপনে পড়ি। চোখে নিত্য দেখছি বিষ্ণু দে-কে, বুদ্ধদেব বসুকে। ধারণা জন্মে গেছে কবিমাত্রেই সুপুরুষ।

'অরণি'তে কবিতা ছাপা হয়। বৌবাজার স্ট্রিটে যেতাম। তারপর 'অরণি' অফিস বেনেটোলা লেনে উঠে এল। সেখানেও কবিতা ছাপানোর তদ্‌বির করতে যেতাম। অরুণ মিত্রের সঙ্গে একবার দেখা হোক এটা অবশ্যই চাইতাম—'প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিবে / অস্থির দিন এসেছে বুঝি'—অবশেষে আমার অস্থির দিন শেষ হল। সেটা ১৯৪৭ সাল। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই সময় আমার নৈহাটির বাসায় একটা চিঠি পেলাম 'অরণি' পত্রিকা থেকে। চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল অরুণ মিত্রের। চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু চিঠির বয়ান আজও ভুলি নি। কেননা এই ছোট চিঠিখানি আমার নিয়তি। আমার ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল সে। অরুণ মিত্র ওই চিঠি মারফৎ আমাকে ডেকেছিলেন 'অরণি' পত্রিকায় নিয়মিত 'সাহিত্যসংবাদ' নামে একটি ফিচার লেখার জন্য। দুটো কাজ তখনো আমার করা হয় নি। এক, আমি এর আগে পর্যন্ত গদ্যে কিছু লিখি নি। যা লিখেছি তা পদ্য। আমার মনে হয়, পদ্যে আমার কিছু হবার নয় এটা যাঁরা প্রথম বুঝেছিলেন অরুণ মিত্র তাঁদের একজন। অথচ আমার সাহিত্যবাতিক যাবার নয়, তাই অরুণ মিত্র আমাকে পাকাপোক্ত ঠিকানা দেখিয়ে দিলেন। দুই, অরুণ মিত্রকে আমি তখনো দেখি নি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবার পথে ট্রাম থেকে একদিন শীতের দুপুরে নেমে পড়লাম বেনেটোলা লেনের মোড়ে। কবি অরুণ মিত্র স্নিগ্ধ অভ্যর্থনায় আমাকে ডেকে নিলেন।

প্রথম আলাপেব শেষেই আমি উঠে গেলাম 'অরুণদা'তে. অরুণদা সহজ হয়ে নেমে এলেন 'তুমি'তে। দেখলাম স্বল্পবাক্‌ কিন্তু সুভাষী, ফরাসীয় বৈদগ্ধ্যে ভরপুর ব্যক্তিটি বিলিতি পোশাকে অথবা ধুতিপাঞ্জাবিতে সমান সুন্দর। শুরু হল আমার গদ্যকার জীবন। বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি অদৃশ্য হতাম। শুধু বৃহস্পতিবার ডুব দিতাম না. কারণ ওই দিন থাকত সুনীতিকুমার শ্রীকুমার শশিভূষণ সুকুমার সেনের ক্লাশ। এখানেই আজ আমার আসল কথাটি বলা দরকার। আমি যা দিয়ে করে খাচ্ছি তা শিখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু খেয়েদেয়ে যা করছি, যতটুকু করছি, তা শিখেছিলাম, অন্তত শিখতে শুরু করেছিলাম বেনেটোলা

লেনের সেই ম্লান ঘরটিতে, প্রেসের হরফসমুদ্রের তরঙ্গশব্দের মাঝে, অরুণ-দার কাছে। অত্যন্ত বিশ্রী চা—যাকে মনে মনে প্রায়শই বলতাম, তুমি আরেকটু উষ্ণ হতে পারো না—মাথার ওপর দুই ডানাওয়ালা মন্থর পুরনো পাখা, অরুণদা কথা বলতেন শান্ত অন্তরঙ্গতায়। চাপা হাসি অমলিন আলো ছড়াত। তার মধ্যে হয়তো পরিহাস থাকত, উপহাস থাকত না। অরুণদা আস্তে আস্তে আভাস দিলেন র‍্যাঁবোর কবিজীবনের। র‍্যাঁবো তখনো ফ্যাশান হয়ে ওঠেনি। খবর দিলেন এল্যুয়ারের, আরাগঁ-র ঠিক তখনকার কাব্যসন্ধির, সরাসরি ফরাসি থেকে আমার কাছে উঠে এল রোজার গারোদি-র সেই বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ব-ঘটিত প্রশ্ন, জানলাম লেনিন কবিতা লিখেছিলেন, তাঁর সেই একমাত্র ফরাসি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন অরুণদা। ছাপা হয়েছিল শারদীয় 'স্বাধীনতা'য়। ইংরেজি ফরাসি থেকে অনুবাদ করে আমায় শেখালেন কী করে কবিতার দিকে তাকাতে হয়, কী চাইতে হয় তার কাছে। ভেরকরের 'সমুদ্রের মৌন' শোনাতে গিয়ে অন্তর্গূঢ় নাটকের তাৎপর্য বুঝতে শিখলাম। বেনেটোলার 'অরণি' অফিসের কথা আজও কখনো কখনো মনে পড়ে। উত্তরদিকের চেয়ারটা ছিল প্রভাত-কুমার গোস্বামীর। সদাই পুষ্ট এবং ততোধিক হৃষ্ট প্রভাতকুমার সহাস্যে জানাতেন অরুণদার কবিতার মানে তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। সপ্রশ্রয় হাসিতে অরুণদা নীরব থাকতেন। কোনো কোনো দিন পাওয়া যেত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। অরুণদার আলাপ থেকে বুঝতাম বীরেনবাবুর জন্য তাঁর একটা প্রতীক্ষা থাকত। হঠাৎ এসে পড়তেন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য মজার মজার গল্প শোনাতেন। একদিন পেয়েছিলাম কমলকুমারকে। সে-বছর শারদীয় সংখ্যায় দুটি পত্রিকায় দুটি দারুণ কবিতা বেরিয়েছিল। একটি বিষ্ণু দে-র 'কঙ্কালীতলা'। অপরটি অরুণ মিত্রের 'বিদারণ'। যতদূর মনে পড়ছে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় বোধহয় ত্রৈমাসিক 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় শারদীয় কবিতা আলোচনার কালে কবিতা-দুটির কথা বলেছিলেন।

আমি ততদিনে অরুণ মিত্রের কবিস্বভাবটি খানিকটা বুঝতে পেরেছি। প্রথম যে ছাপটা আমার মনের মধ্যে পড়েছিল তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে—

ইনি আগের অথবা সমবয়সের অথবা পরবর্তী কোনো বাঙালি কবির মতো নন। এঁর একাকিত্ব এঁর অক্ষয় অভিজ্ঞান। সেটা সব ব্যাপারেই ধরা পড়ত। সুকান্তের মৃত্যুর পর অসামান্য কবিতা লিখেছিলেন কয়েকজন বাঙালি কবি। বিশেষ করে মনে পড়ছে বিমলচন্দ্র ঘোষ ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাদুটি। কিন্তু 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সুকান্ত সম্বন্ধে একটি অসামান্য গদ্যছাঁদে লেখা ভাবনাতরঙ্গ আমার মন থেকে আজও মুছে যায় নি। যে-কোনো ভাবনা অরুণ মিত্রের মধ্যে প্রবেশ করলে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এটাই বোধহয় অরুণ মিত্রের কবিপ্রকৃতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

অরুণ মিত্রের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়সাপেক্ষেই বোধহয় একটা কথা বলতে পারি, তিনি তাঁর কালের একমাত্র বাঙালি কবি, কবিতা ছাড়া আর কোনো মাধ্যমেই যিনি আত্মমোচন করেন নি। আমার ধারণা এটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এককালে তিনিও কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক ছিলেন, অথচ প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তাঁর আত্মমগ্নতার বাইরে পদার্পণ করেছেন একবার কি দুবার। তিনি যাত্রী বটে কিন্তু মিছিলের যাত্রী নন। অমিতাভ দাশগুপ্ত একবার বলেছিলেন, 'অরুণ মিত্র কবিচরিত্রে বরাবর অভিজাত।' আমি 'অভিজাত' শব্দটির পরিবর্তে 'স্বতন্ত্র' শব্দটি বসাতে চাই। অত্যন্ত সামাজিক ও সাময়িক আবেগসংঘাতের কালেও তিনি নিজের একান্ত ভাষায় বলেন। যদি তাঁর সকল কবিতার সাধর্ম্য বা স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের কোনো শিরোনামা রচনা করতেই হয় তাহলে তা হবে এই :

> কথাগুলোর একেবারেই ভার নেই। পাতার মর্মরে মিশে যেতে পারে। অথচ তারা কল্লোল নিয়ে আসে। অথচ তারা বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অথচ তারা ফুলফলকে নিশ্বাসের কাছে ধরে দেয়। পালকের মতো কথা, তার মধ্যে পৃথিবীর নড়াচড়ার শব্দ।
>
> 'দুই বছর', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'

এখানেই অরুণ মিত্রের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তাঁর কথারা বর্তমানের দর্পণ। কিন্তু সেই বর্তমানেই ত্রিকালের বেণীবন্ধন ঘটে। তাঁর ব্যবহৃত

শব্দগুলিতে নিজস্ব ধ্বনি ও অর্থের অনুষঙ্গকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলা তাঁর লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করেন না তথাকথিত সিন্‌ট্যাক্সের অনড়তায়। সেখানে তিনি যতিচিহ্নের আবশ্যিকতাও মানেন না! 'স্তব্ধ নয়' কবিতায় তিনি বলেন :

> বহু কালের জ্বলনে অক্ষরগুলো পোড়া-পোড়া হয়েছে এখন একটু উস্‌কে দিলেই তারা ছাই হয়ে উড়বে দখিনা বাতাসে ঝড়ে অন্ধকার হলে ভুতুড়ে ছোঁয়া আর একদম বোবা হঠাৎ কোনো ঝলকে চক-মকানো নয় শূন্যে লেপাপোঁছা। দাঁড়ি টানবার জায়গা এখানে ছিল কিন্তু কি করে টানি ?
>
> 'প্রথম পলি শেষ পাথর'

কথার পিঠের উপর কথা, স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত মেঘের মতো উপহাব দিচ্ছে কখনো বিদ্যুৎ, কখনো বৃষ্টিবিন্দু। অরুণ মিত্রের মগ্নচৈতন্য এভাবেই আমাদের হাতে তুলে দেয় এক নিভৃত প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার দান। 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো'—ধ্যানস্থ সজাগ অনুভূতি ছাড়া সবকিছুকে এমন স্পর্শগম্য প্রত্যক্ষতা দেওয়া যায় না। সে প্রত্যক্ষতা দ্রষ্টার প্রত্যক্ষতা নয়—ধ্যানস্থের। একজন আধুনিক মানুষ কতখানি ধ্যানলীন হতে পাবেন অরুণ মিত্রের কবিতা তার বিরল নিদর্শন। হয়তো তিনি জেনেছেন, ধ্যানলীন হওয়া ছাড়া সংকটসংকুল আধুনিক মানুষের কোনো পরিত্রাণ নেই, এবং আমরা স্মরণ রাখি যে 'ধ্যানলীনতা' আর 'আত্মলীনতা' এক কথা নয়। আত্মলীনতা একপ্রকার পলায়ন। কিন্তু ধ্যানলীনতা হল বিশ্বগ্রাহী হবার জন্য আসন গ্রহণ। অরুণ মিত্রের কবিপ্রকৃতি স্থিরভাবে হৃদয়ংগম করলেই একথা উপলব্ধি করা যায় যে, অরুণ মিত্র নির্জন কবি। জীবনানন্দের কথা স্মরণ করেও আমি বলব, অরুণ মিত্রের নির্জনতার মাত্রা আলাদা। জনতার মাঝখানে থেকেও জনতাকে উপেক্ষা না করেও অরুণ মিত্র জানেন কী করে নিভৃত হতে হয়। তাঁর সেই নির্জন ধ্যানলীনতায় বস্তুর স্বরূপ এবং অপরূপত্ব একসঙ্গে মিশে যায়। তখন তাঁর কবিতাগুলি হয়ে ওঠে বিচিত্র ছায়ায় শ্রেষ্ঠার্থে অদ্ভুত। সচেতন পাঠক এখানে নিশ্চয়ই ভাবছেন 'রাত্তিরের হাট এইবার ভাঙবে'

কবিতাটি। তাঁর এ কবিতায় এবং আরও নানা কবিতায় যাকে আমরা 'বাস্তব' বলি, আর যাকে আমরা 'অলীক' বলি তার কেমন আশ্চর্য মেশামেশি ঘটে। বারবার তাঁর কবিতায় এক নগরের ছবি আসে। তা আমাদের চেনা, আবার অচেনাও বটে। দুপুরবেলার শহর, রাত্রির শহর, তালাবন্ধ শহর, নানাভাবে অরুণ মিত্র এক শহরের কথা বলেন। তিনি যখন বলেন, 'রাস্তার দুই সার দোকানের মাঝখান দিয়ে ঘাড় গুঁজে আমি এগিয়ে এসেছি', তখনো তিনি একটা নগরের কথাই বলেন। অথচ তিনি নিজে নির্জন। আমি অবশ্যই 'এ কি কোন নির্জনতা' এই কবিতাটির জোরেই বর্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি না। কিন্তু ওখান থেকে আমি একটি অর্থ-সিদ্ধ অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না :

> নির্জনতা আমি জেনেছি।
> নিজেকে বিলোবার নিজেকে সমৃদ্ধ করবার ঘনিষ্ঠ মাটিতে।
> আমি এই যেখানে এসেছি
> এ কি কোন নির্জনতা,
> শব্দের শব্দহীনতায় থিতোনো
> আলো অন্ধকারের চাকে নতুন গড়া ?

এখানেই আমরা আবার অরুণ মিত্রের কবিপ্রকৃতির গহনের আর এক ঠিকানা পেয়ে যাই। আলো আর অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর বারবার আনা-গোনা। পাথর আর ধুলোর মাঝখানে তাঁর আসাযাওয়া—জল আর বরফের মধ্যে। যার এমনভাবে আসাযাওয়া তার আবিষ্ট হলে চলে না। সে সকল কিছুর সঙ্গেই তার সম্পর্ককে নিবিড় করে নিয়েছে বলেই সে-কথাগুলি বলতে পারে এক স্বতন্ত্র ভাষায়। তার শহরের বিশেষণ কখনো হয় 'গভীর', কখনো হয় 'ঠাসবুনোন'। নদী হয়ে যায় বহতা স্মৃতি। 'পলি মাটি বীজ বোনার ঋতু'। এইভাবে তিনি বাক্যবন্ধের চেনা বিন্যাস ভেঙে শব্দকে রাজি করান নতুন আলো ছড়াতে। বস্তুত অরুণ মিত্রের কবিতার এই ক্ষমতাটাই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান ক্ষমতা। অরুণ মিত্র সেই ক্ষমতার স্বাভিজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধি। তিনি শব্দকে তার পুরনো পরিচিত অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে নতুন প্রাঙ্গণে হাজির করতে পারেন। এই সূত্রেই আমরা আলো-

চনার জন্য তুলে নিতে পারি অরুণ মিত্রের একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতা 'শুধু রাতের শব্দ নয়'। কবিতাটি পড়লেই প্রথমে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি। মনে পড়াটা কিন্তু একান্তই আপতিক। অরুণ মিত্রের কবিতাতেও ভোরবেলা এবং সূর্যাস্তের একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে, দুটো কবিতাতেই উচ্চারিত হয়েছে সত্তার নিগূঢ় অনুভূতি। 'প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলার' প্রথম স্তবকের এই প্রথম পঙ্‌ক্তি এবং 'শেষ সমুদ্র সূর্যডোবার' দ্বিতীয় স্তবকের এই প্রথম পঙ্‌ক্তি দুয়ে মিলে জীবনের এক অবিরাম অব্যাহত গতি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। 'শুধু কি রাতের শব্দ ? / আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন / আমার শেষ সমুদ্রে'—তখনই ভোরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা ক্রম হারিয়ে ফেলে। চাকার অরগুলির মধ্যে যেমন কোনো আগুপিছু নেই, তেমনি এখানেও প্রথম সমুদ্র আর শেষ সমুদ্রের কোনো আগুপিছু ভাবা যায় না।

অরুণ মিত্রের কবিতায় বারবার একটা পাথরের কথা বলা হয়। তাঁর নানা কবিতায়, নানা প্রসঙ্গে আমরা সেই পাথর প্রতীকের দেখা পেয়েছি। তখন আমরা আবার বুঝতে পারি তাঁর কবিতার প্রতিটি প্রসঙ্গই কত অনুষঙ্গবাহী। পাথরের অনুষঙ্গেই অনিবার্য হয়ে ওঠে ঝর্নার জল। পাথরের অনুষঙ্গেই ভেসে ওঠে কত পুরনো মূর্তি, তাদের গায়ে ফাটা দাগ। তার গায়ের শ্যাওলা একদিকে যেমন তার প্রাচীনত্বকে ব্যক্ত করছে, অপরদিকে তেমনি আভাসিত করছে সবুজের নতুন আভাকে। পাথর এবং জল, রাত্রি এবং রৌদ্র, জনতা এবং নির্জনতা, সবকিছুকে মিলিয়ে গড়ে উঠেছে অরুণ মিত্রের প্রতীকের জগৎ। আমরা যখন তাঁর কবিতায় আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে খুঁজতে যাই তখনো আমরা বিড়ম্বিত হই না। কেননা অরুণ মিত্রের কবিতায় আমাদের আজকের অভিজ্ঞতা কবিতার বিষয় হিশেবে নির্বাচিত হয় না। বরঞ্চ দেখা যায় তাঁর কবিতা নিজেই স্পর্শ করে আজকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমস্ত পর্বগুলিকে। তিনি যখন বলেন

আমি যে জিনিসেই হাত দিতে যাই, আমার আঙুল বেয়ে টপ টপ রক্ত। আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি কোথায় এই গাদার নীচে বাসি পাতায় একটু রস রয়েছে যদি পাহারাদারের অজান্তে নিংড়ে নেওয়া যায় হায়

বিশল্যকরণী, যদি আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের কাছে ঐসব নিশ্বাস বইয়ে রাখা যায় হায় বিশল্যকরণী। আমি খুঁজছি আমি খুঁজছি॥

পাথরের প্রতীকে কথা বলতে বলতে আমরা বুঝতে পারি এরই মধ্যে আছে প্রস্রবণ, উদ্ভিজ্জ এবং এক প্রগাঢ় নদী। অরুণ মিত্রের কবিতায় যে নগরের ছবি মাঝেমাঝে ভেসে ওঠে সেই নগরটিও তো পাথরেই তৈরি! তার ঘর গম্বুজ মিনার সবই আমাদেরই অভিপ্রায়ের নানা প্রতিমা।

শব্দকে অরুণ মিত্র নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করেন। তিনি জানেন 'প্রহরে প্রহরে' বললে অর্থের যে আলো ভাসে, 'পহরে পহরে' বললে তা থেকে ভিন্নতর এক অনুষঙ্গ তৈরি হয়। 'রাত্রি' যেন প্রচলিত অনুষঙ্গের বার্তাবহ। কিন্তু 'রাত্তির' কথাটির মধ্যে রয়েছে একটা প্রাচীন অনুষঙ্গের ঠিকানা। শব্দকে তিনি যে অভিনিবেশে লক্ষ করেন, তাকে যে বোধের বাহন করে তোলেন, বাংলা সাহিত্যে সে-ক্ষমতায় তিনি অনন্য শক্তির অধিকারী। তিনি যথাসম্ভব কম কথা বলতে চান। এমনকী তাঁর একটু আকারে বড় কবিতাও প্রমাণ করে দেয় তিনি কত সংহত। এ জাতীয় কবিতায় আত্মকেন্দ্রিকতা একটা বিপদ ঘটাতে পারে, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটা ঘটে নি। কেননা প্রথম থেকেই তাঁর বিশ্বাস, বিদীর্ণ পাষাণে হৃদয় মূল মেলবার জায়গা খুঁজে পাবে। প্রথম থেকেই তিনি জানেন প্রত্যেক রাত্রি অনন্ত রৌদ্রের ভূমিকা রচনা করছে। এইভাবেই অরুণ মিত্র খুঁজেছেন আপন অভিজ্ঞতাকে নিংড়ে নিংড়ে আপন অস্তিত্বের এবং চেতনার অকৃত্রিমতাকে। তিনিও পৌঁছতে চেয়েছেন সত্তার এক বিশুদ্ধ অবস্থায়। জীবন সম্বন্ধে বিমুগ্ধতার তাঁর অন্ত নেই। অথচ তা অভিভূতের বিমুগ্ধতা নয়, বোধের পরিণাম। তাই তিনি যখন বলেন 'আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি। আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি' তখন আমরা চমকে উঠি। এখানেই অরুণ মিত্রের বৈশিষ্ট্য যে কোনো কিছুই তিনি ফেলে দেন না, অশ্রুর মুহূর্ত তিনি মুক্তোর মতো রেখে দেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ভাষার যেটা গণতান্ত্রিকতা সেটা আসলে তাঁর সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতারই নিদর্শন। তাঁর গদ্যে সাজানো কবিতা—এমনকী তাঁর পদ্যে সাজানো কবিতা-গুলির মধ্যেও কবিতার সাজপোশাক একেবারেই নেই। সেইজন্যই তাঁর

গদ্যকবিতা রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যগন্ধী নয়. আবার সমর সেনের মতো গদ্যগম্ভীরও নয়। এ হল এমন একজন মানুষের স্বগতোক্তি যিনি আপন অস্তিত্বের নিবিড়তম মুহূর্তে সেই অলৌকিক ক্ষমতার স্পর্শ পেয়ে যান. যাতে প্রতিটি শব্দ তাঁর কাছে হয়ে ওঠে স্পর্শমণির মতো দুর্লভ ঐশ্বর্যের অধিকারী। প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় ব্যবহারকারীকে আড়াল করে ফেলে, আর এখানে কবির শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অর্থের উদ্দেশ আমাদের জানায়। বস্তুত আলাদা করে প্রেমের কবিতা এজন্যই তাঁকে লিখতে হয় না। তিনি কথার ভিতর আলো জ্বালাতে চান। সেই আলোর ভাষা বলে :

> ভালোবাসার জন্যে আমার বুকের দুই বাতায় অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রাখি। শিশু সেখানে হাত ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে মাথা রাখে। একঘর স্বপ্ন তার চোখের পাতার উপর. তার ঠোঁটের বাঁকে। কিন্তু যুদ্ধের দামামা কাছে আসে আমি তা চাপা দেবার জন্যে যত স্নেহের ঢেউ তুলি দেয়ালের ইটে তত জোর হুমকি ওঠে। আর দুই বুকের উপর এসে কাঠি পড়ে। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুধু হায় হায়।
>
> আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ? দেখ না আমার হাসিমুখ বুলা হঠাৎ হঠাৎ কি যন্ত্রণার মূর্তি হয় ?

'স্বস্তির কথা কে বলে', 'শুধু রাতের শব্দ নয়'

সমগ্র জীবন আর ভালোবাসা সমার্থক হলে অস্তিত্বটাই হয়ে ওঠে অন্তর্গূঢ় রহস্যে পূর্ণ। অরুণ মিত্র মনে মনে. পায়ে পায়ে ঘোরেন সেই রহস্যময় রাজ-পথে, গলির যেখানে নিশ্বাস, যেখানে এক অলৌকিক মাদারিওলা রাত আর দিনের, দৃশ্য আর অদৃশ্যের সীমারেখা তুচ্ছ করে দেয়। অথচ তিনি কোনো অধিমানসিকতার কাছে গিয়ে হাত পাতলেন না। অন্তর এবং অনুচ্চকিত : অনাসক্ত আর কৌতূহলী; পদাতিক অথচ নীড়সন্ধানী—অরুণ মিত্র সব থেকে বস্তুবাদী কবি এই অর্থে যে বস্তুর অশেষ সম্ভাবনাকে তিনি বুঝে নিতে চান। প্রাপ্তির সাফল্যের ছায়াময় পশ্চাৎপট ধরে দিতে চান :

> বড় বড় স্তম্ভের পিছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ ; তারা অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাব

না। কিন্তু এ জায়গাটুকুর কথা আলাদা করে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা ॥

এ কবিতাকে সুখের বা দুঃখের, বেদনার বা আনন্দের কোনো চেনা সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। এগুলিই অরুণ মিত্রের কবিতা।

অশ্রুকুমার সিকদার

—

শূন্যতার বিরুদ্ধে ফর্মের সন্ধান

তখন থেকেই শুরু হয়েছে লড়াই
কচি গলায় যখন দুধের ফোঁটা নেমেছে,
শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।
তারপর তুমি আপন ক'রে নিয়েছো কত কী
দিনে দিনে ঋতুতে ঋতুতে :
সুখদুঃখের মুখ ফুলফলমূল কাটা মাটি ভেজা মাটি
সোহাগি রোদ আগুনে রোদ খরার পর ফসলী বছর
গায়ে হাত বুলোনোর শ্যামলী ধবলী গাই বেড়াল কুকুর
আর মুহূর্তের অঙ্কে চলেছে তোমার লড়াই
শূন্যতার বিরুদ্ধে।

'শূন্যতার বিরুদ্ধে', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

সমস্ত কবিজীবন ধরে শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিশেবে ভালোবাসার কবিতা লিখে চলেছেন কবি অরুণ মিত্র। মানুষ আর নিসর্গ-পৃথিবী নিয়ে এক গভীর, মগ্ন ভালোবাসায় তাঁর কবিতা অনুপ্রাণিত প্রথম থেকেই। স্যাঁ-ঝন পের্স তাঁর *Amers* কাব্যের একটি কবিতায় *(Étroits Sont Les Vaisseaux...)* যা বলেছেন, সেই কথা, ইংরেজি অনুবাদে, অরুণ মিত্রও বলতে পারেন, **'Loving also is action ! I call death to witness, to whom alone love is an offence.'**

এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তোচ্ছ্বার গানে ?

'সাগর', 'উৎসের দিকে'

জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম আর শরীরের প্রতি অনুরাগ একাকার হয়ে যায় তাঁর কবিতায়। তাই,

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।
তোমার শরীরে অঙ্কুরের শিহর খুঁজি,
আমার আলিঙ্গনের মধ্যে দুর্বোধ্য বিস্তার সংকীর্ণ হয়ে আসে
আশেপাশে অসংখ্য ইশারায়
তোমার ঠোঁটের প্রত্যাশা উদ্ভিন্ন হয়
জীবনের আগ্রহে
আমার পৃথিবীময় সেই প্রত্যাশা।···

তুমি মঞ্জরীর মতো জাগো
বলি ধানশীষ হও সর্ষের ঢেউ
বলি গভীর কল্লোল দিয়ে আমাকে জড়াও।

'ফসলের স্বরে', 'উৎসের দিকে'

এই ভালোবাসা কবিতায় আশ্রয় পায় গ্রামের সান্নিধ্য, বাল্য-কৈশোরের আকাশ-ধরা গাছে-ওঠা সাঁতারের অবগাহনের স্মৃতি-ধৃত হয়ে। জীবন আর জন্মভূমি মিলে যায়, স্বাতন্ত্র্য হারায়।

বাংলার আপন মাটি প্রাণবীজে অন্ধকার ভ'রে রাখে
সমস্ত সুষমা সমস্ত করুণা সব শৌর্য ধ'রে রাখে,
কখনো খরায় পোড়ে, কখনো বা বানে ডোবে
কখনো যে রক্তে রক্তময়
তবু ভরসার আশার এলাকা গ'ড়ে চলে,
কবেকার ধ্যান কর্ম গাঁথা থাকে দিন আর রাত্রির ধারায়···

'প্রতিমূর্তি', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

পিছনের ঘোর বন, সামনের বাদার পাড়ি দিয়ে এই বাংলার গাঁয়ের লোকগুলি আসে, বাংলার ছায়ায় ঝাঁকা রেখে পাঁজর কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে, 'মেয়েরা স্তনের ডৌলে গরিব মমতা নিয়ে বসে পড়ে'। এইসব চিত্রকল্প

তিনি নিয়ে আসেন জীবনের অনুকূলে, বাংলাদেশের নিসর্গ ও জীবনযাপন থেকে। তাই তিনি বলেছেন,

মনে মনে আমার আঁচ করা ছিল
সমস্ত লাবণ্য শব্দেই ছেঁকে তোলা যাবে
সেইজন্যে জোগাড় করেছিলাম বিস্তর :
ঢেঁকিশালে পাড় দিচ্ছে পা
ঘরে ফেরার বাঁশি বাজছে
উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বেলেহাঁস
ঠোঁট খুলে হাসছে মালতী
এবং এই ওই আরো।

'সবই ভণ্ডুল', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

তাই বাংলাদেশের জল-মাটি-হাওয়া, বাংলার মেলা, আমজামের গাঁ, তাল-পাতার ভেঁপু, ছায়াবটের ঝুরি, কচুপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা, তালবনের দিঘিতে বাংলার বৃষ্টির নরম রূপ, ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা এই সুজলা সুফলা দেশের সুপুরিগাছের ঘন সারি, কালো দিঘির কলমিপিছল পাড়, ঘুঘু-ডাকা দুপুর, কাঁসরের বাজনা, আগমনী গান পালাগান নবান্ন, খেঁজুরগাছে টাঙানো ভাঁড়, ঘাসের চাপড়া ধানখেত ঝিঙে ধুধুঁল, ঘেঁটুঝোপ আর পুকুরের পাড়—স্মৃতির গাঢ় মাধুর্য আর কোমল বেদনায় মিশে বারে-বারে তাঁর কবিতায় আসে।

পেছন থেকে আমি যে-ডাক শুনি
তা আরো অনেক দূরের।
সেখানে আমার, জন্মের উৎস…

আমার ছিল ভালোবাসার কাদামাটি
আর ছিল এক বিষণ্ন পুকুর…

পেছন থেকে ডাক শুনি,
আমি বঁইচির ছায়া ছেড়ে
আরো স্নিগ্ধতায় প্রবেশ করি…

'পেছন থেকে যে ডাক শুনি', 'শুধু রাতের শব্দ নয়'

জন্মের উৎস থেকে এই পিছুডাক শুনে ভালোবাসার কাদামাটি দিয়ে কবি অরুণ মিত্র রচনা করেছেন যেন তাঁর কবিতার প্রতিমা। স্মৃতির অনুষঙ্গ ধরেই জন্মভূমির উৎস থেকে উঠে-আসা এই চিত্রকল্পগুলি অসংলগ্ন চিৎ-প্রবাহে পরাবাস্তবের রূপ নেয়। 'এক নদী রয়েছে বহতা স্মৃতি।' স্মৃতিও বহতা, স্মৃতি-জাত এই কবিতাগুলিও বহতা—কবিতাগুলি ধারণ করে স্মৃতি-তরঙ্গের প্রবহমানতা।

চোখদুটো কবিকে তাড়া করে। আর এই দৃশ্যময় বাংলার জনজীবন আর নিসর্গ-প্রকৃতি থেকে চিত্রকল্প আহরণ করে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর কবিতার সর্বজয়ী ভালোবাসাকে। মুগ্ধতার একটা চেহারা মুহূর্তে-মুহূর্তে কবির নজরে এসে যায়। সর্বজয়ী প্রেমের ছবি আর ইশারা পান তিনি সব কিছুর মধ্যে। প্রেমই বিশল্যকরণী, প্রেমই শুদ্ধতা, প্রেমেই উদ্ধার।

> আরোগ্যের জন্য কয়েকটি কথা প্রথমেই তাদের মনে এসেছিল। যেমন—নদী, যেমন—সূর্য, যেমন—প্রেম। শুধু মনে আসা নয়, তারও বেশি এই সব শব্দের চিত্র তারা তাদের স্বভাবে মুদ্রিত করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল জীবনের মূলকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাকে এক এক বিশুদ্ধতায় তারা সঞ্চারিত করতে পারবে।
>
> 'কোনো চিহ্ন নেই', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'

খরার রোদ্দুর যখন সবকিছু চিরে দেয় মাঠঘাট পোড়ে, 'পুকুরের জল নিষ্ঠুর আয়না', তখনও শুশ্রূষা নিয়ে আসে প্রেমের একটি ডাক, 'হাতের পদ্মফুল হাসে'। কিন্তু যতই স্নেহের ঢেউ তোলা যাক, তবু তো যুদ্ধের দামামা বাজে, অদৃশ্যভাবে ছড়িয়ে যায় পারমাণবিক বিষ।

> থরে থরে ফলে সব্জিতে মারাত্মক রঙ। আমি
> নাড়াচাড়া ক'রে দেখি আমার হাত বিষিয়ে ওঠে।
> তাদের গায়ে যেন পারমাণবিক ছোঁয়াচ। এই বিষ
> কি ক'রে ছাড়ানো যায়? আমি বাগান থেকে ঘরে,
> ঘর থেকে বাগানে নিঃশত্রু বীজের ডানামেলা দেখতে চাই
>
> 'দিনলিপি', 'শুধু রাতের শব্দ নয়'

কিছুই তো সরল নেই, কিছুই তো সরল নয় আর। চোয়ানো রক্তের স্বর

শোনা যায়, এত ঝড়জলেও আগুন নেবে না, বুকের দাগ মোছে না, স্তূপের নীচে ভীষণ তাত রয়ে যায়, পৃথিবীর আবহাওয়া বলয়ে শাদা আগুন, ঘরের মধ্যে তুফান, রন্ধ্রে রন্ধ্রে আওয়াজ কাঁপছে, ভিতসুদ্ধ সব দেয়ালই টলমল, নষ্ট রাস্তায় হোঁচট খেতে হয়—সভ্যতার দুঃস্বপ্নময় উন্মার্গগামিতা বিচলিত করে কবিকে। কিন্তু জীবনে তাঁর গভীর প্রত্যয়, তিনি অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারেন, দেখতে পান খেতের উজ্জ্বলতায় হাসির টান।

> ভোর হতেই বহতা জল। টুংটাং করে সাতটা বাজলে চনমন করে কাঁচে জড়িয়ে যায় গম্ভীর বারোটায় ঝিমিয়ে পড়ে বিকেলে ঝলকে উঠে সন্ধেয় কুলকুল। সন্ধেয় ভোরে শিকড়ে ঠাণ্ডার ঝারি। মাটি থেকে উপ্‌চে জল পাতায় চারিয়ে যায় পাতালে ফেরে। চৌকাঠ আর বাগানের মধ্যে সুড়ঙ্গ ধ'রে এত জল এত মমতা। ফুটিফাটা পার হলে এক লাফে খাদ ডিঙিয়ে এলে অনন্ত ভালোবাসার নাটমঞ্চ।
>
> 'কেয়ারির চারা', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

অরুণ মিত্রের সমস্ত কবিতা ভালোবাসার কবিতা, এই স্নেহ প্রেমময় জীবনের জয়গান।

শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে আত্মস্থ এই ভালোবাসার কবিতার নিজস্ব রূপকল্প বা ফর্ম প্রথমেই খুঁজে পান নি কবি। অন্তত 'প্রান্তরেখা'র (১৯৪৩) কবিতাগুলি প্রথাসিদ্ধ রূপকল্পেই রচিত। এমনকী 'উৎসের দিকে' (১৯৫৪) গ্রন্থের অন্তর্গত কিছু কবিতাও, যেগুলি 'প্রান্তরেখা'র অনতিকাল পরেই লেখা। কখনো-কখনো ঈষৎ নতুনত্ব হিশেবি-ছন্দের কবিতায় মিলবর্জনে।

> মেঘ-পর্বত বাহিরে যে তোলে শ্যাম শিখর।
> জানলায় চেয়ে ছাখো অলকার গুহা অলীক;
> মৌশুমী বায়ু কখনো পাগল, দূরাগতের
> হাহাকার বেঁধে ভিতর দেয়ালে বারংবার।
>
> 'উত্তরমেঘ', 'প্রান্তরেখা'

কখনো একেবারেই প্রথার অনুবর্তন পাই, যদিও তার মধ্যে বাক্‌স্পন্দের নিজত্ব আমাদের নজর এড়াতে পারে না।

চাকায় চাকায় দেয় কাতার ;
এই দীর্ঘ সরীসৃপ শয়ন
নড়বে মরণ-যন্ত্রণায়,
উন্মুখর দিনের গীতবয়ন

আমার ভেলায় ; ঘুমসাগর
কলকাতার কুয়াশা মেঘবরণ
ফেড়েছি আমরা কয়জনেই,
গাই আমরা অথই শোকহরণ।

'জয়গান', 'উৎসের দিকে'

এখনো ভেঙে পড়ে নি যুক্তির শৃঙ্খল বা ন্যায়ের পরম্পরা, ঘটে নি বাক্যের গঠনে কোনো বৈয়াকরণিক বিপর্যয়।

দেশে থাকতেই ফরাসি কাব্যসাহিত্যে গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ জনিত কারণে কবি অরুণ মিত্র আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজের নিকট-সংশ্রবে এসেছিলেন। পরে ফরাসি সরকারের বৃত্তি লাভ করে বিখ্যাত সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগে (১৯৪৮-৫১) সেই পরিচয় আগ্রহ ও অনুরাগ নিবিড়তর হয়। তখন থেকেই ফরাসি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও চর্চা তাঁকে সাহায্য করেছে নিজস্ব রূপকল্প বা ফর্ম খুঁজে নিতে। এমন সরলভাবে নয় যে, তিনি ফরাসি সাহিত্য নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করলেন আর সেই কাব্যসাহিত্যের প্রভাবে পুনঃসৃষ্টি করলেন তাঁর পরবর্তী কবিতাকে। আসলে তাগিদ ছিল নিজের ভিতর থেকে, খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আত্মপ্রকাশের সংগততম ফর্মটি, শূন্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ভালোবাসার কথাগুলি বলার জন্যে। ফরাসি সাহিত্যে পেলেন যখন সমধর্মা জীবনপ্রেমিক কবিদের দেখা, তখন তাঁদের ফর্ম-ব্যবহারের অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে এনে দিল মুক্তির ইঙ্গিত, পথের ইশারা। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধের তাড়নাতেই তিনি ঝ্যুল্ সুপেরভিয়েল, পল এল্যুয়ার, র‍্যনে শার-কে আত্মীয় বলে চিনতে পেরেছেন, আর সেই সহমর্মিতার দরুনই পরীক্ষায় তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কবি অরুণ মিত্র কাজে লাগাতে পেরেছেন। সুপেরভিয়েল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

'পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তার সঙ্গে এক অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা তাঁর—মানুষ, পশু, গাছপালা, পাথর সব কিছুর সঙ্গে। এর মূলে জীবনের প্রতি এক নিবিড় প্রেম।...'

'এই তো সুন্দর এই যে দেখেছি
পত্রগুচ্ছের নিচে ছায়া
এই যে অনুভব করেছি
বয়স নগ্নদেহের উপর সঞ্চরমান
আমাদের ধমনীর কালো রক্তের
বেদনার সঙ্গী হয়েছি
আর তার নীরবতাকে সাজিয়েছি
সহিষ্ণুতার তারায়··· ।'

'আধুনিক ফরাসী কবিদের কথা', 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে'

র‍্যনে শার-এর কবিতাও জীবনের প্রতি ভালোবাসায় ধ্বনিত। এই ভালোবাসার মূলে আছে জীবনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা। ছায়া আলো শূন্যতা উচ্ছলতার জটিল রেখায় মূর্ত তাঁর এই গভীর ভালোবাসার অনুভূতি। এল্যুয়ারের কবিতা বিষয়ে অরুণ মিত্র লিখেছেন, 'প্রেম ও জীবন সমার্থক এই বোধ থেকেই সমস্ত মানুষের জীবনের জয়গান তাঁর কণ্ঠে।' ('পল এল্যুয়ার', পূর্বোক্ত)। যদিও স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই এল্যুয়ারের কবিতায় মানবমুক্তির কথাটা বড় হয়ে উঠেছিল, তবু পূর্ববর্তী কবিতাবলির সঙ্গে আর এই সময়ের কবিতার মধ্যে কোনো ভেদরেখা নেই। প্রথম থেকেই তাঁর নির্জন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে মানবিকতার এক অন্তঃসলিল ধারা বয়ে এসেছে। 'ব্যক্তিগত প্রেম ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়, কিন্তু তা কোনো কিছুকে অস্বীকার করে নয়। প্রেমকে তিনি তাঁর মুক্তির নির্যাসে সমগ্রভাবে ধরতে চেয়েছেন, খণ্ডিত করে নয়। সুতরাং জীবন ও মানুষের প্রতি আত্মীয়তা তাঁর সত্তায় শিকড় মেলে ছিল। বরং তাঁর মতো ভালোবাসার কবি যদি মানুষের যন্ত্রণায় বিচলিত না হতেন, যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতেন, তবে সেটাই আশ্চর্যের হতো।' ('পল এল্যুয়ার', পূর্বোক্ত)। কথাগুলো আমাদের কবি সম্বন্ধেও আকস্মিকভাবে

খাটে। শূন্যতার বিরুদ্ধবাদী, এই ভালোবাসার কবি, অরুণ মিত্রকেও তাঁর কবিতার প্রতি তাঁর জীবনবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সাহিত্যিক-শিল্পী সঙ্ঘে যুক্ত হতে হয়েছে, প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবনার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছে।

এই জীবনপ্রেমিক কবি, অনুমান করি, ফরাসি জীবনাসক্ত কবিদের সান্নিধ্যে এসে বুঝতে পেরেছেন, 'জীবনকে বিশালভাবে ধরতে গেলে হিসেব-করা পুরোনো ছন্দমিলে যেন আর কুলোয় না।' ('কবি স্যাঁ-ঝন পের্স', পূর্বোক্ত)। চাই গভীর ধ্বনিময় এক গদ্য, যা মাটির মতোই উষ্ণ আর নিবিড়। গদ্যের বিস্তার দিয়েই ধরতে হবে জীবনের বিস্তারকে। হয় গদ্যকবিতা অথবা গদ্যে কবিতা। জীবনের উষ্ণ নিবিড় ব্যাপ্ত বিশালতাকে ধরতে পারে গদ্যকবিতা, যেমন,

আমি সূর্যের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি
প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছি রোদের বিন্দু
আর চৈত্র থেকে আষাঢ়ে আমাকে এগিয়ে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

'আর এক আরম্ভের জন্যে', উৎসের দিকে'

বোদলেরের আদর্শও তাঁর সামনে ছিল। বোদলের যেমন প্রথাগত পদ্যে কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি মাত্রা-মিল ভেঙে কবিতাকে নিয়ে এসেছিলেন গদ্যের কাঠামোয়। বোদলেরের *Poèmes en Prose*-এ পাই তার প্রথম সচেতন সংগঠিত রূপ। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অরুণ মিত্র লিখেছেন, 'কাব্য ও পদ্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ আধুনিক সাহিত্যের এক প্রধান ঘটনা। এ যেন লিরিক আচরণের উপর এক সজাগ সমালোচক মনের খবরদারি, রোমান্টিক উর্ধ্ববিহারে বুদ্ধির হস্তক্ষেপ, পৃথিবীর মাটিতে তাকে ছুঁইয়ে রাখার চেষ্টা।' ('কাব্যের মুক্তি : ফরাসী প্রয়াস', 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে')। এ ছাড়া আমাদের কবির সামনে ছিল আর্তুর র‍্যাঁবোর *Les Illuminations* এবং *Une Saison en Enfer*-এর গদ্যে লেখা কবিতার আদর্শ।

আমি গ্রীষ্মের উষাকে আলিঙ্গন করেছি। প্রাসাদের শীর্ষে তখন কিছুই

নড়ছিল না। জল ছিল নিথর। ছায়ার শিবির বনপথ ছেড়ে যায় নি। প্রখর উষ্ণ নিঃশ্বাস জাগিয়ে আমি হেঁটেছি; মণিমাণিক তাকিয়ে দেখল, ডানার উপরে উঠল নিঃশব্দে। মেটে পথ ইতিমধ্যেই ভ'রে উঠেছে তাজা অস্ফুট ঝলকে; তার মধ্যেই প্রথম উদ্যম হল একটি ফুল, যে তার নাম বলল আমাকে। জলপ্রপাতে আমি হেসে উঠলাম, ঝাউ-গাছের ভিতর দিয়ে সে এলায়িত হল: রূপালি চূড়ায় আমি দেবীকে চিনলাম।

'ঊষা', 'অন্তস্বর'

সামনে আরো ছিল পল ক্লোদেলের আদর্শ, এমনকী ঝিদের *Les Nourritures terrestres*-এর গদ্যের আদর্শ, আর স্যাঁ-ঝন পের্স ও এল্যুয়ারের গদ্যে লেখা কবিতার আদল। প্রমাণ দিতে, তুলে দিচ্ছি অরুণ মিত্রের অনুবাদে এল্যুয়ারের গদ্যে লেখা একটি কবিতা।

আমার সমস্ত কামনা স্বপ্ন-সঞ্জাত। আমি বাক্য দিয়ে আমার প্রেম প্রমাণ করেছি। কোন্ অপার্থিব প্রাণীর কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি, কোন্ যন্ত্রণা ও আনন্দের জগতে আমার কল্পনা আমাকে আটক করেছে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমি ভালোবাসা পেয়েছি সবচেয়ে রহস্যময় রাজ্যে, আমার রাজ্যে। আমার প্রেমের ভাষা মানুষের ভাষা নয়, আমার মনুষ্য-শরীর আমার প্রেমের রক্ত-মাংসকে স্পর্শ করে না। আমার প্রেমের কল্পনা বরাবরই এমন একাগ্র ও সমুচ্চ যে, কেউ আমাকে তা ভ্রান্ত ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে না।

'A la fenetre', 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে'

আর পের্স যেমন তাঁর গদ্যে লেখা কবিতার মধ্যে মাঝেমাঝে ছন্দের সঞ্চার আনেন এবং এনে সাধারণ গদ্যের বিন্যাস ভেঙে দেন, তেমনটি আমরা অরুণ মিত্রের কবিতাতেও অনেকসময় পেয়ে যাই। আঁরি মিশো-ও প্রধানত গদ্যে লিখেছেন তাঁর কবিতা, এবং তাঁর কবিতার গদ্যে কোনো কাব্যিকতা নেই। আবারো অরুণ মিত্রের অনুবাদে মিশোর কবিতার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি।

তাকে সে আরও জানায় : এখানকার ভোরবেলাটা ধূসর। এরকম বরাবর ছিল না। কাকে দোষ দেব জানি না। রাত্তিরে পোষা গোরু-ভেড়া জোর ডাকতে থাকে, সে-ডাক শেষের দিকে দীর্ঘ আর তীব্র হ'য়ে যায়। করুণা হয়, কিন্তু কি করা যাবে ?
ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ আমাদের ঘেরে : মঙ্গল, প্রশান্তি ; কিন্তু তা সব কিছু থেকে বাঁচাতে পারে না, নাকি তুমি মনে করো তা সবকিছু থেকে সত্যি বাঁচাতে পারে ?

'এক দুর দেশ থেকে আমি লিখছি', 'অন্তস্বর'

মিশোর কাব্যে কাব্যিকতা নেই, কিন্তু সেই কাব্যিকতার সংস্রব অরুণ মিত্র পুরোপুরি এড়াতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অনেকসময় লেগে যায় ভাবালুতার স্পর্শ। তাছাড়া ফরাসি গদ্যে কবিতার পরীক্ষাকে আত্মসাৎ করে কবি অরুণ মিত্র যে গদ্যকবিতা বা গদ্যে কবিতা লিখেছেন সেগুলি আসলে গদ্য-লিরিক। সেই লিরিকতার উপর বুদ্ধির হস্তক্ষেপ বা সজাগ সমালোচক মনের খবরদারিও তত পাই না আমরা। আমাদের আকৃষ্ট করে গদ্যের ঐ লিরিকতা।

কে কবির ভালোবাসাময় জীবনবোধের ভর নেবে ? পদ্য নিতে পারে সে-দায়, 'কিন্তু আরো যে বলার থাকে।' সেই ব্যাপ্ত জীবনবোধের কথাটি কে বলবে ? তবে কি গদ্য ? 'তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক-এক সময়, কী-যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্‌কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভেতরে প্রক্ষালিত হতে থাকে।...তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।' ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য', 'প্রথম পলি শেষ পাথর')। প্রচলিত মাত্রা-মিলে সাজানো পদ্যের ফ্রেম ভেঙে দেয় এই গদ্য, প্রকাণ্ড দরজা খুলে দেয়, সমস্ত ভুবনের ব্যাপ্তি এই গদ্যে কবিতায় সমর্পিত হয়।

অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, দেখি সে আমার উৎসবের অন্ধকার নয়। তুমি সেখানে বিচ্ছুরিত হও না। আমার উপর এক কালো পাহাড়ের চাপ। আর সারাটা রাস্তার রোদ্দুরের যন্ত্রণায় আমি নিবদ্ধ থেকে

যাই। ইঞ্জিনের গরগর ধুলো ছেড়ে উঠে এসে মাথার উপরে ঘোরে। রোগা রোগা হাতে যে-সানকিগুলো ধরা ছিল তারা আমার চারদিকে বাতাস জ্বালিয়ে ছোটে। নির্জন নয় উতরোল নয়। বুকের ভিতরের একরোখা স্মৃতি। এবং এত পতন শূন্যে।

আমি হয়তো তোমার কাছেই এসে গিয়েছি। কাছে, কিন্তু অগ্নিবলয়ের এপারে।

'অগ্নিবলয়ের এপারে', 'প্রথম পলি শেষ পাথর'

র‍্যাঁবোর কবিতার গদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই গদ্য তীব্র আবেগময়, কখনো রুদ্ধশ্বাস চিৎকারের মতো, আবার কখনো সমুদ্রের কল্লোলের মতো। সেই আবেগ, নিরুদ্ধ চিৎকারের আর্ততা বা সমুদ্রনিঃস্বন অরুণ মিত্রের অন্তর্লীন প্রবাহময় গদ্যলিরিকে মেলে না অবশ্য। র‍্যনে শার-এর কবিতার মতো চিত্রকল্পে অরুণ মিত্রের কবিতাও উজ্জ্বল, কিন্তু শার-এর কবিতার শব্দগত বিস্ফোরণ তাঁর কবিতায় মেলে না। তাঁর কবিস্বভাব স্বতন্ত্র। নিজস্ব কবিস্বভাবে অবিচলিত থেকে অরুণ মিত্র তাঁর জীবনবোধের প্রকাশে ফরাসি কবিদের গদ্যকবিতা ও গদ্যে কবিতার অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অরুণ মিত্রের কবিতার গদ্যভাষায় শব্দের প্রবেশ অবারিত। তিনি 'শব্দের ভাঁড়ার' খুলে দিয়েছেন। প্রকাণ্ড দরজা খুলে ফ্রেম ভেঙে যেমন প্রকাণ্ড জীবনকেই তিনি কবিতার অন্তর্গত করে নিয়েছেন, তেমনি একই কারণে সব শব্দকেই তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর কবিতার সীমানায়। এই ব্যাপারে তিনি ভেবেছেন স্যাঁ-ঝন পের্সের কবিতার কথা, ভেবেছেন হয়তো ঝাক্ প্রেভের-এর কথাও। ঝাক্ প্রেভের-এর মতো তিনিও চেয়েছেন এমন এক ভাষায় কবিতা লিখতে যাতে কথ্যভাষার আস্বাদ সঞ্চারিত করতে পারেন। প্রথম দিকে সেই আস্বাদ ছিল না। 'প্রান্তরেখা'য় সংস্কৃত শব্দের অবিকার ব্যবহার পেয়ে যাই আমরা— আহ্নিক চক্রান্ত, কম্বুরেখা, উজ্জ্বল তির্যক রশ্মি, প্রহরী পাখার ব্যর্থ বিধুনন, সহিষ্ণু প্রহর, চিত্রময় শূন্যতল, সুবিন্যস্ত পটভূমি, বিদ্বেষের ঈপ্সিত কাল, আকাশের শ্যেনদৃষ্টি। পরে, 'উৎসের দিকে' থেকে যেমন পাচ্ছি, ধ্যানী বৃক্ষ, শোচনীয় ভগ্নস্তূপ, চেতনার বিষাক্ত

ফল, রক্তের ভৃঙ্গার, তেমনি পাশাপাশি পেয়ে যাই, পায়ে-পায়ে মরা পথ, ঝাপসা ওড়না, ক্ষেতের ডেলা, মাটিতে ন্যাজের বাড়ি, একঘেয়ে গোঙানি, জরদগব আলাপে নুয়ে পড়া ফাটা ছাত, খাপি জমিন, মখমলের মতো মোলাম—এমন অবিরল ব্যবহার। আরো পরে, সব কবিতাই যখন গদ্য-কবিতা অথবা গদ্যে কবিতা তখন এইধরনের ঘরগৃহস্থালির শব্দে লেখা হয়ে যায় তাঁর কবিতা—হাতের চেটোগুলি, মুখের আদল, সমুদ্দুর, মাটির পিদ্দিম, মন্তর, রোদ্দুর, পরনের ন্যাতা, ভুতুড়ে আলো, স্মৃতির ফতুয়া, হাঁড়ি কুড়ি ছাই ভাঙা উনুন, ছুমন্তর, জানকবুল, ছারারা জগঝম্প, ভিরমি-খাওয়া ঢলে-পড়া কুঁকড়ে যাওয়া, আথান্তর, চিতোনো বুক। মেয়েলি শব্দ, দেশি শব্দ, উপভাষার শব্দ—আহ্বানে কোনো কুণ্ঠা নেই। মানুষের পৃথিবীর দরজা খোলা, মানুষের ব্যবহৃত শব্দগুলির জন্যেও দরজা খোলা। শব্দব্যবহারের ব্যাপার নয় শুধু এটা, এইধরনের শব্দ ব্যবহার করে তিনি আসলে কবিতাকে বাক্‌স্পন্দে স্পন্দিত করতে চান। সাধারণ মানুষের কথা বলার অসতর্ক ছক-ভাঙা ধরন তিনি কবিতায় আনতে চান। এলুয়ারও যখন তাঁর কবিতাকে সরল ও অনাড়ম্বর করতে চেয়েছেন তখন তিনি নিত্যব্যবহৃত সাধারণ শব্দের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। এইসব শব্দপ্রয়োগে আনন্দ যেমন এলুয়ারের কবিতায়, তেমনি অরুণ মিত্রের কবিতায় ছড়িয়ে যায়। শব্দব্যবহারে তাঁর লক্ষ্যের কথাই তিনি বলেছেন, 'কেতাদুরস্তি শেষ হোক। তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উল্‌টে দেয় তেমনি ক'রে উল্‌টোও কথাগুলোকে তবেই তাদের উপর থরে থরে চারা জন্মাবে চোখ-ছাপানো ফসল। তখন নবান্ন তখন বসন্ত তখন শান্তি।' ('কথাগুলোকে', 'প্রথম পলি শেষ পাথর'।)

গদ্যে এনেছেন কথা-বলার অসতর্ক ছক-ভাষা ধরন, সেই প্রসঙ্গেই অরুণ মিত্রের গদ্যকবিতা ও গদ্যে কবিতার আলোচনায় স্যুররিয়্যালিজমের উত্তরাধিকারের কথাটা বুঝে নেওয়া খুব জরুরি। স্যুররিয়ালিস্টরা মনে করতেন অবচেতনই হচ্ছে কাব্যের উৎস, শৈশবের আদিম দৃষ্টিকে কবিতায় আনাটাই লক্ষ্য। বহির্জগতের যুক্তিনিয়ম বাস্তবের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা এক স্বৈরাচারী সনাতন ব্যবস্থা, মনের উপর থেকে যুক্তির স্বৈরাচারী শাসনকে

সরিয়ে ফেলে অন্তর্লীন গোপন সত্তাকে উদ্ধার করাটাই শিল্পের কাজ। তার মধ্য দিয়ে কবি চাইবেন আশ্চর্যের উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে। জগৎ সংসারের উন্মার্গগামী বিশৃঙ্খলা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কবির কবিতায় ঘটবে অনুষঙ্গ ও চিত্রকল্পের বিনিময় ও রূপান্তর। মনের গতিশীলতাকে ধরার চেষ্টায় স্যুররিয়ালিস্ট কবিতা আর চেতনাপ্রবাহের উপন্যাস যেন একই পদ্ধতিকে ভিন্নভাবে ধরেছে। এল্যুয়ার স্যুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের একজন ছিলেন, কবি হিশেবে তাঁর উত্তরণের দিনেও সেই স্যুররিয়ালিস্ট উত্তরাধিকারের ছাপ তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবেই রয়ে গেল। যেসব ফরাসি কবিদের অরুণ মিত্র সমধর্মী মনে করেছেন তাঁদেরও গদ্যকবিতায় বা গদ্যে কবিতায় স্যুররিয়ালিস্ট রচনাপ্রণালীর পরোক্ষ বা অপরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। অরুণ মিত্রের গোড়ার কবিতায় প্রথাবদ্ধ যুক্তির পরম্পরা, বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলা একেবারেই অটুট ছিল।

> শেষ বর্ষায় মরা গাঙে দেখি এল প্লাবন।
> আজকে তোমার অধরে হাসির ভরা জোয়ার ;
> গ্রীষ্মের জ্বালা বিছানো যে-মুখে প্রতি রেখায়
> ফুটল সেখানে ঘন আনন্দ রস-মধুর।

'বিড়ম্বনা', 'প্রান্তরেখা'

ফরাসি কবিদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে ফর্মের সন্ধান যখন নিজভূমি খুঁজে পেয়েছে, তখনই তিনি এই স্যুররিয়ালিস্ট রীতি আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এল্যুয়ার সম্পর্কে অরুণ মিত্র লিখেছেন, 'এল্যুয়ার-এর কবিতা পড়লে যে বিশেষণটা আমার প্রথমেই মনে আসে তা হলো "ধ্যানমগ্ন"। নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছেন। সমস্ত পৃথিবী, বস্তুপুঞ্জ হৃদয়ের গভীরে জারিত হয়ে এক বিশুদ্ধ রূপান্তরে জন্ম নিচ্ছে। সেইজন্যে স্যুররিয়ালিস্ট মগ্নচৈতন্যের স্রোতে তিনি যতটা স্বাভাবিকভাবে গা ভাসাতে পেরেছিলেন অন্য অনেকে তা পারেন নি।' ('পল এল্যুয়ার', 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে')। তাঁর কবিতায় পাই আমরা বিশেষ্যে এবং বিশেষণে জড়িয়ে জড়িয়ে তুলনা-প্রতিতুলনার খেলা। উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন, তাঁর কবিতার পরস্পরবিরোধী শব্দযোজনার মনে হয় কোনো অর্থ নেই। আসলে সব-

রকম দেখা আর শোনাকে যেন জড়ো করেছেন তিনি, আর সেই দেখা-শোনার জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক অনর্গল অনুষঙ্গের সম্পর্ক। আর তারই ফলে কবিতার বাক্যে-বাক্যে চলে এসেছে সেইসব চিত্রকল্প যাকে মনে হয় অপূর্ব অদ্ভুত। এইভাবে ব্যবহার-মলিন পুরনো অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি পায় বলেই প্রত্যেক শব্দ আর চিত্রকল্প টাটকা আর নতুন হয়ে ওঠে। অরুণ মিত্রের অনূদিত এল্যুয়ারের একটি নমুনা-কবিতা থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারবে।

আমি তোমাকে সাহায্য করি
বেড়া ডিঙিয়ে যেতে
কাঁচা রাস্তায় না চলতে
আমাদের স্বপ্ন থেকে কিছু না ছেড়ে দিতে

আমরা ভুলি কোমল বালি
ঘন সমুদ্র গুমোট আকাশ
সহিষ্ণুতায় ভারি প্রহর
এবং অন্ধকারে সেই সব দূরত্ব
যা তোমার মুখের সামনে স্পর্ধিত

আমাদের সূর্য আমাদের সমর্পণ করেছে
তার উষ্ণ ত্বক মুক্তির
আমরা নীল মুখে চুমু খাই
গন্ধ নিঃশ্বাস আলো
অতি রহস্যময় মাঠের

তোমার মুখের মধ্যে আমাদের সব কথা
তোমার বুকের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর মতো
আনন্দের নূপুরকে গলিয়ে দেয়।

'অন্তরঙ্গ', 'অন্য স্বর'

সুররিয়ালিস্ট স্বয়ংচল রচনাপ্রণালীর শিক্ষা যেমন ঝাক্ প্রেভের-এর কবিতায় সুপরিস্ফুট, তেমনি সুপরিস্ফুট অরুণ মিত্রের কবিতায়। অরুণ

মিত্রও ধ্যানমগ্ন কবি. আর তাই সাবলীলভাবে এক শব্দ থেকে আর-এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর-এক চিত্রকল্পে চলে যান তিনি, ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গকে একাকার করে দেন ; উলটে দেন প্রথাকে, ভেঙে দেন, অথচ আনতে পারেন এক অন্তর্লীন প্রবাহ।

> টেবিলের উপর ঘূর্ণি আপাতত স্থির হয়ে আছে আকাশ থেকে সময়
> ঝুলছে দুলছে টিকটিক আর ঘুম ঝ'রে পড়ছে মাটিতে, বিঘের পর বিঘে,
> তার আলাভোলা গাছপালা ছোটবড় খানাখন্দ টিমটিমে রাস্তা মাঝ-
> খানে আলতো নিঃশ্বাস একটা ধুকধুক মাটির সঙ্গে বাঁধন আর একটা
> চারার সঙ্গে এম্‌নি করে বীজ পর্যন্ত টেঁকা, কোনো কথার গর্জন নেই
> কাতরানি নেই নাবাল জমিতে ওই এক ধুক ধুক।
> টেবিলের এধারে ওধারে. কাগজপত্তর কলম এলিয়ে রয়েছে তাদের
> দেয়ালায় ঘুরেফিরে পানাপুকুর ঝোপঝাড় ব্যাঙমাব্যাঙমী এক ছুটে
> ঝিমঘর থেকে তেপান্তর অথচ না ধড়মড় না দুদ্দাড় নাবাল জমিতে ওই
> এক ধুকধুক।

'বিরতি', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

এই প্রক্রিয়ায় কবি আর বর্ণিত বস্তুজগতের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে। নানান আপাতবিরোধের সংশ্লেষে তাদের যেন নতুন অস্তিত্ব শুরু হয়। স্বচ্ছ নমনীয় গদ্যকবিতায় বা গদ্যে কবিতায় মানুষ আর দৃশ্যমান জগতের মধ্যে এক গভীর সহানুভূতির বন্ধন গড়ে ওঠে। তার মধ্যে চলে আসে হৃদয়ের অস্ফুট রহস্য, অন্তরের ছায়া, এইসব কবিতায়, যা মানুষের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার উৎস থেকে উঠে এসেছে।

'এলুয়ার-এর কাব্যে চড়া সুর প্রায় নেই-ই। কবিতায় তিনি কথা বলেন ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে, যা স্বগতোক্তির মতো শোনায়। তাঁর কাব্যের মেজাজের সঙ্গে এই স্বরের সম্পূর্ণ স্বভাবগত মিল। এত একটানা অনুচ্চ স্বর যে, তা একঘেয়ে মনে হতে পারে। কিন্তু কান পেতে শুনলে তার সম্মোহন আছে, বিশেষত ঐ একটানা অনর্গল ধ্বনির।' ('পল এলুয়ার', 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে')। কবি অরুণ মিত্রের স্বরও নিচু-গলার। তাঁর কবিতার ধরন স্বগতোক্তির। প্রীতির অনুরাগের নিচু গ্রামে বলা কথা।

এই অনুচ্চ স্বরের একটানা অনর্গল ধ্বনি আমাদের সম্মোহিত করে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'না, আমার বাঁচবার চৌহদ্দিতে কোনো জলের গর্জন নেই। শুধু একটা মন্থর প্রবাহ আছে।' কথাটা এই কবির কবিতা সম্বন্ধে মানানসই। এই অনুচ্চ কণ্ঠের কবিতায় পাই কোনো গভীর মূর্ছনাময় নির্জনতা ; শব্দে-শব্দহীনতায় থিতন্মো, আলো আর অন্ধকারের চাকে নতুন করে গড়া। 'বেরোবার সময় আমি বুকপকেটটা বাজাতে বাজাতে বলি এসব কিছু নয় নিজেকেই আমার বলা···।' অরুণ মিত্রের সমস্ত কবিতা যেন নিজেকেই বলা, আমরা সেই নিচু স্বরগ্রামের উচ্চারণ কান পেতে শুনে ফেলি।

কত যোজন জুড়ে উপুড় হয়ে থাকে মাঠ
কত কথা হারিয়ে চুপ করে থাকে নদী
শহরের পথে কখন গাছের পাতা ঝরে পাতা আসে জানি না
জানি না কেমন করে শিশুরা আগুন পোহায় শীতে
কেমন করে
খুশিতে প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে
গ্রীষ্মের বেলা ফলের রসে ডগমগ হয়
বিকেলের মেঘে দেখা দেয় সমুদ্রের আভাস···

'ছয় ঋতু সঞ্চয় করি', 'উৎসের দিকে'

আমি হাওয়া থেকে রস টানছি, হাওয়া থেকে। মাটি নেই জল নেই বুক নেই মুখ নেই, না নেই। এ কেমন ছোঁয়া আমি একদিন দেখাব, দেখাবই। পৃথিবীটাকে আমি ঘুরিয়ে নেব ওই আধখানা ফালির ওপর তুমি, ভোঁ বাজার সময়কার শিশির ঝাঁঝাঁ বারোটা একটার শ্যাওলা ভরসন্ধের মাঠে বৃষ্টি পড়ছে আর হাওয়া হাওয়া এই হাওয়া!

'এই হাওয়া', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

শুধু এলুয়ারের রচনায় কেন, সমধর্মী আরো অনেক ফরাসি কবির রচনায় অরুণ মিত্র পেয়েছিলেন এই অনুচ্চ-কণ্ঠ অন্তর্লীন স্বগতোক্তির ধরন। তাঁরই অনুবাদে র‍্যনে শার-এর, একটি কবিতা তুলে দিচ্ছি, এই কথার অনুমোদনে।

গ্রামের টিলার গায়ে মিমোজা-ভরা মাঠগুলো রাত কাটায়। ফুল

> তোলার মরশুমে তাদের জায়গা থেকে দূরে এক মেয়ের সঙ্গে অতি সুগন্ধ সাক্ষাৎ ঘটে গেল, এমন হয়। সে-মেয়ের হাতদুটো সারাদিন ভঙ্গুর শাখাপ্রশাখায় ব্যাপৃত ছিল। সুরভি যার জ্যোতির্বলয় এমন এক প্রদীপের মতো সে অস্তগামী সূর্যের দিকে পিঠ ক'রে চলে যায়। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে পবিত্রতাকে অপমান করা হবে। পাদুকায় ঘাস মাড়াতে মাড়াতে তার পথ ছেড়ে দিয়ো। হয়তো সৌভাগ্যক্রমে দেখতে পাবে তার ওষ্ঠে রাত্রির আর্দ্রতার মৃগতৃষা।
>
> 'বাতাসকে বিদায়', 'অন্য স্বর'

এইভাবে মৃদু স্বগতোক্তির গদ্য-লিরিসিজম জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়ে যায়। স্নিগ্ধ প্রেমের সেই একটানা স্বর কখনো ঈষৎ একঘেয়ে মনে হতেও পারে, কিন্তু তার সম্মোহন আমাদের আচ্ছন্ন করে। অরুণ মিত্রের জগৎ এক ধ্যানের জগৎ এবং সেই ধ্যান প্রেমকে ঘিরে। ঘৃণা আর ক্রোধের প্রকাশ-মুহূর্তেও তিনি প্রেমের শিকড় থেকে বিচ্যুত হন না। যেমন এল্যুয়ারের কাব্যের, তেমনি অরুণ মিত্রের কাব্যের বিহার বিশুদ্ধতার আকাশে।

আর পের্সের কবিতার মতোই এই একটানা নিচু গলার প্রবহমান কবিতা আশ্চর্যরকমের অখণ্ড। অবশ্য পের্সের মতো সমস্ত বস্তু আর সমস্ত মানুষ নিয়ে মহাকাব্যিক মহিমা এখানে পাই না, পাই না বিচিত্র ও বিভিন্ন ধ্বনিতরঙ্গ মিলিয়ে কোনো বিশাল সিমফনিক স্বরমণ্ডলের স্থাপত্য-মহিমা। কিন্তু অরুণ মিত্রেরও প্রত্যেকটি কবিতা অন্যসব কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত, 'প্রান্তরেখা'র পরবর্তী সব কাব্যগ্রন্থ যেন একই অখণ্ডতার নানা পর্ব। প্রত্যেকটি গ্রন্থ অন্যসব গ্রন্থের সঙ্গে আশ্লিষ্ট। প্রথম থেকে শেষ অবধি একটি নিরবচ্ছিন্নতা পাই আমরা। যেমন পের্সের কবিতা ভেঙে-ভেঙে, খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না, তার আবহাওয়ার সমগ্রতাটাই আমাদের অনুভব করবার, তেমনি অরুণ মিত্রের কবিতা। এই নিরবচ্ছিন্নতার ভাবটি কবিতার শরীরেও ফুটিয়ে তোলার জন্যে তিনি 'প্রান্তরেখা'র পরবর্তী কাব্যে যথাসম্ভব ছেদচিহ্ন বর্জন করেছেন — দাঁড়ি ছাড়া বিরল ক্ষেত্রে কমার ব্যবহার-মাত্র পাই আমরা। কবিতার অন্তঃশরীরে যে নিরবচ্ছিন্নতার মৃদু অনর্গল

প্রবাহ, বহিঃশরীরেও সেই প্রবাহ এইভাবে সাকার হয়েছে। এই ছেদচিহ্ন বর্জন ব্যাপারটা এল্যুয়ার-এর কবিতারও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামই *Poésie Ininterrompue*, নিরবচ্ছিন্ন কাব্য। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা যেমন এল্যুয়ার-এর তেমনি অরুণ মিত্রের কাব্যের একটা বড় লক্ষণ। অন্তত 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩) থেকে 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' (১৯৮৬) কবিতার বইগুলির যেন আলাদা-আলাদা নামকরণের দরকার ছিল না। প্রেম ও নিঃসঙ্গতাকে এক অন্য-নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এমন এক নিরবচ্ছিন্ন কাব্য লিখে চলেছেন, যা 'সব মানুষের হৃদয়ের কাছে কথা বলে।' চতুর্ধারে অবিশ্বাস আর শূন্যতা ; তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই জীবনবোধের মিস্টিক কবির বিনীত উচ্চারণ শুনি আমরা

হেরো কী বিশ্বস্ত আমি
তোমার করুণা গাই গেয়ে চলি।

'মহিমা', 'প্রথম পলি শেষ পাথর'

সুমিতা চক্রবর্তী

—

প্রগতি-আন্দোলন ও অরুণ মিত্রের কবিতা

তাঁর কাছে মাঝেমাঝে যাই। সহজেই পেঁাছনো যায় তাঁর কাছে। যখন শারীরিক কারণে বা সাংসারিক দায়িত্বে অপ্রাপণীয় নন—তখনই তিনি কথা বলতে প্রস্তুত। সব প্রশ্নেরই উত্তর পাই—সরল, স্পষ্ট উত্তর। প্রায়ই বলেন, র‍্যাঁবো-র কবিতা তাঁর ভালো লাগে। চেতনার গহনে ডুব দেওয়া, সত্তা-সংকটের যন্ত্রণায় বিদ্ধ এই আত্মধ্বংসী তরুণের কবিতা ভালো বলতে শুনি নি আর কোনো সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট কবিকে। প্রশ্ন করি: কেন ভালো লাগে। তিনি বলেন: 'র‍্যাঁবো-র কবিতায় গভীর আন্তরিকতা —একেবারে ভেতর থেকে বলা। ভেতরের অনুভূতিতে গিয়ে ধাক্কা দেয়, আমাকে টানে।' কথাটি আমি ঘুরেফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। দেখতে চাই—আর কারো নাম তিনি করেন কিনা। নেরুদা বা মায়াকোভ্স্কির কবিতা নিশ্চয়ই ভালোই লাগে তাঁর, কিন্তু তাঁদের নাম তিনি করেন না। মালার্মে ভালো লাগে না। এল্যুয়ার ভালো লাগে—যদিও তাঁর মতে কখনো কখনো একটু বেশি আলংকারিক। আর, বারবার বলেন—র‍্যাঁবো। তারপর স্যাঁ-ঝন্ পের্স। শিল্পসৃষ্টিতে অনুভবের গভীরতা ও সততা এভাবেই তাঁকে টানে।

'ছন্দের কবিতা লেখেন না কেন আপনি?' এ প্রশ্নের উত্তরে অরুণ মিত্র জানান, ছন্দে-মিলে লিখতে তাঁর ভালো লাগে না। যদিও আগে প্রচলিত ছন্দে বেশকিছু কবিতা তিনি লিখেছেন। তবু ওটা কৃত্রিম, আলাদা করে চেষ্টা করতে হয়। এই মতটি তিনি লিখিতভাবেই জানিয়েছেন: 'কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারেবারে তাদের (ছন্দ ও মিল) কাছ থেকে

বাধা পেয়েছি বলেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।··· মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনিবিন্যাসে করতে পারে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে-শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধরে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্যে কবিতার বক্তব্য বিপথে চলে যেতে পারে।'

'কবিতা, আমি এবং আমরা'। 'পরমা' সংকলন, শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪

কিন্তু উপমাবিহীন তো হয় না কোনো কবিতা। অরুণ মিত্রের কবিতার মূল ভাষাটাই প্রতীক-গর্ভ চিত্রকল্পে মূর্ত হয়। এই আলংকারিকতাও কি বাধা হয় না কখনো ? অরুণ মিত্র বলেন : আলাদা করে সেটা ভাবা হয় নি। ওই চিত্রকল্প, ওই প্রতীকের ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সেই বিশেষ অনুভব। তাকে বলা যায় না অলংকার, তা-ই তার অস্তিত্ব।

অরুণ মিত্রের কবিতায় এই প্রতীকাধার অলংকৃতির কথা কোনো কোনো সমালোচক যখন উত্থাপন করেছেন, তখন সম্ভবত কবির মনে জমে উঠেছে একটু বিরুদ্ধতা। কোনো সময়েই নিজের কবিতার অলংকরণ বা আলংকারিকতার কথা আলাদা করে বলা হোক তা বোধহয় তিনি চান না। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

কবিতায় কথা বলি তা নাকি তক্ষুনি হয়ে যায়
অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো।
এ সজ্জা বানাতে আমার তো দিন যায় রাত যায়
বিন্দু বিন্দু রক্ত যায় ; একবার প'রে দেখতে পারো
কোথায় তা ঠিক্‌রোয় আলো, প্রসাধনে,
না তোমার হৃৎপিণ্ডে ? হাজারটা কোণ
চামড়াকে আদর করে, না রক্তাক্ত পথ ধ'রে
হাড়ে বেঁধে ? পরো, প'রে ছাখো।

'অলঙ্কার' 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

তবে কবিতার জন্য নির্মাণ-শ্রম ও পরিমার্জনা প্রয়োজন—একথা তিনি জানেন। অনুভবকে সত্য করার জন্যই, তার বহিরঙ্গকে সুন্দর করার জন্য নয়।

অরুণ মিত্রকে আর একটি প্রশ্ন করেছিলাম একবার। 'আপনার গদ্য-লেখাগুলিতে ভারি একটি স্বচ্ছতা আছে। আপনার মতামতও খুব পরিষ্কার। বেঁচে থাকার পদ্ধতিতে একটা যুক্তির অনুসরণ চান আপনি?' তিনি অপ্রত্যাশিত উত্তর দেন : 'না, যুক্তি-বুদ্ধির প্রাধান্য নয়, হৃদয় দিয়েই আমি বাঁচতে চাই।' —বুঝতে পারি, প্রশ্নটাই ভুল ছিল। আবেগের প্রবলতা ছাড়া কেউ কি কবি হতে পারেন! জীবনের দীর্ঘ ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে সাত দশক ধরে অনমনীয় ভাবে যিনি একজন কবি!

অরুণ মিত্রের কাব্যানুভবের উৎস ও অবলম্বন প্রথমাবধি অবিচল। তা হল মানুষ। সাধারণ মানুষ। তাঁর কবিতায় ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতা নেই। নিসর্গও নেই সেভাবে। কেউ কেউ বলেছেন অবশ্য : 'আদিম নিসর্গের জন্য সংরক্ত আকুতি অরুণ মিত্রের কবিতাকে এক বিশেষ আবেগে স্পন্দিত করেছে। জল, মাটি, ফসল, আলো-বাতাসের কামনা এক সান্দ্র স্বপ্নময়তা জড়িয়ে দিয়েছে তাঁর উচ্চারণে। কখনও কখনও বা এরা হয়ে উঠেছে প্রতীক, মুক্তির বা পূর্ণতার বা শুদ্ধতার।' (অরুণ ঘোষ, 'সাহিত্য-চিন্তা', মে ১৯৭৭)। কিন্তু মনে হয়, নিসর্গ তাঁর কবিতায় সবসময়েই হয় পরিবেশ, না হয় প্রতীক। জল-উৎস, রৌদ্র, ফসল—তাঁর কবিতায় মানুষের বাঁচার সংগ্রাম ও সাফল্যই সূচিত করে। নিসর্গের নিজস্ব টান তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ বা সাঁওতাল-পরগনা-মুগ্ধ বিষ্ণু দে-র মতোও অনুভব করা যায় না।

'জনজীবন বরাবরই আমাকে প্রভাবিত করেছে। সর্বসাধারণের নড়াচড়া সম্বন্ধে একটা বোধ আমার মনের পটভূমিতে সবসময় থাকে বলে লেখায় তার ছায়া পড়ে মনে হয়' ('কবিতা-পরিচয়', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭)—এই কথা বলেন অরুণ মিত্র। মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শুদ্ধ স্বর বা রূপ তাঁকে টানে বলে মনে হয় না। সম্ভবত সেজন্যই তাঁর কবিতায় কোনো রহস্যময়তা, অতিদুরূহতা বা ধ্বনি-আবহের মায়া নেই। অথচ তা যে অত্যন্ত সরল তাও নয়। সাধারণ কথা ও চেনা দৃশ্যমালাই তিনি উপস্থিত করেন অথচ তাদের বিন্যাসে তৈরি হয় একটা নতুন রকমের প্রগাঢ় টান যা আমরা আগে অনুভব করি নি। আমাদের খুব চেনা জীবন থেকেও যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে অচেনা আলো ঠিকরে ওঠে—তেমনিই তাঁর কবিতা :

মানুষ ও জনজীবনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার এই বিশেষ প্রবণতাটিই অরুণ মিত্রকে দিয়েছে তাঁর কবিতার নিজস্ব রূপ ও ভাষা। এই প্রবণতাই তাঁকে নিয়ে গেছে সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনার দিকে। এবং এই প্রবণতাই তাঁর সৃষ্টিকে কোনো তত্ত্বের আরোপে পূর্ব-পরিকল্পিত আকার দেওয়ার ভ্রান্তি থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছে।

১৯০৯ সালে অরুণ মিত্রের জন্ম। মামার বাড়ি যশোরে কেটেছে বাল্য ও কৈশোর। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত পরিবেশে সমকালীন পত্রপত্রিকা ও নানাধরনের বই পড়া সম্ভব হয়েছিল। কবিতা লিখতেন খাতা ভরে। সন্ত্রাসবাদী কিশোর-পত্রিকা 'বেণু'তে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা ষোলো বছর বয়সে। রিপন কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। সমকালীন আর পাঁচজন ছাত্রের মতোই জীবন। তাঁর নিজের কথায় সেই সময়ের কবিমানসের সংক্ষিপ্ত একটি ছবি :

> 'আমার স্থায়ী বাস ছিল কলকাতায়। কবিতার প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। তখনকার কবিতা অনুরাগী সব বাঙালি ছেলের মতো আমারও প্রথম প্রেম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতা পড়ে আমি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। ··· অন্যদের কবিতাও আমি পড়তাম। যেমন নজরুল, মোহিত মজুমদার, সত্যেন দত্ত। কিছু অন্যরকম লাগত ঠিকই, তবে তা আমাকে অভিভূত করত না। সেই সময় থেকেই আমার কবিতা লেখার চেষ্টা।···সেসব রচনা তেমন কিছু হত না বোধহয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। লিখতেই বেশ ভালো লাগত আমার। ···আসলে তখন লেখার বা ছাপার হরফ ছাড়িয়ে যে-জীবন, সেটাই আমাকে বেশি কৌতূহলী করে রাখত।'
>
> 'আমার জীবন : আমার সময়'। 'মৃদঙ্গার', বিশেষ সংখ্যা, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫।

এই ছাত্রজীবনেই কিন্তু একটি স্বতন্ত্র জায়গা নিজের জন্য তৈরি করে নিচ্ছিলেন অরুণ মিত্র, যা তাঁর কর্মজীবন ও মানসজীবনের অংশ হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে। তিনি এরই মধ্যে নানাভাবে ফরাসি ভাষা শেখার চেষ্টা করতেন। কৈশোরে 'লে মিজেরাব্‌ল' পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল—এই

সাহিত্যটি জানতে হবে। কলেজের ছাত্র থাকার সময়ে নানাভাবে তিনি ফরাসি-জানা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ও তাঁরই ভাষায় 'এলোমেলোভাবে' কিছুটা শিখে নেবার চেষ্টা করতেন। সেভাবেই শিখে নিলেন তিনি। পরে আলিয়ঁস ফ্রঁাসেজ-এ কিছুদিন কাজও করেন। তাঁর স্বাভাবিক পঠন-পরিধি ফরাসি ভাষা জানা থাকায় অনেকটা বেড়ে যায়।

বিশ শতকের একজন সাহিত্যিককে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় স্বকালে এবং কিছুটা কালোত্তীর্ণতায় তাহলে তাঁকে হতেই হবে মননঋদ্ধ। যুগটাই এমন যে হৃদয়াবেগ যতই প্রবল হোক—আজকের শিল্পী যদি মননী অভিজ্ঞতার চর্চাকে অব্যাহত না রাখেন, যদি আবেগকেও না করে তোলেন বৈদগ্ধ্য ও মনীষায় সমৃদ্ধ, তাহলে যুগের বহুমুখ অনুভবকে ঠিকমতো স্পর্শ করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। সে-চর্চায় কোনো ফাঁক তাঁর ছিল না কখনো। এভাবেই তাকে বিস্তৃত করে নিতে শুরু করেছিলেন তিনি।

তবু অরুণ মিত্রের কাব্যভুবনের অবলম্বন মানুষ—মনীষা, বৈদগ্ধ্য, বা অন্য কোনোরকম তাত্ত্বিক অনুভূতি নয়। সে-মানুষ রবীন্দ্রনাথের 'মহা-মানবের সাগরতীরে'-র মতো কোনো মহৎ মানবতার ধারণা বহন করে না। জীবনানন্দের কবিতায় প্রকাশিত বিনাশী-অবিনাশী শক্তির দ্বন্দ্বে মথিত প্রতীকী মানবও সে নয়। একান্তই গ্রাম-শহরে বাস করা, কাজে-অকাজে জড়ানো, নিত্য-দেখা সংসারের মানুষ। তাদের জীবনের নিহিত সংগ্রাম ছুঁতে চাওয়াই তাঁর কবিতার সাধনা। একাজের জন্য সাধারণ মানুষকে জানতে হয় খুব কাছে থেকে, আর খুব স্বাভাবিকভাবে। রবীন্দ্রনাথের দুর্মর আভিজাত্য আর জীবনানন্দের স্বভাবের দুর্মোচ্য গুণ্ঠন জনজীবনের সেই নৈকট্যে তাঁদের আনতে পারে নি। জনজীবন থেকে সেই 'ঘনিষ্ঠ তাপ' আহরণ করেছেন অরুণ মিত্র। তাঁর সময় ও তাঁর কর্মজীবন নানাভাবে তাঁর সহায়ক হয়েছে ত্রিশের দশক থেকেই।

পারিবারিক অবস্থার চাপে এম. এ. পরীক্ষা না দিয়েই তিনি চাকরি নিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৩১-এ। প্রাপ্তবয়স্কতার প্রথম স্তরেই সাংবাদিক রূপে জীবন দেখতে শুরু করার সুফল তাঁর কবিতায় প্রকাশিত।

সাংবাদিকের কাজই হল খোলা চোখে, বস্তুনিষ্ঠ মেজাজে জীবনকে দেখা। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে যাওয়া। অথচ দেশ ও কালের প্রতিটি স্পন্দন সম্পর্কে অনুভবের একটি গাঢ়তা ও খরতা না থাকলে সম্ভব নয় ভালো সাংবাদিক হওয়া। নিজের দৃষ্টি ও ভাবনাকে সমাজ ও সমকালের সঙ্গে মিশিয়ে দেখার যে প্রবণতা অরুণ মিত্রের ছিল তা এই কাজের মধ্য দিয়ে আরো স্ফূর্ত হল।

১৯৪২ পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কাজ করেছিলেন তিনি। ঐ সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হল তাঁর কবিজীবনের প্রথম উত্তরণের পর্যায়। ত্রিশের দশকে ফ্যাসিজম-বিরোধী যে চেতনা গড়ে উঠেছিল বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তারই একজন প্রবক্তা। মার্কসীয় চিন্তাপদ্ধতিকে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, স্বাগত জানিয়েছিলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে —তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। অরুণ মিত্রকে তিনি গ্রহণ করলেন আত্মীয়ের মতোই। সেই সংস্পর্শ অরুণ মিত্রকেও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দিকে নিয়ে গেল। সেই সময়টাতে ভারতে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা যাঁরা করতেন তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে ফ্যাসিজম-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা তখন প্রতিটি ভারতীয়ের শিরায় বহমান। অরুণ মিত্র একবার বলেছিলেন : 'পরাধীনতার নিরন্তর ক্ষোভ এখনকার ছেলেমেয়েরা ঠিক বুঝবে না। আমরা একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীবাদ, কৃষক-সংগঠন সবেতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম কারণ সবই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী।' অরুণ মিত্রের ব্যক্তিগত এই ক্ষোভ বৃহত্তরভাবে জনমুখী হতে লাগল, সাংগঠনিক রূপ পেতে শুরু করল এই সময় থেকেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময় থেকেই তাঁর লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং কিছু কিছু সংরক্ষিত হচ্ছে। 'ভারতবর্ষ' এবং শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত।

১৯৩৬-এর জুলাই মাসে গোর্কির মৃত্যু (১৮ জুন) উপলক্ষে আয়োজিত প্রগতি-লেখকসঙ্ঘের একটি শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রগতি-লেখকসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে তার দু-মাস আগে লখনউতে।

অনুমান করা যায়, অরুণ মিত্র এই কর্মকাণ্ডকে লক্ষ করছিলেন সম্পূর্ণ-ভাবে। ১৯৩৭-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন লেখক-সাংবাদিকরা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে কেন্দ্রে রেখে 'অনামী চক্র' নামে মার্কসীয় চিন্তাচর্চার যে আলোচনা-চক্র স্থাপন করেছিলেন তার অন্যতম সদস্য ছিলেন অরুণ মিত্রও। ১৯৩৭-এ প্রগতি-লেখকসঙ্ঘ 'প্রগতি' নামের যে সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন তাতে ছিল অরুণ মিত্রের একটি কবিতা এবং আঁদ্রে জীদ-এর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ। ১৯৩৫-৩৬ থেকে যেসব কবিতা তিনি লিখেছেন তার কিছু কিছু সংকলিত হয়েছে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'তে।

এই কাব্যগ্রন্থটির মধ্যেই কবি অরুণ মিত্রের রচনার একটি গতিরেখা যেন অনুভব করা যায়। অনেক কবিতাতেই লিরিকের একান্ত আত্মহৃদয়-নির্ভরতা। ভাষায় তখনো তৎসম শব্দাবলির ঐতিহ্যানুসারী বিন্যাস। পরিবেশ ও নিসর্গকে তখনো নিজের চোখে দেখছেন না।

আমার কুঠুরী পরে এক টুকরো নীলে
আহ্নিক চক্রান্ত চলে। দিবসের চাঁদে
নিশান্ত তারার স্বর কখনো বা কাঁদে,
রথচক্র-রেশ লাগে মেঘের মিছিলে
তারপর ; কল্পনায় হৃদয়ের মিলে
খুশী হয় হৈম দিন···

'হে হৃদয়'

কবিতাটি অক্ষম রচনা নয়। ছন্দে ও মিলে সুবদ্ধ একটি সনেট। ভাব-বৃত্তেও আসে এরপর একটি সংঘাত-আভাস, তারপর উত্তরিত প্রশান্তি—'হে হৃদয়, মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে।' কিন্তু কবিতাটির শব্দ-যোজনায় ও কল্পিত দৃশ্যমালায় একটি ধারার ছাপ স্পষ্ট। এই পর্বে চিত্রকল্প ও ভাষা-সমবায়ের কয়েকটি নমুনা : 'প্রহরী পাখার ব্যর্থ বিধুনন', 'ললাটিকা উল্কা-মুখী', 'অসিধারা-সীমা', 'অবরোহী ক্ষেতের বিহার'। আজ আর অরুণ মিত্র এই ভাষায় কবিতা ভাবেন না। এই পর্বের একটি নিসর্গ-বর্ণনা :

রৌদ্রালোকে বালুকণা হীরাজ্বলা জ্যোৎস্নার বাহার
বিগলিত উপকূলে, নারিকেল মাথার ঝালর—
সুবিন্যস্ত পটভূমি ছবিতেই মানাবে এবার।

'সৈকত'

আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিষ্ণু দে-র ভাষা-ভঙ্গি। এবং আর একটি কবিতাংশ

ঘূর্ণিত পতন আছে আশে পাশে যোজন-গভীরে,
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি,
দ্বিখণ্ডিত রশ্মি হায় নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

'দোটানা'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাগ্‌রীতির স্মৃতি যেন বহন করে। ১৯৩৮-এর কাছা-কাছি সময়ে এই দুই কবিকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। একমাত্র জীবনানন্দের টানে ভাসলে তবেই একে অস্বীকার করা যেত। কিন্তু প্রথম পর্বের জীবনানন্দ এতটাই মগ্ন ছিলেন প্রকৃতিতে, অতীতে, চেতনার মায়া-চ্ছন্নতায় যে স্বচ্ছ মনের স্বচ্ছ প্রকাশে উৎসুক অরুণ মিত্র কোনোদিনই তাঁর পথে যেতে চান নি।

এরই মধ্যে, এই পর্বেই দু-একটি জায়গায় তিনি অন্য ধরনের ছবি নিয়ে আসছেন তাঁর কবিতায়, নেমে আসছেন একেবারে জনজীবনের মাঝখানে।

···আর কারা রাস্তায় ?
রেঙ্গুনে চায় দু'মাহিনা ভর কাজ—
খনি-খামারের দেশ কি দেয় বিদায় ?

'প্রবাস'

তাঁর ভাষাও যেন দু-একবার চলিত বিন্যাস ছেড়ে নিজের স্বরে বেজে উঠেছে—'রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো'···('ভূমিকা')/ 'হাড়ের ভেল্কি লাগুক বিসংবাদে' ('এবার')।

এই প্রথম পর্বের পরে অরুণ মিত্রের কবিতার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৪০-এর অল্প আগে থেকে। এই সময়েই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি

এমন কয়েকটি কবিতা লিখলেন যাদের ওপর নির্ভর করেই তাঁকে বামপন্থী কবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৩৯-এ 'অগ্রণী' 'বামপন্থী মাসিক পত্রিকা' রূপে ঘোষিত হয়ে প্রকাশিত হল। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী প্রগতি-চেতনা এই সময়ে একটা সৃজনশীল সংহতি অর্জন করেছে। 'অগ্রণী'তে খুব বেশি না হলেও অরুণ মিত্রের কিছু কবিতা এবং ফরাসি গল্প ও প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়েই লেখা হয় তাঁর 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি। এই ধরনের কবিতার ধারা তখনও স্ফীত হয়ে ওঠে নি। অনেকেই মনে করেন, এই জাতীয় 'সাম্যবাদী' কবিতা রচনায় অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহার'-ই পথিকৃতের সম্মান পাবার দাবিদার।

> এখন প্রহর গোণো।
> উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
> কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার ;
> দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো ;
> মানুষেরা হুঁশিয়ার!
>
> লাল অক্ষরে লটকানো আছে দ্যাখো
> নতুন ইস্তাহার।

এরকম কবিতা তিনি আরো কয়েকটি লেখেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২—এই সময়টাই বাংলার মার্কসীয় চিন্তা ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রায় সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ থাকার কাল। ১৯৪১-এর জুনে হিটলার সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করলে এই মনোভাব হয়ে ওঠে ঘনবদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃৎসমিতি', প্রকাশিত হয় 'সোভিয়েট দেশ' নামে এক সংকলন (১৯৪২)। গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্রের সম্পাদনায় গ্রথিত এই সংকলনে 'সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন অরুণ মিত্র। এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রকাশ করতে শুরু করেন সাপ্তাহিক 'অরণি'। 'অরণি'তে অরুণ মিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (১৯৪১-৪৮)

যুক্ত থাকেন। ১৯৪২-এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কাজ তিনি ছেড়ে দেন। ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর বিরোধিতা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি, দেশের স্বাধীনতার চেতনা ও সেইসঙ্গেই জনযুদ্ধের ধারণা উজ্জীবিত রাখা, অ-সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন, শ্রমিক-কৃষকদের কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি বহু কাজ 'অরণি' করে—যা সেই সময়ে নতুন ছিল এবং প্রয়োজনীয় ছিল।

'অরণি'তে অনেক কবিতা লিখেছেন অরুণ মিত্র। সময়-প্রবাহকে অস্বীকার না করে স্পষ্ট সমাজতন্ত্রীয় ধারণার কাব্যরূপও দিয়েছিলেন কিছু। উদাহরণ :

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া
জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া
রাখবই
ভাই হো

'কসাকের ডাক : ১৯৪২'

দুর্গ-প্রাকারে প্রহরী বিধাতা বাণী শোনায়
মোটা মুনাফার বেতনভুক ;
পিছমোড়া হাত প্রণামী গুণবে— জন্মগত
সে অধিকার।

···মাঠ কারখানা দেখে আকাশ—
অস্ত্রফলকে প্রতিফলন,
আগামীকাল
ঝুঁকে তাকায়।

'সামরিক'

এই পর্বে এরকম কবিতা লেখার নানা কারণ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু অরুণ মিত্র আরো কোনো কোনো কবির মতো কবিতা-রচনার এই রীতিপদ্ধতিতেই স্থির হয়ে রইলেন না। সব সময়েই মানুষ ও জনজীবনের কবিতা লিখলেন তিনি, তার আশা-সংগ্রামেব কথা শোনালেন, সাম্যবাদী

ভাবনার মূল সূত্রগুলি মোটামুটি থেকেই গেল তাঁর মনে ও সৃষ্টিতে। কিন্তু সাম্যবাদী বাংলা কবিতার ওই বিশেষ ভঙ্গিটি—উচ্চকণ্ঠ, উন্মাদনাময়, জনসংগ্রাম-সমর্থনের ঘোষণা-ধ্বনিত-রূপটির টান তিনি ধীরে ধীরে ছেড়ে এলেন। প্রবিষ্ট হলেন মানুষের অস্তিত্ব, সত্তা ও পারিপার্শ্বিকের নিরন্তর সংঘর্ষণের মধ্যে। সেই মানুষের কথাই তিনি বললেন—যে সব সময়েই মিছিলে হাঁটছে না, গর্জন করছে না, অস্ত্র হানছে না বা হাতুড়ি ঠুকছে না। কিন্তু প্রতিমুহূর্তের দিনযাপনের প্রতিটি কাজ ও ভাবনার মধ্য দিয়ে যে একটা কঠিন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে দিনরাত। একই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে অগ্রসর হচ্ছে কোনো এক লক্ষ্যে।

অরুণ মিত্রের কবিতা-ভাবনার এই পরিণতির কারণ কিছুটা নির্ণয় করা যায় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮-এর 'অরণি'-পর্বের ইতিহাসে।

'অগ্রণী'তে অরুণ মিত্র লিখতেন, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন না সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে। 'অগ্রণী'র সঙ্গে যুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে সাম্যবাদের সম্পর্ক বিষয়ে ছিলেন একটু বেশি কঠোর, শিল্প-শরীরে স্রষ্টার দ্বিধাদ্বন্দ্বের চিহ্নকে তাঁরা মনে করতেন পশ্চাদপসরণ, ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসের কাব্যরূপ তাঁদের মনকে টানত না। সমর সেনকে আক্রমণ করে 'অগ্রণী'তে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সরোজ দত্ত। বিনয় ঘোষ সমালোচনা করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন সকলকেই। পক্ষান্তরে, 'অরণি'তে আক্রমণাত্মক লেখা কিছু প্রকাশিত হলেও তার আবহাওয়া ছিল কিছুটা খোলামেলা। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে 'অরণি' শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত। কোনো কোনো লেখক একটু উগ্র মতবাদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও লেখক-তালিকায় কচিৎ স্থান পেয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু। সেই সময়ের মার্কসবাদী চিন্তাবিদরা শিল্প-সাহিত্যের ওপর অতিরিক্ত শাসন আরোপ করতে গিয়ে কিছু কিছু ভ্রান্তির আবর্তে পড়েছিলেন—একথা মোটের উপর স্বীকার করেছে পরবর্তীকাল। এ জিনিশ ঘটেছে বাংলায় শুধু নয়, সারা পৃথিবীতেই। ১৯৪৭-এ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শিল্পসাহিত্যের

বিষয় ও রীতি সম্পর্কে যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল তা নিয়ে ফরাসি কমিউনিস্ট লেখকদের বিতর্কের ইতিহাস সকলেরই জানা। এই বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছিল 'অরণি'তে। প্রকাশিত হয়েছিল রজের গারোদির বক্তব্যের অনুবাদ। গারোদি ও পিয়ের এরভে—শিল্পের ক্ষেত্রে পার্টি লাইন-অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। অরুণ মিত্রের সমর্থন ছিল গারোদি ও এরভে-র দিকে—যেমন ছিল বিষ্ণু দে-রও।

এমনও মনে করার কারণ আছে যে, তরুণ বয়স থেকেই ফরাসির মতো একটি সমৃদ্ধ ও সুপরিণত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে তাঁর মনের মধ্যে খোলা হাওয়া চলাচলের দরজা কিছুতেই রুদ্ধ হতে পারে নি। ফ্রান্সের শিল্পী-সাহিত্যিকরা চিরকাল বন্ধন-অসহিষ্ণু। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা যদি স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদের হাতে বিপন্ন হয়, সেখানে তাঁরা প্রতিবাদী। আবার, লেখক-সত্তার স্বাধীনতার ওপর কোনো অনুশাসনের হস্তক্ষেপও তাঁদের সহ্য হয় না।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৮-এর বাংলাদেশে অরুণ মিত্র সাম্যবাদী গোষ্ঠী-সমূহের সঙ্গে ছিলেন—এই সত্যটি কিন্তু তাঁর কবি হয়ে-ওঠার ইতিহাসে তাৎপর্য-হীন নয় একেবারেই। মার্কসবাদী চিন্তা ও গঠনমূলক কার্যাবলি চল্লিশের দশকে যেসব কবি ও শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অরুণ মিত্র তাঁদেরই একজন। যদিও ভাবনা তখনো অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সংহত হয় নি, যদিও তর্কবিতর্ক লেগেই ছিল রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-কে নিয়ে—তবু সমাজবোধ ও মানবতাবোধের বিশেষ সাম্যবাদী ধরন, সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিকর্মে রিক্ত মানুষ ও সমাজচৈতন্যময়তাকে প্রতি-ফলিত করবার একটি মূলস্পর্শী অভিপ্রায় অনেকেরই চেতনার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেকের পথভ্রষ্ট হবার অনেক উদাহরণ সত্ত্বেও বাংলার চল্লিশের দশক সত্যিই যে বাংলা সাহিত্যের ও শিল্পের একটি অন্য-মুখ অসম্ভব উজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

অরুণ মিত্র নিজেও খানিকটা এরকম কথা বলেছেন একবার : 'কবিতা বা যে-কোনো শিল্পরচনার কাজ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে দল বা আন্দোলনের কোনো ভূমিকা নেই। তবে সাহিত্যে বারেবারে দেখা

যায় আন্দোলনের পর্ব। তার তাৎপর্যও আছে। ইতিহাসের বিশেষ সময় এবং বিশেষ পরিস্থিতির কারণে কোনো ধরনের প্রবণতা ও ভঙ্গি সৃজনশীল মনে প্রধান হয়ে ওঠে, অনেকের মনে। সেই লক্ষণগুলো মোটামুটি এক আন্দোলন হিশেবে চিহ্নিত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকরা তাতে কার্যত অংশগ্রহণও করেন। সুতরাং এসব আন্দোলনে ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং সমষ্টিস্বভাব এক ও অবিচ্ছিন্ন বলা যায়।' ('প্রশ্নোত্তর'। 'আজ কাল পরশু', অরুণ মিত্র সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮০)।

আমাদের মনে পড়ে, একদা বুদ্ধদেব বসুকে একটি চিঠিতে বিষ্ণু দে-ও প্রায় একই রকম কথা বলেছিলেন, 'অন্তঃপ্রেরণার তাড়নায় লেখে সবাই, কিন্তু দৈবাৎ যদি সেই তাড়না সাহিত্য সমাজ ও শিল্পের ব্যক্তিত্বহীন নির্দেশে মিলে যায়, তাহলেই কবির সাধনা সার্থক এবং কবিতা যাকে বলে সাবালক। নয় কি?' ('কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫)। এইসঙ্গে যদি মিলিয়ে নিই পূর্বোক্ত সংকলনে ধৃত অরুণ মিত্রের আর একটি উক্তি 'আমি আমার কালের মানুষ এবং মনুষ্যজীবনের সঙ্গে না জড়িয়ে কবিতাকে ভাবতে পারি না'—তাহলে মনে হয়, কবির মনোগঠনের অন্তত কিছুটা উপাদান এসেছিল ওই প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্য দিয়েই।

একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, 'সাহিত্য সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ', 'সাহিত্য একান্ত ব্যক্তিমনের আবেগ-কল্পনার অভিক্ষেপণ' ইত্যাদি মতের একাধিপত্য থেকে সরিয়ে এনে দৃঢ়ভাবে সাহিত্যকে জনজীবনের সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই সময় ও এই সমাজতন্ত্রীয় চিন্তা। মানুষ যে সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, মানবমুখিতা ও সমাজমুখিতা যে একই সত্যের দুটি দিক—এই বোধকে প্রায় সংস্কারে পরিণত করা গিয়েছিল এই দশকে। দলীয় কাজকর্মের ভিতর দিয়েই মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া গিয়েছিল শ্রমজীবী সমাজের নৈকট্যে। নিজেদের সীমা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত মন সচেতন হয়েছিল, খানিকটা যেতে চেয়েছিল লোকজীবনের কাছাকাছি। এই অভিজ্ঞতার অর্জন মূল্যবান হয়েছিল অরুণ মিত্রের জীবনে, এই শিক্ষায় এমনভাবে একটা সম্পূর্ণতা পেয়ে গিয়েছিল তাঁর মন যে পরে আর কোনো-সময়েই তাঁকে স্ববিরোধীভাবে ভিন্ন পথে যেতে হয় নি।

একই সঙ্গে দেখতে পাই, সাহিত্যের সৃষ্টি-উৎস সম্পর্কে গোঁড়া বামপন্থী ধারণার সঙ্গে মেলে না তাঁর মত। ১৯৪৪ সালে 'কেন লিখি' নামে যে সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তার মুখবন্ধে দুই সম্পাদকের যুগ্মস্বাক্ষরে লিখিত হয়েছিল একটি একমুখী বাক্য : 'একথা আজ স্বীকৃত যে সাহিত্যের ও শিল্পের তাগিদ আসে সমাজ থেকে, মেঘলোক থেকেও নয়, মানুষের অন্তরলোক থেকেও নয়।' কিন্তু অরুণ মিত্রের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তিনি এব্যাপারে কতটা ভিন্নমত পোষণ করেন—'কোন লেখক কী লিখবেন তা তাঁর সৃজনমুখী প্রবণতা ভেতর থেকেই ঠিক করে নেয়।' ('সাহিত্যে সৃজনক্রিয়া : উৎস এবং অববাহিকা', 'প্রমা', অক্টোবর ১৯৭৯)। আরো সাম্প্রতিককালে তিনি লিখেছেন, 'সৃষ্টির সাফল্য বা মহত্ত্ব তো ভাবনা থেকে তৈরি হয় না, তার উৎস এক অনির্দেশ্য ক্ষমতা যা প্রাণবায়ুর সহোদর।' ('বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা', 'শিলাদিত্য', ১-১৫ মে ১৯৮৩)। শিল্পসৃষ্টির মহত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি সাম্যবাদী চিন্তাবিদদের সঙ্গে সর্বাংশে একমত নন। নিজের মতামত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করতে ভালোবাসেন তিনি। তাই কোনো পত্রিকার সম্পাদকের বা প্রবন্ধলেখকের জিজ্ঞাসার উত্তরে নয়, নিজের থেকেই নিজের লেখায় এব্যাপারে তাঁর দিক থেকে শেষ কথাটি অরুণ মিত্র বলে দেন :

> কবিতা রাজনীতি নয়, রাজনীতিতে যে সঙ্কীর্ণ অর্থে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী ছাপ দেওয়া হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের জন্যে তো কবিতা লেখা হয় না, কবিতা লেখা হয় জীবনের অভিঘাতে কবি-হৃদয়ে যে-স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তাই প্রকাশ করার জন্যে। এ প্রতিক্রিয়া মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং মার্কসবাদে অবিশ্বাসী দুই মনোভাব-সম্পন্ন কবিদেরই মানবমুক্তি-ভাবনায় নিয়ে যেতে পারে। বস্তুত স্বল্পদূর এবং সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার, মার্কসবাদের চিহ্ন দেওয়া এলাকায় যান্ত্রিকতার যথেষ্ট নমুনাও দেখা যায়। যান্ত্রিকতা কবিতার সবচেয়ে নৃশংস ঘাতক।

'শিলাদিত্য', ১৬-৩০ জুন ১৯৮৩

এই মতবাদেই তিনি স্থিত। এই মত তিনি গড়ে নিয়েছিলেন ১৯৪৮-৪৯-এর কাছাকাছি সময় থেকেই। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৭) থেকেই এই মনোভাবের স্থির কিন্তু উজ্জ্বল ও প্রাণময় রূপায়ণ দেখা যায়, আজও দেখা যায়।

১৯৪৮-এ যখন স্বাধীনতা সদ্যোজাত এবং নানাকারণে (মূলত স্বাধীনতাকে পূর্ণ সমর্থন না জানানোয়) কমিউনিস্ট পার্টি বেশ খানিকটা জনসমর্থন হারিয়েছে, তখনই অরুণ মিত্রের ফ্রান্সে যাবার যোগাযোগ ঘটে যায়। ফরাসি সরকারের বৃত্তিতে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য গ্রুপ দ্য লা রভ্যু ব্লাঁশ' নামে একটি পত্রিকাগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করেন তিনি এবং তিন বছরের মধ্যেই পেয়ে যান উচ্চতর উপাধি। ফরাসি ভাষায় ফরাসি কাব্য নিয়ে গবেষণা করে ভারতীয় ছাত্রের এই সম্মানলাভ ঘটে সেই প্রথম। ফিরে এসে ১৯৫৩-তে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা বিভাগে তিনি অধ্যাপক হয়ে যোগ দেন এবং অবসরগ্রহণ পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

অরুণ মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উৎসের দিকে' (১৯৫৪) যখন প্রথম বেরচ্ছে তখন তাঁর জীবনের 'অরণি'-পর্ব এবং ফ্রান্স-পর্ব অতিবাহিত। বয়সেও নিতান্ত তরুণ নন তখন। কী লিখবেন এবং কীভাবে লিখবেন সে-ভাবনায় স্থিরতা এসে যাচ্ছে ক্রমশই। নিজস্ব শিল্পরীতিও পেয়ে যাচ্ছেন। এই কাব্যগ্রন্থ এগারো বছর ধরে সঞ্চিত (১৯৪৩-৫৪) কবিতার সংকলন। গ্রন্থের প্রথম অংশ আর শেষ অংশের কবিতাগুলির মধ্যে আছে স্বরভঙ্গির কিছু পার্থক্য। সব কবিরই মনোবিবর্তনের তথা সৃষ্টিবিবর্তনের একাধিক বাঁক থাকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'-তেও চলমানতার ও উত্তরণের চিহ্ন দেখেছি আমরা। এই কাব্যগ্রন্থেও খানিকটা সূক্ষ্ম দিক-পরিবর্তন যেন বোঝা যায়।

স্পষ্ট-উচ্চারিত জনসংগ্রামের কবিতা তিনি তখনো লিখছেন কিন্তু দ্রুততাল ছন্দোময়তা আর নেই সেখানে, বাগ্‌বিন্যাসের সাজসজ্জা যেটুকু ছিল তাও যেন আর চোখে পড়ে না। এজাতীয় কবিতায় তাঁর নিজস্ব ধরন—ধীর, অনুচ্চকণ্ঠ কিন্তু মর্মস্পর্শীভাবে কঠিন, নির্দ্বিধভাবে অটল—এসে গেছে এখানেই। যেমন

করাতের দাঁত আমাদের রক্তাক্ত করেছে ,
চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক
মাংস চিরেছে, চিরুক
হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক—
আমরা বাঁচলাম।

'সঞ্জীবন'

আর একটি ঘনবিন্যস্ত কবিতার প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রায় ভাস্কর্য-ধর্মী, মিতপরিসর দৃঢ়তা।

দশটা আঙুল জড়ো ক'রে
করজোড়ে হয়েছি প্রার্থনাময়,
...
আর আজ ?
একাগ্র উত্তাপে দগ্ধ পাষাণ-প্রচ্ছদ,
দশ আঙুলের ডগা অগ্নিবিন্দু।

'মন্ত্রলোপ'

'উৎসের দিকে'র প্রথম কয়েকটি কবিতার মধ্যে ছন্দ ও মিল ব্যবহার করারও কিছু উদাহরণ আছে।

আমার জয়ের গান টলায়
কলকাতার অথই ঘুমসাগর,
আমার ভেলায় ভিড় জমাট,
উৎসবের আশায় রাত ডাগর।

'জয়গান'

ছন্দপ্রয়োগে এই মসৃণ নৈপুণ্যের পরেও অরুণ মিত্র ছন্দ-মিলের হাত ছাড়লেন—ছাড়লেন শাণিত বাচনের প্রলোভন। দু-একটি চমকে দেওয়া পঙ্‌ক্তি সকলের মুখে মুখে ঘুরবে—এই কবিবাসনা তাঁকে টলাতে পারল না। ছকে লেখা গণকবিতার দিকে তিনি তাকালেন না। এই কাব্য-গ্রন্থেরই মধ্যপর্যায়ের কবিতায় দেখি নিমগ্ন তাঁর কণ্ঠস্বর—অনেকটা যেন লিরিক-কবিতার স্বগতোক্তি। 'আমরা' বলে তিনি সাধারণত কবিতায়

জনতার একজন বলে নিজেকে চিহ্নিত করেন না। 'আমি'—এই একবচনই তাঁর কবিতার প্রাণপুরুষ। অথচ তাঁর কোনো কথাই আত্মসর্বস্ব নয়। দুটি উদাহরণ আগে দেওয়া যাক।

এক একবার ভয় হয় ফেটে যাব ;
আজন্ম বেঁচে থাকার তাপ বোমার মতো উগ্র বিস্ফোরক হয়েছে,
আমার একসঙ্গে আঁটো হয়ে থাকার মানে একেবারে উল্টে যায়,
মাত্র একটি দেশলাই-কাঠির মুখে উড়ে ছড়িয়ে যেতে পারি
অথচ আমাকে পাথর-ঠোকা ঝাঁক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গ মেঘে নামতে হবে।

'খোঁজা'

আমি গাছের রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।

'কয়েকটি কথা'

এই জাতীয় কবিতায় অত্যন্ত সবল শব্দপ্রয়োগ ও আপাতসাধারণ, স্বচ্ছন্দ বাক্যনির্মাণের মধ্যে দিয়ে কবির অনুভূতি একটি দ্বি-স্তর গতি পায় বলে মনে হয়। কথাগুলি যে কবির নিজের কথা তাতে পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না। কবিমানসকে উন্মোচিত করার সুখ পাঠকের মনে জড়িয়ে যায়। আবার, একই সঙ্গে, এসব কথায় যে সমগ্র মানবসমাজের হৃৎস্পন্দন জনজীবন থেকে আহৃত আবেগ কাঁপতে থাকে তা বুঝে নিতেও এক মুহূর্ত দেরি হয় না আমাদের। এই গুণটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানকে এত বিস্ময়করভাবে আমাদের কাছে এনে দেয়। এমনভাবে তিনি বলতে পারেন যে, পাঠকের মনে হয় তা কবির কথা হয়েও আমারই কথা। ত্রিশের দশকের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দের লেখায় এত দুরূহতা সত্ত্বেও এই লক্ষণ ছিল বলেই আজও তাঁদের নিয়ে আমাদের ভাবনা ফুরোয় না। চল্লিশের দশকের অনেক কবির লেখা কিন্তু শুধুই জনতার কথা হয়ে থাকে—কবিমনের নিভৃতিকে উন্মোচিত করে না। ফলে

জনমনকেও তা দীর্ঘ সময় ধরে টেনে রাখতে পারে নি। আবার পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক কবি এসেছেন যাঁরা শুধুই নিজের কথাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন কবিতায়।" তাঁদের অনেক কবিতা এখনই বিস্মৃত হতে চলেছে বা কখনোই পাঠকমনে দাগ কাটে নি—এমন ঘটনা বিরল নয়। সত্তরের দশকে খানিকটা চল্লিশের দশকের মতো জনতার, শোষণের, বিদ্রোহের কবিতা লেখার রেওয়াজ তৈরি হল কবিদের একাংশের মধ্যে। আবারও তার অনেকগুলি শুধুই জনতার কথা, নিজের কথা নয়। কবিতো হিশেবে তার বহুল অংশই বর্জিত হবে সম্ভবত। কিন্তু একটা জিনিশ হয়তো দেখা যাবে—পঞ্চাশ, ষাটের ওই আত্মনিমগ্ন কবিরা যখন সত্তরের দশকের নৃশংসতা ও সমাজ নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন তাঁদের কারো কারো হাতে ওই দশকে বেশকিছু নাড়া দেবার মতো কবিতা রচিত হয়েছে। নিজের কথাটিকে আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে শিখে নিয়েছিলেন বলেই আত্মচেতনা যখন সমাজচৈতন্যের চাপে চোখ তুলে তাকাল তখন সহজেই তাঁদের হাতে এমন 'টোটাল' কবিতা হয়ে উঠতে পারল। এই বিষয়টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু প্রসঙ্গের অবতারণা একথা বলার জন্যই যে, অরুণ মিত্র পঞ্চাশের দশক থেকেই নিজের কথা ও সমাজ-পরিবেশ-জনসংঘাতের কথার অনায়াস-মিলন ঘটাতে পেরেছেন সব সময়েই। শুনলে মনে হতে পারে এই লক্ষণটি নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু শুধুমাত্র বড় কবিদের কলমেই এটা মূর্ত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিচেতনার এই উদ্ভাসন—যার উদ্ভব সমাজচৈতন্য থেকে এবং যার গতিও সমাজচৈতন্যের দিকে—এই মনোভঙ্গিটাই বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশকের প্রগতি-আন্দোলনের দান। জীবনানন্দও অনেকটা পথ বদলেছিলেন চল্লিশের দশকেই। শান্তভাবে, কোলাহল না তুলে আর যে-কবিরা ঠিকভাবে এই দান গ্রহণ করতে পেরেছেন, অরুণ মিত্র তাঁদের অন্যতম।

এই পর্ব থেকেই তিনি বেছে নিয়েছেন গদ্য অনুচ্ছেদে কবিতা লেখার রীতি, 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে'-র মতো কবিতা রচিত হয়েছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ (১৯৬৩) এই রীতিটিই প্রধান। কারো অনুকরণ না হলেও ফরাসি কবিদের এই জাতীয় রচনা থেকেই সম্ভবত তিনি প্রেরণা

পেয়েছিলেন। কবিতার শব্দপ্রয়োগ সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। কবিতার ভাবকে মনোমতো রূপ দেওয়া—যা অনেকটা নিজের থেকেই তাঁর কবিতায় হয়ে ওঠে—তাতেই তিনি তৃপ্ত।

> কবিতার রূপায়ণ সম্বন্ধে আমার কোনো নান্দনিক ধারণা নেই। শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্ত আছে যে, আমার মনোভাব বা অনুভব যেভাবে সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করতে পারব সেটাই আমার কবিতার রূপ হবে।··· ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে।
>
> 'আজ কাল পরশু', অরুণ মিত্র সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮০

'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতায় ভাব ও রূপের যে পরিণতি অর্জন করেছিলেন অরুণ মিত্র, মূল প্রবণতায় সেখান থেকে তিনি আর সরে আসেন নি।

বিবর্তন এসেছে কবিতার ভাষায়। ছন্দে তিনি গদ্যভঙ্গিটাই রেখেছেন। শব্দ ও বাগ্‌বন্ধ তুলে নিয়েছেন একেবারে পথঘাট, বস্তিবাজার থেকে। এই বৈশিষ্ট্য ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' (১৯৮৬) থেকে কয়েকটি শব্দ ও শব্দবন্ধ যথেচ্ছভাবে তুলে দেওয়া যাক : চক্কর, তেরছা, উড়নতুবড়ি, গহরডিহা, ভাই-বেরাদারি; ল্যাঠা মাছের কিলিবিলি, মাঠকোঠা হুড়মুড়োয়, দানাপানির মারদাঙ্গায়, বালবাচ্চা এণ্ডি-গেণ্ডি, টাইট দেওয়া কথা, ছরকট মাচার ঝিঙে, ঘেঁটিভাঙা বিশ্রাম ঝুলছে, 'খচমচ করে হাড়মজ্জায় ইস্ক্রুপ আঁটা ছবি'। একটি কবিতাংশও রাখা যাক :

> এই তালেবরকে রোদে খুব পোড় খাইয়েছি
> ভরদুপুরে ডিহিশিরামপুর তিলজলা মারাঠাডিচ
> নেতাজী সুভাষ রোড মহাকরণ গঙ্গামাইকি পোল ঘুরিয়ে
> এনে ফেলেছি আয়নার সামনে,
> পগেয়াপটি চীনেবাজারে আত্মা কেনাবেচা সেরে
> ভাড়াটে মেঝের ওপর রাজা হয়ে চোখ তুলছে সে,
> পাথুরে তাত মনে কাঁচা সোনার রং ধরিয়েছে
> ও রে মন মন রে আমার।
>
> 'এ এক রাজা'

এই হল তাঁর একালের কবিতার রূপাবয়ব। বিশ শতকের আশির দশকের জনজীবনের কবিতা হিশেবে এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিস্তৃত কবিতার দাবি ভুলে থাকা চলে না।

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে কবিতাকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি—একথা বলেছেন তিনি বারবার। তাঁর প্রতিটি কবিতাই সে-কথার সাক্ষ্য দেয়। তবু একটি কবিতার অংশ আর একবার দেখি :

> শীতের ঢেউ যেসব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেইসব রাস্তা দিয়ে রিক্শা চ'ড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, মনে হয়েছে তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে। আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে। তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলোগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাকে আবার এইখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছে।
>
> 'রিকশাওয়ালা', 'ঘনিষ্ঠ তাপ'

এই কবিতাটি মনের মধ্যে নিতে গেলে আমাদের যেতে হবে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের কোনো শহরে। সাইকেল-রিক্সাই যেখানে স্বাভাবিকতম যান। ওইসব জায়গার তীব্র শীত—পশ্চিম বাংলায় ঠিক তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না—দিনের পর দিন অনড় হয়ে থাকে। সেখানে গরম পোশাকের স্পর্শহীন, নিয়তপ্রস্তুত রিকশাওয়ালাদের সকালে-সন্ধ্যায় সু-আচ্ছাদিত মধ্যবিত্ত মানুষ-দের নিয়ে দ্রুত চলার দৃশ্য মনে গেঁথে থাকলে তবেই এই কবিতাটির অগ্নি-দাহ অনুভব করা যাবে। এই কবিতার পটভূমি যে এলাহাবাদের শীতকাল তা না জানলেও বলে দেওয়া যায়। আর, এই কবিতার অবলম্বন 'রিকশা-ওয়ালা' না বলে যদি বলি 'ভারতবর্ষ'—তাও বাড়িয়ে বলা হয় না। অরুণ মিত্রের এখনকার কবিতায় কলকাতার গলি, রাস্তা, মাঠ, বস্তি, বাজার, দোকানের শো-কেস, সার্কাসের রিং জায়গা পায়। এবং সবসময়েই ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতায় আছে দীর্ঘ পথ, বিশাল মাঠ, ফলন্ত বা অ-ফলা ক্ষেত, কঠিন পাথর, তিরতিরে জল-উৎস—এগুলি তাঁর প্রিয় প্রতীক। কেউ কেউ বলেন : রূপক, প্রতীক, পুরাণ-প্রতিমা তাঁর কবিতায় নেই। পুরাণ-প্রতিমা

সত্যিই খুব ক্বচিৎ। তিনি সবসময়েই সমকালীন জনজীবন থেকে কবিতা তুলে নেন। কিন্তু প্রতীক নেই—এমন কথা কোনো কবির রচনা সম্পর্কেই বলা যায় না।

অরুণ মিত্রের কবিতা, যে-কোনো দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, সবসময়েই তা মানবচৈতন্যের উৎস থেকে জাত এবং জনজীবনের অভিমুখী। বিশ্বের তাবৎ মহৎ সাহিত্যের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। যদিও তার নানারকম প্রকারভেদ আছে। সমাজতন্ত্রবাদী মানসিকতা এই চেতনাকে জাগ্রত ও প্রদীপ্ত রাখে। এই বোধকে অনেকসময়ে শিল্পীস্বভাবে পরিণত করে। খুব ব্যাপকভাবে না হলেও বাংলার প্রগতি-আন্দোলন এই কাজটি কিছু পরিমাণে করতে পেরেছিল। তারই সার্থকতার একটি ছবি অরুণ মিত্রের কবিতায়। অরুণ মিত্র নিজে বলেছেন : 'আমার কাছে প্রগতিবাদের অর্থ অবক্ষয় ও অমানবিকতার বিপরীত দিকে যাওয়া। সংকীর্ণতা থেকে বিস্তারে যাওয়া। এ-অর্থে সব মহৎ সাহিত্যই প্রগতিবাদী··· ।' ('আজ কাল পরশু', অক্টোবর ১৯৮০)।

এরকম কথাই বলেছিলেন প্রেমচন্দ। প্রগতিশীল লেখকসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হিশেবে ১৯৩৬-এ লখনউ-এ প্রদত্ত সেই বিখ্যাত ভাষণটিতে তিনি বলেছিলেন, 'সাহিত্যকার ইয়া কলাকার স্বভাবতঃ প্রগতিশীল হোতা হ্যায় ; অগর ইয়হ্ উসকা স্বভাব ন হোতা, তো শায়দ ওয়হ্ সাহিত্যকার হী ন হোতা।'

কোনো কোনো সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে আসেন যাঁরা সহজভাবে, সবলভাবে, কোনো সচেতন নান্দনিক সৃষ্টিবাসনা থেকে নয়, চিত্তের স্বাভাবিক মানবমুখী আবেগকে প্রকাশ করতে হবে বলেই সাহিত্যরচনা করেন। সেই অনুরাগের সত্যতা ও গাঢ়তাতেই তাঁদের পরিচয়। সেখানেই তাঁরা সুস্থির থাকেন। কোনো দলীয় বা নির্দলীয় সমালোচনা বা অন্যের গ্রহণ-বর্জন তাঁদের ডাইনে-বাঁয়ে হেলাতে পারে না। তাৎক্ষণিক-ভাবে সবসময়ে না হলেও তাঁরা ধীরে ধীরে অধিকার করে নেন পাঠকচিত্তের আসন। অরুণ মিত্রের কবিতা আমাদের সেই অভিজ্ঞতাই দেয়।

ইরাবান বসুরায়

—

প্রেম মাটিতে ধুলোয়

'মিলন-সাথীরা নাই, কখন যে ওরা / নিঃশব্দে ঝরিয়া গেছে, সেই অবেলায়। এখন রজনী তব, দিবস আমার'—এই উচ্চারণে যে স্বর শোনা যায়, তার সঙ্গে, 'আমার প্রতিশ্রুতি কোথায় খোদাই হবে, আর / কোন পাথরে কোন পাথরে কোন কঙ্কালে?'—এই স্বর যেন মেলে না কোনোমতেই। এমন কী 'নিশ্চিন্ত নীলিমা হতে পড়ে যাব স্খলি / জীবন জলিয়া যাবে তোমার আমার'-এর সঙ্গে 'জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া /··· রুখবই দুষমন রুখব / দোসরের মুখ চাই ভাই হো··· / হাতিয়ার'-এর যেন দুর্লঙ্ঘ্য এক ব্যবধান, আর তা যেন পরস্পরের বিরোধীও। অথচ অরুণ মিত্রের কবিতার ভুবন থেকেই এই স্বরগুলি ভেসে আসে—নানা সময়ের নানা স্তর থেকে, কখনো বা একই সময়ের প্রান্ত থেকে। তাহলে কোথাও থেকে যায় ভাবনার একটি যোগসূত্র, বাইরে নানা স্বরের ভিন্নতা আর ওঠানামা সত্ত্বেও, যা ভিতরে বেঁধে রাখে এইসব উচ্চারণকে।

অরুণ মিত্র যখন কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন, তার আগেই রবীন্দ্রনাথের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা কবিতার আলাদা পরিচয় খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবিতার জগৎ শুধুই আয়নায় প্রতিফলিত আত্মপ্রতিকৃতিতে আকীর্ণ ছিল না, বাইরের পৃথিবীর নানা সংক্ষোভও কেবলই স্পর্শ করছিল আর নাড়া দিচ্ছিল তাকে। ফলে কবিতা চিত্রিত হয়ে উঠছিল নানা রং-এ। এ ভাবেই শুরু হয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতা।

একদিকে কবিতার নতুন ধারা, অন্যদিকে উত্তাল বিশ্ব-পরিস্থিতি— এই দুইকে মেনে নিয়েই অরুণ মিত্র শুরু করেছিলেন তাঁর কবিতা লেখা।

সেই শুরুতে অবশ্য তেমন কোনো চমক ছিল না, ছিল না খুব বেশি স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান—সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো ; বরং তিনি যেন মেনেই নিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই পরিচিত এক ভঙ্গি, আর অনুসরণ বলেই তাতে ছিল না তেমন কোনো নিজস্বতা। নতুন কোনো কবির উপর প্রতিষ্ঠিত কারো প্রভাব পড়তেই পারে, যদি না তার আগেই তিনি অন্য কোনো পথ খুঁজে পান। কেউ কেউ প্রথম থেকে ব্যতিক্রমী, বাকিরা হাত-মকশো করতে করতে একটা সময় নিজের ঠিক জায়গাটি খুঁজে পান। অরুণ মিত্রকে সেই হাত-মকশোর পর্ব পেরতে হয়েছিল।

'প্রান্তরেখা' কাব্যগ্রন্থের 'কয়েকটি পুরনো কবিতা'য় এই প্রস্তুতিপর্বের ছাপ আছে। 'জানো মোর ললাটের অলঙ্ঘ্য লিখন ; / উৎসর্গ-অঞ্জলি ভরি রক্তিম যৌবন / ধরিল যে তার কিছু নাই বলিবার' বা 'অধৈর্য হয়েছে মোর শরীরের স্নায়ু' ('দিবস-রজনী') প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে যেন শুনি তিরিশেরই কোনো কবির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সেখানেও কবির অনিশ্চয়তা টের পাওয়া যায় ; পূর্বসূরীদের মধ্যে কাকে তিনি অনুসরণ করবেন তা যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই বুদ্ধদেবীয় অনুরণনের পাশেই শোনা যায়, 'পথের দুধার দিয়ে মানুষের ভিড়, / ছত্রভঙ্গ ছন্নছাড়া দল' ('শোভাযাত্রা') জাতীয় উচ্চারণ, যেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু এই প্রতিধ্বনি থেকেই অরুণ মিত্র যেন খুঁজে নিতে চাইলেন নিজস্ব কণ্ঠস্বর। হাত-মকশো পর্ব থেকে একটু এগিয়ে তিনি আবার যখন জনতার কথাই বলেন, তখন বোঝা যায় ভাবনার কিছু স্বাতন্ত্র্য। এর আয়োজন নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে চলছিল, তবে তাকে উশকে দেয় বামপন্থী আন্দোলনের সাহচর্য। কল্লোলীয় রোম্যান্টিকতার বদলে তিনি তখন জেনে নিতে চাইছিলেন অন্যতর এক রোম্যান্টিকতাকে, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ 'প্রান্তরেখা'র 'ভাষণ' পর্যায়ের কবিতাগুলি। 'ভাষণ'—এই নামকরণ থেকে প্রশ্ন জাগে অবশ্য, কবি নিজেই কি এগুলির কাব্যমূল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন ! পরবর্তীকালে অরুণ মিত্র জানিয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট ঘোষণার অনুসরণ করে দু-তিনটির বেশি কবিতা তিনি লেখেন নি, আর কোনো মতবাদের অনুবর্তী হয়ে কবিতা লেখায় তিনি উৎসাহীও নন—কিন্তু তখনই

কি তাঁর এ জাতীয় কবিতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল; তাহলে এগুলি তিনি লিখেছিলেন কেন? 'ভাষণ'-এর কবিতা থেকেই এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার? / লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায় / ঝল্‌সাবে কাল জানো!' ('লাল ইস্তাহার')—এই উচ্চারণে আছে আবেগের স্পর্শ, টের পাওয়া যায় বিশ্বাসের তাপও। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন এখানে উৎকীর্ণ, তা অবশ্যই আসবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অনুসরণে। কিন্তু এতটা বিশ্বাস আসে কোথা থেকে? মধ্যশ্রেণীগত রোম্যান্টিকতাই কি এর জনক? মানতেই হয়, অরুণ মিত্র এই বিশ্বাস অর্জন করছিলেন তাঁর স্বদেশীয় অভিজ্ঞতায় ততটা নয়, যতটা জনযুদ্ধের স্লোগানে। আসলে সময়টাই ছিল এমন যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীজোড়া প্রতিবাদে শামিল হওয়াতেই সব দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল, নিজেদের দাঁড়ানোর জায়গাটা শক্ত কিনা, সে-চিন্তা ততটা মনে আসে নি। স্বদেশী পরিস্থিতি যতই জটিল আর সমস্যাসংকুল হোক না, দূর সোবিয়েতের অভিজ্ঞতাতেই দিনবদলের সম্ভাবনা জাগছিল, বলা সম্ভব হচ্ছিল: 'জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া / সোভিয়েট রুশিয়া / জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া / রাখবই / ভাই হো' ('কসাকের ডাক: ১৯৪২')। একে বলা চলে সচেতনতা, কিন্তু সে সচেতনতায় স্বদেশের স্পর্শ নেই। এর কারণ নিহিত তার মার্কসবাদী দলের যোগাযোগেই—ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন প্রায়ই এই ভ্রান্তিতে ভুগেছে। স্বদেশকে কবি একেবারে এড়িয়ে চলেন না অবশ্যই, কিন্তু তাঁর কবিতায় বিশ্বাসের তত্ত্ব যতটা বোঝা যায়, তার ভূমি সে-তুলনায় স্পষ্ট নয়। 'মাঠ কারখানা দেখে আকাশ··· / অস্ত্রফলকে প্রতিফলন, / আগামী কাল / ঝুঁকে তাকায়' ('সামরিক')—এই আগামীকালের অনুভবকে তাই মানতে হয় বিশ্বাসের সত্য বলে, অভিজ্ঞতার সত্য না হলেও। যদিও একজন কবি তো শুরু করতেই পারেন এখান থেকে—বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতায় জারিয়ে উপলব্ধি করে তোলাই তো অভিপ্রেত হতে পারে।

একথা ঠিক, তাঁকে জেনে নিতে হয়, 'সৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর', আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই প্রেমেও যেন তাঁর কোনে

স্বস্তি নেই। বস্তুত প্রায় সুভাষের প্রতিধ্বনি করেই তিনি বলেন, 'গভীর তোমার ফল্গু-প্রেমের ধারা উছল। / ধন্য আমার দীর্ঘ বেকার দশা মোচন! / পাগ্‌লা বাঁশীতে চম্‌কাও কেন? করা কি আর? / এলো যে বোমারু, নীচের তলায় চলো পালাই।' ('বিড়ম্বনা')। একটা বিশেষ সময়ের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ছায়া এখানে, কিন্তু তা যেন হয়ে ওঠে সময়ের প্রতিকূলতারই প্রতীক। বস্তুত এই প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়িয়েই তো একজন কবিকে জানতে হয় জীবনকে, আর সেই জানাতেই উদ্ভাসিত হতে থাকে তাঁর কবিতার ভুবন। 'প্রান্তরেখা'র কবিতাগুলিতে কিন্তু টের পাওয়া যায় না সেই সংঘাতের কোনো ইতিবৃত্ত, তার বদলে শোনা যায় সরল কিছু উচ্চারণ; কোনো দ্বন্দ্ব নয়, যেন সহজেই মেনে নেওয়া যায় অনেক কিছু। এই মেনে নেওয়া অবশ্য আসে বিশ্বাসের ওই টান থেকেই—সহজিয়া সেই বিশ্বাস তৈরি হতে থাকে আবেগের চাপ থেকে। 'প্রান্তরেখা'র কবিতাগুলির মধ্যে 'ভাষণ' অংশটুকুই উল্লেখযোগ্য, অন্যত্র একধরনের অস্থিরতা চোখে পড়ে। সেই অস্থিরতা সংশয়ের বা দ্বন্দ্বের নয়, এলোমেলো ভাবনার। এর পাশে 'ভাষণে'-এর কবিতাগুলিতে স্পষ্ট আর সরল বিশ্বাসের উত্তাপ টের পাওয়া যায়; আর এতই সহজ তা যে তাকে ভাষণ বলতে কবির কোনো দ্বিধা নেই, কেননা ভাষণে যে স্থির বিশ্বাসের কথা বলতে হয়, এখানেও তো তাই বলা হয়; অথচ এও ঠিক যে কবিতার তির্যক ধরন একটু এসেই যায়; 'নিঃশ্বাস চাই, হাওয়া চাই, আরো হাওয়া' বা 'মাটির কবরে আসে দুর্বিনীত / তৃণের বিদ্রোহ'—একথা যখন বলেন কবি, তখন বোঝা যায় শুধু ভাষণ বা স্লোগান নয়, তিনি পৌঁছতে চাইছেন উপলব্ধির গভীরতায়।

এই কারণেই 'প্রান্তরেখা' থেকে তিনি মুখ ফেরান 'উৎসের দিকে'। প্রান্তিক বিশ্বাসকে যাচাই করে নিতে চান তিনি। একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় 'আমি'-কে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার যে উচ্ছ্বাস শোনা গিয়েছিল, অরুণ মিত্রের কবিতায় কিন্তু তা অনুপস্থিত ছিল। আসলে দিনবদলের কাজে 'আমি'-র ভূমিকা নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তিতই ছিলেন না, যেন তা ছিল স্থির, নিশ্চিত। চল্লিশের দশকের প্রথম পর্ব জনযুদ্ধের ধারণায়, ফ্যাসিবাদের আক্রমণকে

প্রতিহত করে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগমনে এই নিশ্চিতির বোধ আসছিল ; ভবিষ্যৎ, আগামীদিন—এদের উজ্জ্বল চেহারা এত বেশি প্রত্যক্ষ ছিল যে সেখানে পৌঁছনোর বন্ধুর পথ আর জটিল পদ্ধতিকে আমলই দেয়া হচ্ছিল না —রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেও না, কবির ভাবনাতেও না।

সময় অবশ্য অত সরল ছিল না। 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থের একটা অংশ 'স্মরণকাল', ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮ এর রচনাসময় ; এই সময়টি এ দেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—একে একে ঘটতে থাকে মন্বন্তর, যুদ্ধাবসানের পর বেকারত্বের সংকট, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা, দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর, অন্যদিকে তেভাগার লড়াই, তেলেঙ্গানার লড়াই। এই সময়সীমায় দাঁড়িয়ে তিনি যে কবিতা লিখছেন, 'প্রান্তরেখা'র কবিতাগুলির সঙ্গে তার একটা তফাৎ চোখে পড়ে। 'দেখবে এমন মেঘের বেলার নিঃশ্বাস-চাপা কঠিন সাগরে / আমার অজেয় মাল্লারা ঝোড়ো / আবেগে সামনে ঠেলছে বুকের ছাতি।' ('নেপথ্য')—এই উচ্চারণের সঙ্গে 'প্রান্তরেখা'র কবিতার কিছুটা সাধর্ম্য থাকলেও, এই আবেগ যেন অনেকটাই আত্মস্থ। এই কবিতায় 'আমি' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হতে থাকে, কিন্তু বোঝা যায় সেই 'আমি' আসলে 'আমরা'রই দ্যোতক। তাহলে কবি এখন হয়ে উঠছেন আগামীদিনের স্বপ্ন-সম্ভাবনার চারণ, এমন মনে হতেই পারে। যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিপর্যয়ের বিপরীতে এই আশাবাদ আসছে, ইতিমধ্যেই চিহ্নিত সেই বিশ্বাস থেকেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগেই। শুধু বিশ্বাস দিয়েই সব প্রাতিকূলতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় কি ! এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মধ্যশ্রেণীর সার্বিক প্রাধান্য সত্ত্বেও একজন মধ্যশ্রেণীভুক্ত কবি কীভাবে পেরিয়ে আসেন সব সংশয় ! একজন রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে ব্যাপারটা কিছুটা সহজ, তার প্রতিমুহূর্তের কর্মজীবন তাকে বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করে। একজন শ্রমিক বা কৃষাণ যে-ধারণায় অস্বীকার করতে পারেন সমকালের বিপর্যয়কে —একজন মধ্যশ্রেণীভুক্ত কবির সে-জোর কী করে আসে ! এর উত্তর বোধ হয় পাওয়া যাবে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে। প্রগতি-লেখকসঙ্ঘ, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশ ইত্যাদি স্তর

পেরিয়ে এসে গণনাট্যসঙ্ঘ তার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে একটা জনমুখী ধারা খুলে দিয়েছিল—আর তা হয়েছিল মূলত মধ্যশ্রেণীর সংস্কৃতি-কর্মীদের উদ্যোগেই। এই সাংস্কৃতিক বন্যা উৎসাহী করেছিল কবিসাহিত্যিক-দের, সাময়িক ভাবে হলেও তাদের ভুলে যেতে দিয়েছিল শ্রেণীগত পিছুটান। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাময়িক সাফল্য তাই জোরালো করে তুলেছিল আশাবাদকে, মনে হচ্ছিল কোনো বিপর্যয়ই তেমন-কিছু নয়।

কিন্তু অরুণ মিত্র কি সম্পূর্ণই আবেগে সমর্পিত ছিলেন? 'কুটিল দংশন কাটে ধানশীষ মাঠে মাঠে, / গেঁয়ো সন্ধ্যা ভয় পায়; / ···দাওয়ার ওপারে / সন্ত্রস্ত গলির কোনোখানে / ছায়া-আঁটা আঁধার ফটকে / অগ্রদূত হৃদয় ঘা দেয়। /তারপর কোন্ রাজ্য, কোন্ রাজধানী? / প্রিয়তম কোন্ ভবিষ্যৎ?' ('গলি') —এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে লেগে থাকে কিছুটা সংশয়. যেন ভবিষ্যতের আশাকে একটু নষ্টই করে দেয়, প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে—'আদি গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে কোন্ / স্তূপ গড়ি? তার শিখরে কেতন উড়বে কখন? / ভস্মলোচন উপসংহারে / দাঁড়ি টেনে দেবে অমর মুষ্টি, ভারতবর্ষ?' ('মরযাত্রা')। বোঝা যায় জনযুদ্ধের আশাবাদের থেকেও অনেক বড় সত্য হয়ে ধরা দেয় মন্বন্তর। ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়েছিলেন, দুঃখবহ হওয়া সত্ত্বেও সে প্রাণদানে ছিল আদর্শের গৌরব, জীবনের প্রতি মহৎ ভালোবাসার অঙ্গীকার। কিন্তু মন্বন্তরে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়, তার থেকে বড় অপচয় আর কী হতে পারে! আর সে-অপচয় যখন ঘটে, যুদ্ধে অংশ না নিয়েও একটা যুদ্ধেরই ফল হিশেবে, তখন বোধহয়, জনযুদ্ধের তত্ত্বেও একটু চিড় ধরে। এই কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে সংশয়ের সঙ্গে শোনা যায় আপত্তিও—'দামী কঙ্কালে পথ বাঁধালাম—/ জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের / পরিশোধ চাই; / ইতর-জনের জিজ্ঞাসা জমে, / শেষরক্ষার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ছেলে- / ভুলোনো ছড়ার মুখস্থ গানে / নেই তার কোনো উত্তর নেই। / করাল প্রাচীরে সম্মুখ রেখা / ছিন্ন এখনো, ভারতবর্ষ।' ('মরযাত্রা')। স্পষ্টতই এখানে কোনো আশাবাদ কাজ করে না, অন্তত শুধু তত্ত্বকথা আশা জোগায় না।

তাহলে কি সব আশারই অবসান? কবি কি মুখ ডোবাবেন নৈরাশ্যের

অন্ধকারেই। তাও তো হয়ে দাঁড়ায় আরেক ধরনের সরলতা। অরুণ মিত্র সেই সরলতায় আগ্রহ বোধ করেন নি। তত্ত্বের মৌখিক উচ্চারণের সঙ্গে যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিরোধ বাধে, তখনই তো সব থেকে বড় প্রয়োজন যুক্তিকে স্থির রাখার, বিচারের বোধকে ভেসে যেতে না দেওয়ার, বিশ্বাসের আবেগ বা অবিশ্বাসের পালটা আবেগ—দুই থেকেই নিজেকে মুক্ত রাখা তখন জরুরি হয়ে পড়ে।

কিন্তু একজন কবি কি একেবারেই সরে আসবেন আবেগ থেকে? একটা আবেগ যদি ভিতরে না থাকে তাহলে তো লেখাই যায় না কবিতা। এখন তাহলে সেই আবেগকে বাঁধতে হবে, তাকে যাচাই করে নিতে হবে অভিজ্ঞতার আলোয়; অভিজ্ঞতা মানে অবশ্যই দৈনন্দিন ঘটনাবলির শুধু নয়, মননেরও অভিজ্ঞতা। সেটা তখন জানিয়ে দেয়, 'আমাদের শিথান ভিজে গেল ঘরঘেঁষা বহতার চাপে', কিন্তু 'ঘোলাজলের পলি ছেড়ে সামনে বৃষ্টির দিগন্ত।' আর তখনই, এমনকী প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূঢ়তাকে মেনে নিয়েও, তার ভিতর থেকে জাগিয়ে তোলা যায় আশা; 'নিরবধি কাল / আর নয় উদাসীন নয় / বরাভয় আর নয়, / সকালের রোদে ধরে জ্বালা, রঙীন পেয়ালা / ভরে ওঠে হত্যার আস্বাদে'—একথা জেনেও বিস্ময় জাগে, 'এ কী ভাষা / মৃতবৎসা পৃথিবীতে / এ কী আশা / শিশুর কান্নার ঘরে' ('শিশুর কান্নার ঘর')। এও রোম্যান্টিকতাই, কিন্তু তা কল্পনায় প্রস্থান নয়। এখানে কাজ করে ওই আবেগেরই চাপা টান। এই টানকে কখনো কখনো মনে হয় একটু বেশি, মনে হয় যেন নিজের সঙ্গে ভালো করে জানাশোনার আগেই তিনি পৌঁছে যেতে চাইছেন আরেক বিশ্বাসে। আরেক বিশ্বাস বললে অবশ্য মনে হতে পারে, আরম্ভের বিশ্বাস থেকে তা একেবারেই আলাদা। তা নয়, কিন্তু আগে যা ছিল তত্ত্বে-পাওয়া, এখন তা যেন নিজের ভিতর থেকেই তৈরি-করা, যেন একটু বানানো। যেন নিজেকেই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, হতাশার কিছু নেই। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতেই এগোতে হয় কবিকে, কিন্তু কখনো কখনো এসে যায় তাড়া, বোঝা-পড়ার বদলে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে উত্তরণের খবরটাই, তখন নিজেরই ভুল হয়ে যায় যে, আকাঙ্ক্ষাই প্রাপ্তি নয়।

অবশ্য এমন সহজিয়া ভুল তাঁর কবিতায় কমই. বরং 'উৎসের দিক'-এর অন্তর্গত 'স্মরণকালে'র কবিতায় যন্ত্রণার আর্তি টের পাওয়া যায় স্পষ্ট করেই; সে-যন্ত্রণা সহজিয়া বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ারই যন্ত্রণা। তাঁকে অনুভব করতে হয় তত্ত্ব, এমনকী মানবমুক্তির তত্ত্বও, জীবনের যোগ ছাড়া, অভিজ্ঞতার উত্তাপ ছাড়া হয়ে দাঁড়ায় ভার। অবশ্য ভার জমে অনেক রকমেই। বিশেষত বাঙালি মধ্যশ্রেণীর বহু যত্ন-রচিত বিশ্বাসই তো ভাঙতে শুরু করেছিল—উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকে চল্লিশের দশকের মার্কসবাদ পর্যন্ত। উলটো-পালটা নানা স্রোতের মাঝখানেও অবশ্য একজন সচেতন ব্যক্তি চিনে নিতে পারেন দাঁড়ানোর জায়গা. কিন্তু কেউ যদি অসহায় বোধ করেন. তাহলে খুব-একটা দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। চল্লিশের দশকের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন সেই অসহায়ত্বই অনুভব করেন তিনি, 'প্রতিমাগুলো ব'য়ে এনে-ছিলাম / মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে / তারা এখন ভাঙল' ('সীমান্ত')। ফলে নিজেকে মনে হয় বিপন্ন শিখরে দাঁড়ানো, যেখান থেকে গড়ানো প্রতিমাগুলো চোখে পড়ে। কিন্তু মুশকিল হয়, কবি যেন খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে বোঝান, '…এক প্রবল স্বস্তির শূন্য আমাকে টানছে আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে, / আসন্ন দিনে পাখা ভর দেবার সুযোগ পাব যেন' ('সীমান্ত')। আর এর মধ্যেই অনুভব করেন, '…আমার কপালের ঘাম নিঃসাড়ে শিশির হয়ে ফুটছে।' কেন এমন হয়? প্রতিমা যদি ভেঙে যায়. সেজন্য যন্ত্রণা থাকতেই পারে, সে-যন্ত্রণা পেরিয়ে যেতে চাইবেনই কবি. কিন্তু এত দ্রুত কি তা হয়? তাহলে কি অন্যতর এক সান্ত্বনা আগেই তৈরি ছিল—সে-সান্ত্বনা কি তত্ত্বে-পাওয়া? বোঝা যায় না। ফলে অস্বস্তিই বাড়ে পাঠকের। মনে হয় বড় দ্রুত তিনি অস্বীকার করলেন যন্ত্রণাকে।

বরং আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাকে মনে হয় অনেক বেশি আন্তরিক। দুঃসহ জীবনের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া বৃষ্টির আবহে তিনি সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধরেন। স্মরণকালের, 'বর্ষমাণ' কবিতা হঠাৎ মনে পড়াতে পারে অমিয় চক্রবর্তীকে, কিন্তু অরুণ মিত্র তাঁর কবিতায় তুলে আনেন যে শহরকে, তার 'পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয় / জলে ভিজে।' এই বৃষ্টির পটভূমিতে যদিও ছেয়ে থাকে এক অসহায়ত্ব, কুয়াশার মতো অস্পষ্টতা আর ভাঙনের আভাস, তবু

এর মধ্যেই তিনি পেরিয়ে যেতে চান দ্বিধাকে. যা ভাঙন, তার ভিতর থেকেই পেতে চান উজ্জীবন. বলতে চান, 'হে সাথী / বৃষ্টি এল।' কিন্তু কী করে সম্ভব হয় এই উজ্জীবন!

এখান থেকেই খুঁজে নেওয়া যায় অরুণ মিত্রের ক'বিতার একটা বড় ভাবনা। শুকনো তত্ত্ব নয়, যার জন্য তত্ত্ব, সেই জীবনকেই আঁকড়ে ধরার ভাবনা ক্রমশ জেগে উঠতে থাকে তাঁর কবিতায়। এ তাহলে এক ভালো-বাসা। আর এই ভালোবাসায় যখন তিনি বাঁধতে চান তার পৃথিবীকে, তখন ক্ষয়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা এগিয়ে যায় আশার দিকে। ভাঙা প্রতিমার বেদনা পেরনোর জন্য ভবিষ্যতের বানানো কল্পনায় ভর দিয়ে নয়, তিনি বরং জেনে নিতে চান স্রোতকে, প্রবহমানতাকে। বীজ ফেটে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, সেই অঙ্কুরে জেগে ওঠে জীবনের আশ্বাস—বহমান অন্ধকার রাত পুড়ে ছাই হবে এই ভরসা জাগে। 'উৎসের দিকে'র কবিতাগুলিতে এই ভালো-বাসাই বারেবারে রূপ পায়, যাকে 'স্মরণকালে'র মধ্যে তিনি নিজেই বুঝতে চেয়েছেন স্পষ্ট করে—'এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা / আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে / শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্চার গানে ?' ('জাগর')।

এই ভালোবাসার টানেই 'উৎসের দিকে'র কবিতাগুলিতে আবার দেখা মেলে তাঁর 'তুমি'-র। কিন্তু এই 'তুমি' কি শুধুই এক নারী, যাকে তিনি 'প্রান্তরেখা'য় বলেছিলেন, 'তোমার চাঁদের পরে অশ্রুর তুহিনে / আমার সূর্যের শিখা হিম হ'য়ে গেলো।' এই নিছক ব্যক্তিক গণ্ডিকে তো তিনি তখনই জেনেছিলেন বিপর্যয় বলে—'ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল। / ভুজ-বল্লরী বাড়ালে, বন্ধ কর কি তাও ? / তবে নিঃশ্বাস নেবার কি হবে, কোন উপায় ?' তাহলে এই 'তুমি' তেমন-কোনো ব্যক্তিগত গণ্ডিতে বাঁধা থাকে না আজ আর। বস্তুত 'তুমি' হয়ে ওঠে কিছুটা নির্বিশেষ, হয়তো নারী, কিন্তু শুধুই নারী নয়, জীবন, আর এমনকী স্বদেশও। অরুণ মিত্রের স্বদেশ-ভাবনা অনেকটা স্বতন্ত্র. তা খুব সরব জাতীয়তাবোধ নয়, এমনকী সাম্যবাদী কবিদের স্বদেশ-চেতনা থেকেও তা আলাদা। তাই বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে তাঁর কবিতার 'তুমি'-কে।

'দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম / তোমার

স্পন্দন থমথমে রাতের মতো / তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া / অনুভব করলাম।' ('দুপুরের সূর্য')—এই ছোট কাবিতাটিতেই অনেকটা চিনে নেওয়া যায় 'তুমি'-কে। রাত্রির থমথমে আবহের মধ্যে তিনি অনুভব করতে পারেন রুক্ষতাকে মুছে দিয়ে শস্যের বিপুল সম্ভাবনা। নারী যেমন বিপর্যয়ের মধ্যেও আনে স্নিগ্ধতার স্পর্শ আর স্বপ্নের সম্ভাবনা, তেমন তাঁর স্বদেশও দুর্গতির মধ্যে জাগিয়ে তোলে অজস্র ভবিষ্যৎকে। শস্য এই শব্দটিতে কবি বুঝিয়ে দেন এক প্রাণদা ভাবনাকেই, আর শিকড়ের উল্লেখ আমাদের জানিয়ে দেয় তার মৃত্তিকাস্পর্শকেই। এই 'তুমি' তাহলে কোনো আকাশচারী কল্পনা নয়, তার যোগ জীবনেরই সঙ্গে, সে-প্রতিমা তাহলে তৈরি হয় মাটিতে, জলকাদাতেই। তাই এই 'তুমি' মিলে যায় ফসল নদী উৎসবের সঙ্গে, গ্রীষ্মের চড়াই ভেঙে এসে তার শ্যামল মুখ চোখে পড়ে, জীবনের আগ্রহে তার ঠোঁটের প্রত্যাশা উদ্ভিন্ন হয়। এইসঙ্গে কবি পেরিয়ে আসতে চান দগ্ধতা আর জড়ত্বের, যেন উদ্দামতা আর অন্ধত্বের, বিপদকেও। কঠিন সেই কাজ, দুয়ের মাঝখানে স্বল্প পরিসর, তার মধ্য থেকে পৌঁছতে হবে পূর্ণতায়—'এ পাশে পোড়া পাহাড় / ও পাশে হিমের শিখর / মাঝখানে এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় তুমি / স্নিগ্ধ ধারায় বও···' ('হৈমন্তী')।

'তুমি'-কে সামনে রেখে কথোপকথনের সুর লেগে যায় তাই কবিতায়। তাঁর সব উচ্চারণ ক্রমশ জড়ো হতে থাকে 'তুমি'-র সামনে। কিন্তু 'তুমি' যদি হয়ে ওঠে কবির সব ভাবনার প্রতীক, তাহলে তার কাছে পৌঁছনোর জন্য কবিকেও তো অর্জন করতে হয় কোনো যোগ্যতা, রচনা করতে হয় তার অভিজ্ঞান। কী সেই অভিজ্ঞান, কী সেই যোগ্যতা ? আসলে কবি শুরু করতে চান নতুন করে। কিন্তু তার মানে তো এ নয়, পুরনো সবকিছু বাতিল হয়ে গেল। উৎসের দিকে তার মুখ ফেরানো, কিন্তু আবার উৎসে ফিরে যাবেন, এমন কথা তিনি ভাবেন না ; এ শুধু পিছন ফিরে উৎসকে দেখে নেওয়া, জেনে নেওয়া কী সঞ্চয় হল। সেই সঞ্চয়ের মধ্যে আছে ছয় ঋতু। তিনি মনে করিয়ে দেন চোখের শূন্য কোটরের কথা, কিন্তু তাতেই সঞ্চয় হয় 'পৃথিবী পুত্রকন্যা / তোমাদের মুখ।' এই তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা। অন্ধ জীবনের কাছ থেকেও তিনি আগামী দিনের যৌতুক

চেয়ে নেবেন—এজন্যই তাঁর উৎসের দিকে তাকানো। এবার তাহলে উৎসকে চিনে নিয়ে, আর পথ পেরনোর অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিয়ে তিনি আবার প্রস্তুত হতে পারেন আর এক আরম্ভের জন্য। বস্তুত এই তো জীবন। বারেবারে ভাঙা, আবার সেই ভগ্নস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়ানো; তখনই বোঝা যায় কবি কোন যোগ্যতায় এসে দাঁড়াতে পারেন ; এখন তিনি বলতে পারছেন—'আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি / তুমি প্রসন্ন হও। / আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি / তুমি প্রসন্ন হও।' ('আর এক আরম্ভের জন্য')। এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবি হয়ে ওঠেন এক গভীর সত্যের প্রবক্তা, যে সত্য আবিষ্কৃত হয় স্বদেশ ও স্বকালের ভিতর থেকেই। এই উচ্চারণকে তখন আর বলা যায় না কোনো তৈরি-করা কথা, কেননা তা উঠে আসছে তাঁর অন্তর-অভিজ্ঞতা থেকেই। স্বপ্নকে ছুঁতে গিয়ে তিনি জেনে নিয়েছেন আনন্দ আর যন্ত্রণার দুই উৎসকেই। আর এ নয় কোনো ভ্রান্তিও, কেননা তিনি কখনো ভুলতে চান না জ্বালাকে, বরং সে-জ্বালায় কথা এত বেশি বলা হয় যে মনে হয় সংশয়ই যেন বড় হয়ে উঠছে।

> পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে।
> খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে।···
>
> ···আরো বলি চাই।
>
> অনেক তো দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে ?
> এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
> কখন ?
>
> 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে'

বোঝা যায় যে প্রসন্নতা চাইছেন তিনি, তা যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে নয়। মুখ-ঘোরানো কোনো স্থৈর্য নয়, ভিতরের প্রবল জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে প্রস্তুত হবার স্থৈর্য এ উচ্চারণে ; 'তুমি'-কে তাই বলা যায়, 'ধ্বংসের প্রান্তরে হিরণ্ময় ভাবনা / তোমাকে উৎসর্গ করলাম' ('উৎসর্গ')।

সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে অরুণ মিত্রের যোগ ছিল, ছিল সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। অবশ্যই সে-যোগাযোগ তাঁকে নিয়ে যায় নি শ্রেণীচ্যুতির দিকে—মধ্যশ্রেণীভুক্ত কোন কবিশিল্পীর ক্ষেত্রেই বা তা ঘটেছে। কিন্তু একটা কঠিন সময় তাঁকেও পেরিয়ে আসতে হয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের যতটা পরীক্ষা দিতে হয়েছে, দলের বাইরের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সে ধরনের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয় নি, তাঁদের পরীক্ষা ছিল নিজের কাছেই। মাঝে কিছুদিন বিদেশবাস, তারপর বিদেশ থেকে ফিরে অরুণ মিত্র চলে গেলেন অধ্যাপনার বৃত্তিতে—কিছুটা প্রবাসও বলা যায় তাকে। এগুলি কি কিছুটা সাহায্য করছিল তাঁকে? হয়তো রাজনীতির প্রত্যক্ষতার চাপ তেমন করে ছিল না বলে, তাঁর ভাবনাকে নিজের ভিতরেই যাচাই করে নেবার একটু বেশি সুযোগ পাচ্ছিলেন তিনি। ধ্বংসের প্রান্তরকে মেনে নিয়েও তাঁর ভাবনা তাই হিরণ্ময় হয়ে উঠতে পারছিল। কিন্তু 'তুমি'-র সামনে দাঁড়িয়ে যে-কথাগুলো তিনি বলতে চান, তাদের শরীরে তো থাকবেই জীবনকে চেনার নানা ছাপ। এই ছাপ স্পষ্ট করে ধরা পড়ল 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর কবিতায়।

'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর কবিতাগুলি যখন রচিত হয়, তাকে বোধহয় বলা যায় বাংলা বামপন্থী কবিতার কিছুটা পালাবদলের যুগ। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাম-দক্ষিণ নানা দোলায় দুলতে দুলতে তখন মোটামুটি গুছিয়ে বসার চেষ্টা করছে। ওদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ওলটপালট ঘটে গেছে, এখানে নেহরুর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বেশ ভরসা পাচ্ছেন সাম্যবাদীরা। দায় ছিল, কিন্তু দায়িত্ব ছিল না—তাই কেউ কেউ ক্রুশ্চভের গলায় ভবিষ্যতের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন, বাকি অনেকের কবিতা প্রায় হারিয়েই গেল। বোঝা যাচ্ছিল, আন্দোলন-আলোড়নের প্রত্যক্ষতায় উচ্ছ্বাসে যা সহজ বলে মনে হচ্ছিল, সেটা না থাকায় আর তা করা চলছে না। কিন্তু এ যদি হয় শান্তির সময়, স্বস্তির সময়, তখনই হয়তো একজন কবিকে অপেক্ষা করতে হয় আরো বেশি—জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে তোলার এই সুযোগকে তিনি কাজে লাগাতে পারেন। বস্তুত একজন রাজনৈতিক কর্মী যেমন এই সময়টাকে ভাবতে পারেন তাঁর কাজের ভিৎ শক্ত করে তোলার

সময়, তেমনি একজন কবিও উচ্ছ্বাসের প্রগল্‌ভতা থেকে মুখ ফিরিয়ে তখন দেখে নিতে পারেন প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির হিশেব, আর জেনে নিতে পারেন আগামী স্বপ্নের প্রস্তুতিকে। এই অভিজ্ঞতাই 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ ধরা পড়ে। এখন তিনি স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন আকাঙ্ক্ষার পোড়ামাটিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যদ্বাণী শোনার ব্যাকুলতার ভ্রান্তি। সে ছিল তাহলে এক আবেগের দিন, কিন্তু সেই আবেগে মিলেছিল বেশি এগিয়ে যাবার তাড়া—কবি তার পাশে মনে করিয়ে দেন নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এসবের কথা। হয়তো উত্তেজনার মুহূর্তে এ কথাগুলোর দাম থাকে না, তবু কবিকে তো তা বলে যেতেই হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা তাঁকে এও শেখায়—বেশি এগিয়ে যাবার ওই তাড়ার পরই আসে হতাশা, তখন আসে নিঃসঙ্গতা আর বিষণ্ণতা। কিন্তু কবি কী করবেন ? 'মনে আছে সবুজ তোরণের নিচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম', আর আজ

> কোনো রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে আমি জানতাম না।
> আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।
> তারা সব আমার রক্তের দোসর।
>
> 'অন্তরঙ্গ'

এই বন্ধুত্ব আর সহমর্মিতা নিয়েই অরুণ মিত্র এগোতে চাইছেন। একসঙ্গে এগোনো শুধু নয়, তাদের বিষণ্ণতাকেও তিনি বুঝতে চাইছেন। এই সহ-মর্মিতায় তিনি বলতে থাকেন মানুষের কথা, তাদের সুখদুঃখের কথা। এখান থেকেই অরুণ মিত্রের কবিতার আরেকটা পর্ব শুরু হল বলা যায়। 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ গদ্যছন্দের যে ব্যবহার দেখা গেল তা শুরু হয়েছিল 'উৎসের দিকে'-তেই—কিন্তু এখানে এসে তার স্বাতন্ত্র্য বোঝা গেল। অরুণ মিত্রের গদ্যছন্দ সমর সেন থেকে আলাদা, বরং যেন তার সাধর্ম্য 'লিপিকা'র সঙ্গেই। এখানে কখনো কখনো এসে যায় একটু যেন গল্পবলার টান। 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ তিনি দুটি আলাদা ভাগে কবিতাগুলি বিন্যস্ত করেছিলেন—টানা গদ্যের মতো লিখে যাওয়া কবিতা, যাতে আছে অল্প কাহিনীর আভাস, আর দ্বিতীয় অংশে পঙ্‌ক্তি ভাগ করে বিন্যাস, সেখানে অনুভবকে কোনো

চরিত্র বা গল্পের উপর ভর দিতে হয় নি। কিন্তু এই যে একটি ছুটি চরিত্রকে তুলে নেওয়া বা একটু গল্প বলার চেষ্টা, এর থেকে বেরিয়ে আসে তাঁর কবিতারই একটি ধরন, আর এই ধরনটি থেকে যায় তাঁর হাল আমলের লেখা পর্যন্ত। 'তুমি' নয়, যেন অনেককেই তিনি বলে যান এসব কথা, যেন ঘরোয়া একটা গল্প বলার আসর, যেখানে কাহিনী নয়, বড় হয়ে ওঠে তার পিছনে মানুষজনের জীবন, আর কথকের নিজের চেনাজানার আবেগ-আলোড়ন। তাহলে মানুষজনের এই জীবনই তাঁর কবিতা। কোন মানুষ, আর তার কোন জীবন ?

> ঘুমের দরজা ঠেলে তারা ঢুকল। কোন্ ভোরের নদীকে ছুঁয়ে এসেছে কোন্ কচি পাতায় হাত বুলিয়ে এসেছে তার ঘোর যেন তাদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে।
>
> 'ঘুমের দরজা ঠেলে'

একথা বলার সময় মনে হয় যেন শুধু স্নিগ্ধতার কথাই জানাচ্ছেন কবি, আর তাতে পাঠকের মনে হতেও পারে একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে কোথাও, কিন্তু সত্যি কি শুধু স্নিগ্ধতাকেই তিনি জানছেন জীবনের একমাত্র পরিচয় বলে ? 'ছবিতে ভরা একখণ্ড আকাশ তারা চালচিত্রের মতো সাজিয়ে ধরল।' —সেই চালচিত্রে পেঁছিনো যায় কীভাবে ?

> 'অথচ তাদের কপালে ঝঞ্ঝার অনেক রেখা। বেশ বুঝলাম, তারা মাঝ-রাস্তায় ঝড়ের কেশর মুঠো ক'রে ধরেছিল আর বাঁশঝাড়ের মাথায় লক-লকে বিদ্যুতের দিকে সামনাসামনি তাকিয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা তারা একটুও বলল না। তারা বলল কেবল জল আর নরম মাটির কথা।
>
> 'ঘুমের দরজা ঠেলে'

তাহলে অজস্র ঝড় আর ঝড়কে হার-মানানোর অভিজ্ঞতাকেই তিনি জানছেন জীবন বলে। কিন্তু তার থেকেও বড় হল শেষ উপলব্ধিটুকু। ওই জল আর মাটিতেই তো লেগে থাকে মানবিক স্পর্শ, জীবনের উত্তাপ আর শুশ্রূষা। একটা প্রশ্ন হয়তো জাগতে পারে এখানে। এই সহজ মানবিকতাতেই পৌঁছনো হয়তো অভিপ্রেত। আর স্পষ্টতই কবি কোনো ব্যক্তিগত বাসনার কথা উচ্চারণ করছেন না, বড় হয়ে উঠছে সমষ্টিরই কামনা। কিন্তু তা কি ইতি-

মধ্যেই পূরিত, না তা আজো শুধু সহজ বাসনা হয়েই আছে? মনে হয় কবি যেন একটু মেনেই নিচ্ছেন সহজ সুস্থতার প্রতিষ্ঠার কথা, যেন ঝড়বিদ্যুতের দিন ইতিমধ্যেই পুরোপুরি পার হয়ে আসা গেছে। কিন্তু ইচ্ছাপূরণের ভ্রান্তিতে তিনি খুব-একটা ভোলেন না, বাইরের সহজ শান্তির আড়ালের টেনশনকেই মনে রাখেন, সূর্য-ওঠার সীমানায় কাঁটাতারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেন 'কেবল শূন্যের চাপ'। এই শূন্যতা যেন ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়, জল আর নরম মাটির সাধ-স্বপ্নের ভিতরে এই ফাঁককে তিনি মেনে নিতে পারেন না, ফেটে পড়তে চান ভূমিকম্পের মতো। কিন্তু সে কি কবির ব্যক্তিক বাসনা? তাঁকে তাই বিশ্বাস রাখতে হয় সাধারণ মানুষের উপরই, সহজ মেঠো মানুষ যারা—'গমের ক্ষেতে তাদের দু'জনকে দেখেছিলাম।' কিন্তু এই দুজন, কিংবা তারাই হয়তো অনেকজন, পাকা ফসলের শিস নিয়ে পথ পেরিয়ে এলেও একসময় হারিয়ে যায়।

> উদ্‌ভ্রান্ত হাট থেকে বেরিয়ে এসে দুটো মুখের আদল দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম। তারাই বুঝি গাঁয়ের আবছা কোণে দু'খানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে ব'সে আছে। কিন্তু এতখানি ব্যর্থতা আমার বিশ্বাস হল না।
>
> 'দু'জনকে দেখেছিলাম'

কিন্তু ব্যর্থতাকে বিশ্বাস না করলেও, চারপাশে শুধু 'নিবিড় উৎসাহের প্রবাহ' ভাবতে চাইলেও, অভিজ্ঞতায় আবার ধরা পড়ে প্রতিকূলতা। খাঁ খাঁ মাঠ, ঝরেপড়া গমের দানা আর ধুলোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবি যতই অনুভব করতে চান, 'ওরা দু'জন তো সেই কোন্ কালে স্বপ্ন দেখতে চ'লে গিয়েছে'—তাকে মনে হয় হতাশ্বাসের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজা! কেননা এর পাশেই তিনি অনুভব করেন চরম নিঃস্বতাও—

> ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে।···
>
> ···তার গলা শুনলে মনে হবে জীবনের অন্য এক পার থেকে সে কথা বলছে। সে বলবে: দুপুরের আগুন তার পাঁজরায় লেগেছিল, তার পায়ের তলা থেকে নদীর চর স'রে স'রে গিয়েছিল আর তারই হাতের উপর ফসলের চারাগুলো অবশেষে এলিয়ে পড়েছিল।
>
> 'ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে'

খুবই মর্মান্তিক এই অভিজ্ঞতা। কিন্তু 'এসব কথা যতই অবাস্তব শোনাক, তার নিজের কাছে এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই।' কিন্তু কবির কাছে কোনটা সত্য ? স্বপ্ন দেখতে চলে যাওয়া দুজন, না 'ঝরে পড়ে ধুতরো আর আশশ্যাওড়ার ঝাড়ের ভিতর হারিয়ে যাবে' যে মুখ, সেটা ? কবি ভর দেবেন কীসে—শুধুই আশার পাখায়, না ফতুর বাস্তবে ?

মানতেই হয়, এর মীমাংসা খুব কঠিন। আর রাজনীতির তত্ত্বে যত বড় সান্ত্বনাই থাক না কেন, তত্ত্ব যতক্ষণ না রূপ পাচ্ছে কর্মে, ততক্ষণ শুধু বুলিতে নির্ভর করে এড়ানো যায় না সময়ের এই রূঢ়তাকে।

অতএব প্রতীক্ষা ; তিনি ভুলছেন না কোনো কিছুই। তাঁর 'চোখের মণিতে এক নিবিড় রোদ', কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দেন—

> ··· আমার শিয়রে ঝড় জমে আছে।··· আমার দৃষ্টির ভিতরে আকুল সংসার, কীর্তিনাশা, আচমকা ঘুম ভাঙার পর নিরুদ্দেশ মিছিল।··· শরতের ভোরের সীমানায় আমি এক অন্ধ ইতিহাস বয়ে এনেছি।
>
> 'শরতের ভোরের সীমানায়'

এ কথা ঠিক, স্বপ্ন দেখাকে যদি মনে হয় একটু বেশি আশাবাদ তাহলে এই অন্ধ ইতিহাসের ধারণাকেও মনে হওয়া উচিত বেশি হতাশা বলে। কেননা সব মিছিলই তো নিরুদ্দেশে যায় না। আসলে এও একটু উলটো আবেগ, একটু বেশি ছড়িয়ে বলা। বোঝা যায় তিনি আন্দোলিত হচ্ছেন দুই প্রান্তে, মেলাতে পারছেন না কোনো দাঁড়ানোর জায়গা ; যদিও তারই খোঁজ করে চলেন তিনি।

'আমি ছায়া খুঁজছি / তোমার গলার স্বরে / ··· তোমার স্বরে আমার শান্তির আস্বাদ। / দুঃখ আর আনন্দের ঝঙ্কার / দাবদাহ জুড়িয়ে / ··· তোমার গলার অন্ধকারে / রহস্যের পর রহস্যের সৃষ্টি।' ('দগ্ধ দিনে')—স্পষ্টতই এ প্রেমের উচ্চারণ। হঠাৎ মনে হতে পারে কবি কি তাহলে বাইরের পৃথিবী থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, আশ্রয় খুঁজছেন একান্ত ব্যক্তিগত সান্ত্বনায় ? কিন্তু দগ্ধ দিনে শুধু এই সান্ত্বনায় কি মুখ লুকনো সম্ভব ? তাহলে এ কি পলায়নবাদ ? সেটা স্পষ্ট করে বোঝা সম্ভব তাঁর 'তুমি'-কে বুঝতে পারলেই। একটি কবিতায় তিনি বলেন, 'তোমার প্রেম আমি রেখেছি /

নিশুত চোখে দুপুরের কোলে নীরবতায়', কিন্তু তারপরেই মনে করিয়ে দেন, 'একটা আলো নিয়ে কেউ হাঁটছিল / কোথা থেকে কোথায় জানি না, / তুমি হাসলে / তোমার ঠোঁট যেন দিগন্তে আঁকা হয়ে গেল, / তার দিকেই আমরা চলেছি' ('নীরবতায়')—এই প্রেমোচ্চারণটি আমাদের খেয়াল করতে হয় ; কবি এখানে 'আমি' নয়, বলছেন 'আমরা'র চলার কথা। স্পষ্টতই শুধু ব্যক্তিগত নারীর উপস্থিতিই নয়, তাকে ছাড়িয়ে 'তুমি' পৌঁছতে চায় সমষ্টির অভিজ্ঞতায়। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শুনি, 'তোমায় এতদূর আনলুম / …এসো এবার আমরা অপলক চেয়ে থাকি / সমস্ত ঋতুর জানলা দিয়ে / যদি হঠাৎ দেখা যায় / ভয়ভাঙা সুন্দর মাটি' ('নীরবতায়')। ফলে মরা ডালের নিঃস্বতা সত্ত্বেও তিনি আশা ছাড়েন না, কেননা বোঝেন হিমের করাতও কাটে নি যাকে, তাতে নতুন করে পাতা জাগতে পারে। কাজেই চুপচাপ তার উপর ভালোবাসার কথাগুলো মেলে রাখতে চান তিনি। এই ভালোবাসা তাহলে সব ভাঙন পেরিয়ে যাবার আশা, এই 'তুমি' তাহলে সেই আশারই প্রতিমা। এই আশাতেই তাঁর ভর, তাতেই তিনি বলতে পারেন তুফানের পরের কাহিনী, প্রলয়ের জলে ধোয়ার পরে নতুন মাটির গল্প। কী করে এটা সম্ভব হয় ? সে শুধু স্বপ্নগুলোকে লাখো হাতের তল্লাশ এড়িয়ে আগলাতে পারার জন্য। 'শীতের আগুন থেকে কয়েকটা আঙার / আমি তুলে রাখি / যদি আবার তাদের জ্বালানো যায় / আরেক শীতে।' ('আমার মুখে তাকাও')—একে বলা যায় অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, এমনকী শীত পেরলেও আগুন নিভতে না দেওয়ার চেতনা ; স্পষ্টতই একে তিনি পেয়ে যান তাঁর বোধে. যখন বাইরের আন্দোলন না থাকলেও ভিতরে ভিতরে আন্দোলন থেকেই যায়, তখনই বলা সম্ভব হয়, 'তোমার শোকতাপের মুখখানা তোলো / আমার মুখে তাকাও।' ফলে 'তুমি' যেমন আর কোনো অবিচ্ছিন্ন শান্তি হয়ে থাকে না, তার শরীরেও লেগে যায় শোকতাপের চিহ্ন, তেমনি সে হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে বেঁধেই এক সমষ্টিগত স্বপ্নের প্রতীক। অরুণ মিত্র বারেবারেই মনে করিয়ে দেন চারপাশের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া যেমন সত্য, তেমনি তা থেকে বেরিয়ে আসার উদ্‌বেল কামনাও সত্য। জীবন যদি অন্ধ গলি হয়ে দাঁড়ায় কখনো,

তাহলেও সেখান থেকে 'সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুনি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে।' বারেবারে এই কামনাই তিনি জানিয়ে যান ; অন্ধ গলির সীমানা ছাড়িয়ে দিগন্তকে নতুন করে তৈরি করা—এই প্রসারণ, ব্যাপ্তি তো মানবেতিহাসেরই আন্তর-সত্য। শুধু প্রশ্ন এই যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় কীভাবে? সময় ও পরিস্থিতি যখন অনুকূল, তখন কবির পক্ষেও সহজ হয়ে যায় এই ভাবনাকে টিঁকিয়ে রাখা, কিন্তু যদি তা প্রতিকূল হয়, অন্তত সহায়ক না হয়, তাহলে তো কবির দায়িত্ব বেড়ে যায়। সে-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়, নিজের ভিতরে ভাবনার ভিৎটা শক্ত থাকলেই ; অর্থাৎ বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিশ্বাস? শুধু বই-এ পড়া কথায় বিশ্বাস তো অন্ধত্বেরই নামান্তর। শোনাকথা-পড়া-কথায় আত্মসমর্পণের বদলে আসলে যাচাই করে নিতে হয় চারপাশকে, আর চারপাশের ক্রমাগত টানাপোড়েনে নিজেকেও। নিজের সঙ্গে এই বোঝা-পড়াতেই একসময় পৌঁছনো যায় একটা নিশ্চিতিতে, তা শুকনো কথার পর্ব ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে নিজের উপলব্ধি। 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর কবিতাগুলিতে এই বোঝাপড়ার পর্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর টের পাওয়া যায় তিনি পেঁছচ্ছেন উপলব্ধিতেই। সেই উপলব্ধিতে পেঁছতে পারলে, তখন আর ডুবতে হয় না নৈরাশ্যে, অন্ধকারকেও ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না, বরং অন্ধকারকেই ভাবা যায় নতুন ঝংকারের উপাদান বলে, চামড়ার নীচে থমকানো মৃত্যুকে নিয়েও অপেক্ষা করা যায়, ভাবা যায়, 'ঘুমন্ত সব বীজ আমি ছুঁয়ে আছি।' এই ঘুমন্ত বীজগুলি একদিন শস্য ফলাবে, এ আর শুধু তত্ত্বকথা থাকে না, তা সঞ্চারিত হয়ে যায় বোধের মধ্যে। ফলে আবার 'তুমি'-কেই আহ্বান জানানো যায়, কেননা 'তুমি' তখন হয়ে ওঠে ওই বীজ থেকে শস্যে বদলে যাওয়ার প্রতীক—আশা, ভবিষ্যৎ সবকিছু। আর যে বৃষ্টির কথা তিনি বারেবারে বলেন, তাও হয়ে ওঠে শুশ্রূষা, বলা যায়, 'এবার এস। ঝরোঝরো বৃষ্টি নিয়ে তুমি এস।' শুধু আহ্বান নয়, তাকে পাওয়ার শ্রমও মনে করিয়ে দেন কবি—'আমার শপথগুলো স্তবকের মতো / ধরি দূর চোখে / ··· তোমার সহজ বিকিরণ / খুঁজি এক গভীর স্বভাবে, / পাথরের দিন ভেঙে তোমাকেই আবিষ্কার করি।' ('পাথরের দিন ভেঙে')। পাথর কি তাহলে কোনো

জগদ্দল বাধার চিহ্ন? বোঝাই যায় একবারও তিনি ভুলছেন না, আশা যতই প্রবল হোক না কেন, শুধু আকাঙ্ক্ষাই পৌঁছে দেয় না কোথাও, তার জন্য ভাঙতে হয় অনেক প্রতিকূলতাকে।

'ঘনিষ্ঠ তাপ'-কে শেষপর্যন্ত তাই মনে হয় এক উত্তরণের কবিতা, উপলব্ধিতে পৌঁছনোর কবিতা। যেন কবি পেয়ে গেলেন তাঁর নিজস্ব জায়গা। তাহলে কি এবার কবিতায় আর কোনো দ্বিধা নেই, সংশয় নেই? কবির পক্ষে এও এক সমস্যা হয়তো। মনে হতে পারে, একবার যদি জেনে নেওয়া যায় শেষকথা, তাহলে আর তো কিছু বলার থাকে না নতুন করে। একথা ঠিক, সময় কেবলই এগোতে থাকে, কেবলই বদলাতে থাকে পরিপার্শ্বের মুখচ্ছবি, আর পুরনো কথাও বারেবারে বলা যায় নতুন করেই। অরুণ মিত্রের কবিতায় তাহলে এবার আশা করা যায় সেই নতুন ভঙ্গি, তাঁর ইতিমধ্যেই উচ্চারিত আশাকে যা সাজিয়ে দেবে নতুন থেকে নতুনতর করে। 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'—তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের এই নামকরণই অবশ্য পাঠককে ভাবায়। যে মানুষজনের গল্প শোনাতে চাইছিলেন তিনি, আর সেইসব গল্পের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে জেনে নিচ্ছিলেন নিজের জগৎকে, যাচাই করে নিচ্ছিলেন নিজেকে, সেই মানুষের কাছাকাছি যাবার আকুতি যেন এই শব্দকটিতে বেজে ওঠে। এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ, 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর সাত বছর পরে। এই সাতবছর ও তার পরবর্তী সময় একজন বাংলা ভাষার কবির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত যিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমার মনকে আমি পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না এবং করতে চাই না'—তাঁর কাছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা পরিবর্তন, এবং তারই টানে এখানকার সাম্যবাদী আন্দোলনের দুই লাইনের লড়াইয়ে আলাদা পার্টিতে তৈরি হয়ে যাওয়া, এবং তার কিছুকাল পরেই বিপ্লবী রাজনীতির আত্মপ্রকাশ—এই তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক আবহে মানুষের দিকে মুখ-ফেরানো একজন কবির নাড়া খাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে 'প্রান্তরেখা'র দু-একটি কবিতা ছাড়া অরুণ মিত্রের রচনায় কখনোই সমকাল বা তার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকে না, কাজেই ইতিহাসের এই পটপরিবর্তন সন-তারিখের হিশেব নিয়ে তাঁর কবিতায় এসে হাজির হবে এমন

আশা করা যায় না। তা ঘটেও নি, বরং প্রথমে মনে হতে পারে, কবি যেন এক উলটো অভিজ্ঞতার সামনেই দাঁড় করাতে চাইছেন আমাদের; যেন মনে করাতে চাইছেন, সবই ঠিক আছে, কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই। যে উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছেছিলেন, তার সঙ্গে মানানসই এই মনে করানো, এমন ভাবা যায়। কিন্তু উপলব্ধির গভীরতা মানে তো এ নয় যে, কোথাও কোনো বদল বা উলটো স্রোত দেখা গেলেও তাকে অস্বীকার করবেন কবি। বরং হওয়া তো উচিত এমনই যে, সেই উলটো স্রোতেও টলবেন না তিনি। ভাঙন আর হতাশা-জাগানো অন্ধকারকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এ, তাকে পেরিয়ে যাবার উদ্দীপনায়, কিন্তু এখন যেন তিনি একটু বেশি শান্তি খুঁজছেন, যেন পথচলা শেষ করে পৌঁছে গেছেন বাঞ্ছিত ভূমিতে: 'অবশেষে পথ ফুরোল আর আমি বিপুল হৃদয়ের ধ্বনির ভিতরে চোখ বুজলাম। / এই আমার চেনা জায়গা চেনা সময়, / শান্তির আদিগন্ত রাত নিয়ে আকাশ।' ('নিভৃত')। চেনা জায়গা, চেনা সময়ের মধ্যে যে শান্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন, তা কি সত্যি ছিল? মনে হয় তিনি যেন একটু বিচলিত বোধ করছেন, আর সেই বিচলনকে চাপা দেবার জন্যই বলতে হচ্ছে এতটা শান্তির কথা। অথচ সৎ একজন কবি তো সত্যি পারেন না এভাবে তাঁর অস্থিরতাকে চাপা দিতে—সেই অস্থিরতার কথা তাঁকে বলতেই হয়, বলতে হয় সংশয়ের কথাও।

প্রত্যয়ের পর সংশয়। তার মানে এ নয় যে শিথিল হয়ে গেল সেই প্রত্যয়, যদিও সেই ভয়ও জাগে কখনো কখনো।

> পোল পার হওয়ার সময় আমার একধরনের ভাবনা হয়।…আমার ভাবনা হয় আমি কিভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে-কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি।…
>
> …এবার যদি সমস্ত মাটি সীসের মতো হয় তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব?
>
> 'পোল পার হওয়ার সময়'

এই সংশয় তাঁর জাগছে, যেন ওই শান্তির কথাতে আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। বস্তুত যতই তিনি আদিগন্ত শান্তির কথা বলে শুরু করুন না কেন,

এখন তাঁর মনে বারেবারেই আসছে নানা দ্বন্দ্ব ; অভিজ্ঞতার এও আরেক পিঠ। তাঁকে টের পেতে হচ্ছে চারদিকে স্থবির ঘর অন্ধ জানলা, তাঁর দ্বিধা— 'মিলিত স্বরের জন্য এক গান বাঁধা ছিল / কিন্তু কারা তা গাইবে ?' বারেবারে তিনি জীবনের পরিপূর্ণতার কথা বলতে চেয়েছেন ফসলের প্রতীকে, মনে হয়েছে সেই ফসল ছাড়া আর কিছু নেই— 'আমার রক্ত যেন কথা বলতে চেয়েছিল / কিন্তু জিজ্ঞাসায় নয় / ফসল যেমন ফলে তেমনি ক'রে বলবার জন্যে' ('দূর দূরান্তের পর'), কিন্তু তাও যেন মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে— 'জল টের পাবার স্পর্শ নিয়ে এক দুর্বোধ্য ঋতু / নিরুদ্দেশে গেল, / আমি এই হাত অন্ধের মতো মেলে / তাকে নিঃশব্দে বিদায় দিলাম।' অন্ধের মতো—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা টের পাই এক বিপুল আর্তি, এক গভীর প্রত্যয়ে উপনীত হয়েও যেন ভাঙনের শব্দ শুনতে হচ্ছে, একটার পর একটা কবিতায় সেই ভাঙনের কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে।

> একটা কথাও থিতোয়না, দিনরাত প্রতিধ্বনির তামাশা। যে-সব শব্দ আমি শিখেছি, তাদের অর্থ আমার আয়ত্তে নেই। তাদের প্রতিশ্রুতি এক, ব্যবহার আর এক।
>
> 'কথা এখনো ফোটেনি'

বলতে হচ্ছে—

> …তাদের জানা ছিল না নির্ভরকে কুরে খাবার পোকা প্রত্যেক নিঃশ্বাসে গিসগিস করে। এবং তাদের জানা ছিল না মানুষের মুখ ছুঁয়ে 'এই আরোগ্য' বলতে গিয়ে বাতাস এক সময় হাহাকার ক'রে ওঠে।
>
> 'কোনো চিহ্ন নেই'

মর্মান্তিক এক অভিজ্ঞতা, যেন কোনো সান্ত্বনাই আর অবশিষ্ট থাকে না, কেননা 'আমার একান্ত কাছের মুখগুলো বরফের মতো গলে গলে যাচ্ছে…।' কীসের উপর ভরসা রাখবেন কবি! যে 'তুমি' তাঁর প্রেম ও প্রত্যয়ের প্রতিমা, তাকেও যেন আর বুঝতে পারেন না ঠিকমতো, সবই কেমন পালটে গেছে।

> তুমি হাত তুলে ইঙ্গিত করো। তোমার তর্জনীতে একটা জলের কণা

চিকচিক করে। সে তোমার অশ্রু, না, শিশির তা কখনো জানব না.
জানতে চাইব না।

'অন্ত পট'

এই না-জানায় নেই কোনো রোম্যাণ্টিকতার রহস্য, আছে অভিমানের বেদনা, যেন জেনে কোনো লাভ নেই আর, এত তিক্ত এখন—'আমার মুখে ছাইয়ের আস্বাদ।'

একথা ঠিক, সে এক অদ্ভুত সময় তখন। রাজনীতির নিরন্তর অনুশীলনে অনেক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যায়, কিন্তু শুধু মানবিক প্রত্যয়ে এই পরিস্থিতিকে বিপর্যয়কর মনে হতেও পারে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির অনুশীলনেও যে ভ্রান্তি আসে না তা নয়, কিন্তু সেখানে একটা সান্ত্বনা থাকে, তা হল : কাজ করার ভুল, যাকে আবার কাজের মধ্যেই শুধরে নেওয়া সম্ভব ; এ ছাড়া সে-ভ্রান্তিতে সমষ্টির সায় থাকে বলে ব্যক্তির দায় একটু কমে যায়। কিন্তু এর বাইরে বিচারটা হয় যখন মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শুধু, নিজের ভাবনার সূত্রে, তখন ফাঁক দেখা দিলে তা মেনে নিতে যথেষ্টই অসুবিধা হয়। সেই ফাঁককে একেক সময়ে মনে হয় অনতিক্রম্য। কিন্তু যে মানবিক প্রত্যয়ে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, তা কি এতই ভঙ্গুর ? যে-সব রক্ত অশ্রু পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন তাঁর উপলব্ধিতে, তাঁর চারপাশের সমকালের অভিজ্ঞতা কি তার থেকেও মর্মান্তিক ? সেটা তিনি মেনে নিতে পারেন না শেষপর্যন্ত। আবার নতুন করে তাঁর উপলব্ধিকেই তিনি যাচাই করে নিতে চান। সব তত্ত্ব আর জ্ঞানের বদলে তিনি যেন এখন বুঝে নিতে চান স্পর্শে, 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো।' এ যেন একধরনের অভিমান, যেন কথা আর লেখায় বিশ্বাস হারিয়ে তিনি মনে করতে চাইছেন শুধু অনুভবেই জেনে নেবেন মানবিক সত্যকে।

…অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার স্তব্ধমুখের অন্ধকারে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব। মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।

> …আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে।…
> আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরাউপশিরা
> বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব
> কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।
>
> 'প্রাজ্ঞের মতো নয়'

বস্তুত এ উচ্চারণ কিছুটা বেদনারই—প্রত্যয়কে টিঁকিয়ে রাখার আন্তরিক প্রয়াস, কিন্তু তাতে মিশে আছে কিছুটা দীর্ঘশ্বাসও। সেই দীর্ঘশ্বাসকে চাপা দিয়ে তিনি নিজেকে যাচাই করে নিতে চান—'মনে হতে পারত আমার হাঁটা নিশি-পাওয়া, / …কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না / কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না, / কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে।' ('নির্ভর')। এই কথাটা আসলে নিজেকে শোনানোর জন্যই। নিজেকে তিনি মনে করিয়ে দেন, তাঁর যে যাত্রা, তা কোনো ঘোর নয়, সচেতন বলেই তিনি কোনো প্রাপ্তি বা কোনো হতাশা, কিছুতেই আটকে যান নি। পাথর এখানে বাধা নয়, তা কাঠিন্য আর সুস্থিরতার দ্যোতক—সেই কাঠিন্যে তাঁর প্রত্যয় বাঁধা। ছাইয়ের আস্বাদ মুখে নিয়েও, তিক্ততা আর যন্ত্রণা বয়েও তিনি তাই হার মানেন না। তাঁর পরবর্তী একটি কাব্যগ্রন্থের নামই তাই হতে পারে 'প্রথম পলি শেষ পাথর'।

'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' প্রকাশের আট বছর বাদে ১৯৭৮-এ বেরয় 'শুধু রাতের শব্দ নয়', আর ১৯৮১-তে 'প্রথম পলি শেষ পাথর'। 'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর কবিতাগুলির রচনাকাল অবশ্য কবি স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন—১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯। অর্থাৎ সত্তর দশক এদুটি বই-এর কবিতাগুলির রচনাকাল। বাংলাদেশের জনজীবনে সব থেকে আলোড়িত সময় এই সত্তর দশক—রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, ঐতিহ্য সবকিছুকে এমন ভাবে নাড়া দিয়ে যায় নি আর কোনো সময়। আগেই দেখা গেছে, অরুণ মিত্রের কবিতায় সমকালের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকেই না প্রায়—তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপেরও কোনো সরাসরি উল্লেখ তাঁর রচনায় নেই। তার কারণটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো নয়। সুভাষ অজস্র স্থান, ঘটনা, চরিত্রকে সোজাসুজি তাঁর কবিতায় তুলে এনেছিলেন, তবু

কাকদ্বীপের প্রসঙ্গ যে আনেন নি, তার কারণ ওই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস। অরুণ মিত্রের কবিতার ধরনটিই আলাদা। কাজেই সত্তর দশকের রক্তাক্ত ও যন্ত্রণার্ত দিনগুলির স্পষ্ট উল্লেখ তাঁর কবিতায় থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর আগে যিনি বিভ্রান্তি আর অপমৃত্যুর মাঝে আঁকড়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রত্যয়কে, এখন তিনি কী করবেন, তা পাঠকের কৌতূহলের বিষয় হতেই পারে।

'শুধু রাতের শব্দ নয়'—একথা বলতেই অবশ্য বোঝা যায়, তিনি খুব সোজাসুজি তাঁর প্রত্যয়ের কথাই জানিয়ে দিচ্ছেন, আর তা জানাচ্ছেন সমুদ্র. ভোরবেলা, যাত্রা এইসব বহুব্যবহৃত শব্দের সাহায্যেই। কিন্তু খুব নিশ্চিত নয় এ উচ্চারণ। চারপাশে তাকিয়ে তিনি দেখেন বণিকসভ্যতার নানা কুশ্রীতা, সমর সেনের মতো নয়, কিন্তু দেখেন এমন একটা সমাজ, যেখানে শুধু সাজানো দোকান, যার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকলে বেরনো যায় না, সেখানে সবই পণ্য, আর ফল-সব্জিতেও লেগে আছে পারমাণবিক ছোঁয়াচ। তিনি দেখেন 'কোটর ছেড়ে একে একে প্যাঁচারা গভীর শহরে ওড়ে', দেখেন 'চোখ মুখ ঠোঁটের ভাষার তলায় / বুঝি এক করাত শিকড়ে শিকড়ে বসানো ছিল।' এমনকী এতটাই বলতে হয়, 'কাদার পরতে একটাও অঙ্কুর নেই / কোনো হাতের মায়া কোথাও লেগে নেই ; / ···আমার মাথার উপরে চারপাশে / আকাশ গর্জায় / আর পায়ের দিকে অবিরাম পাল্টা স্রোত।' ('অন্ধ স্রোত', 'শুধু রাতের শব্দ নয়')। এইসব অভিজ্ঞতা ঢুকে যায় ভাবনার আনাচে-কানাচে। আর তা এতই প্রবল যে, প্রায় প্রথম থেকেই অরুণ মিত্র যে ফসলের কথা বলেন, যে ফসল তাঁর কাছে হয়ে ওঠে জীবনের প্রেমের পরিপূর্ণতার প্রতীক—সেই ফসলের সম্ভাবনাতেও আর তিনি আস্থা রাখতে পারেন না ; 'তবে কি তার পায়ের কাছে / ফাঁদের মাটি ছিল? / সে ছেলে-মানুষের মতো / সেখানে ভর দিতে গিয়েছিল? / তাহলে ফসল এবার লোপাট হবে, / আমাদের সামনে নিশ্চয় আকাল।' ('ফসল ঘন হয়ে উঠলে', 'প্রথম পলি শেষ পাথর')। এই নৈরাশ্যের কথা এভাবে তিনি কখনো বলেন নি। এখন কেন বলছেন তাও খুব স্পষ্ট নয়। কেননা সত্তর দশক জুড়ে যে অস্থিরতা, তাকে যাঁরা রাজনীতির দিক থেকে মানতে পারেন

নি, বা সরাসরি তার বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও বাধ্য হয়েছিলেন তার উদ্দামতা আর আত্মত্যাগকে মেনে নিতে, সমর্থনের আনন্দে না হোক, বেদনায় তো বটেই। কিন্তু এখানে যেন সময় তাঁর কাছে বয়ে আনছে এক নিষ্ফলতার কথা — চারপাশে তাকিয়ে তিনি টের পাচ্ছেন শুধুই বন্ধ্যাত্ব।

অথচ সত্যই কি এমন বন্ধ্যাত্বই ছিল এই সময়ে? এও যেন একটু বাড়িয়ে বলা। কিন্তু কেন? আকালের নিশ্চয়ত্ব কী করে অনুভব করেন তিনি? সম্ভবত এও তৈরি হয় ভারতীয় রাজনীতির টানাপোড়েন থেকেই। গোটা সত্তর দশক রাজনীতিতে উদ্‌বেল ছিল, তেমনি তা সংসদীয় মার্কসবাদী দলগুলির নানা বিভ্রান্তির সময়ও বটে। সেই বিভ্রান্তি হতাশাও আনে। কী করে সেই হতাশাকে ঠেকাবেন কবি? অরুণ মিত্রের কবিতার ধারা থেকে একটা ব্যাপার তো স্পষ্ট যে, তিনি আত্মমগ্ন কবি নন, বাইরের পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে, তার স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনো দেয়াল-ঘেরা জগৎ বানানো তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু বহির্জগৎকেও তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না ঠিকমতো। এই না-বোঝার অস্বস্তিই এনে দেয় বিভ্রান্তি, আর তা থেকে হতাশা। আসলে শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই একটু দূর-থেকে-দেখার ব্যাপার থেকেই যায়; কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন কারও পক্ষে তীব্র আপত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব এই সময়ের নানা মুখ, আবার নিছক সমবেদনায় আর্ত হওয়াও সম্ভব, আবার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একজন কবিও তাঁর নিজের অবস্থান থেকেই বিরোধিতা বা সহমর্মিতা অনুভব করতে পারেন ওই রক্তাক্ত দিনের নানা মুখের সঙ্গে। কিন্তু যিনি ততটা যুক্ত নন রাজনীতির সঙ্গে, অথচ একদা রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলেন, আর এখনো উৎসুক থাকেন চারপাশের জীবন সম্পর্কে, তাঁর পক্ষে প্রত্যাখ্যান বা সহমর্মিতা কোনোটাই সহজ হয় না। আর বিশুদ্ধ মানবিক আবেগ নানা জটিলতাই বাড়িয়ে দেয়। '···আমি রাত-ভোর / ঘর-দোর ভাঙার শব্দ পাই, / এবং আমার চব্বিশ ঘণ্টায় / রক্তের তাজা গন্ধ, / আমার যা কিছু স্বপ্নের ভিতরে / তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে।' ('এই ইস্পাত', 'শুধু রাতের শব্দ নয়') — এর পাশেই মনে হয়, 'আমি এই সামান্য মানুষ / তবু এখন আমার রক্তে / গর্ব ঝমঝম করে, / আমার ভাইরা সকালের রোদ / মুঠো

ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছি, / তাদের গলার আওয়াজ / লাল নদীর স্রোত পেরিয়ে আমার কানে।' ('যদি তাদের বুকের পাশে')—একই সঙ্গে বিপন্নতা আর গর্বকে মেলানো একটু শক্ত হয়ে পড়ে। বোঝা যায় না কোন পথে হাঁটবেন কবি। বস্তুত একটু যেন টাল-মাটাল হয়ে পড়েন তিনি। আর সম্ভবত এ কারণেই এই পর্বের অনেক কবিতাই আকাঙ্ক্ষিত সংহতি বা ব্যঞ্জনাধর্মিতা পায় না। অনেকসময়ই বক্তব্যকে সোজাসুজি বলে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যেন অস্থিরতা এমনই, কবি অপেক্ষা করতে পারেন নি নিজের ভাবনাকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। 'শুধু রাতের শব্দ নয়' গ্রন্থের 'অথচ জলের জন্যেই', 'চক্কর', 'ঠাসবুনোন শহরটা' বা 'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর 'আবার এক অস্থিরতা', 'আমি ধোঁয়া দেখে' বা 'অপেক্ষায়' ইত্যাদি কবিতায় শুধু বলার কথাই শোনা যায়, তার ভিতর থেকে উৎসারিত হয় না তেমন-কোনো স্রোত। আসলে এও তো এক বোঝাপড়ার সময়, সেখানে অস্থিরতা বড় হয়ে উঠলে কবিতার কিছুটা ক্ষতি হয়েই যায়।

কিন্তু সেইসঙ্গে টের পাওয়া যায় কবির আকুলতা, সেই আকুলতায় কোনো খাদ নেই। তিনি যদি কোনো প্রান্তে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলাতে না পারেন, তাতে তাঁর ধারণার স্বচ্ছতা নিয়ে অনুযোগ তোলা যায়, কিন্তু তাঁর সততাকে মানতেই হয়। আরো বোঝা যায়, তাঁর যে দ্বন্দ্ব, টানা-পোড়েন—এগুলির মীমাংসা করতে হচ্ছে তাঁকেই, একা একা। এই একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থানেরই ফল, কিন্তু তা তৈরি হয় কিছুটা ওই সততার জন্যই। নিঃসঙ্গতা, আর তা থেকে জন্ম-নেওয়া চরম নৈরাশ্যের কবিতা 'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর 'এই কয়েকটা ছত্র'। বন্ধুদের মনে করে কয়েকটা ছত্র রচনা করেন তিনি, যে বন্ধুদের দেখা পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল। স্পষ্টতই তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তাঁর—'কোন দিক দিয়ে তারা এসেছিল, কোন দিকে আমি গিয়েছি।' কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতায় যেন সেতু বাঁধা যায় না। এই বন্ধুরা কারা—কবিতায় তার স্পষ্ট উত্তর খোঁজার কোনো মানে হয় না ; কিন্তু একদিন যাদের মনে হয়েছিল রক্তের দোসর, এরা কি তারাই ? তাহলে সময় এমনই খড়্গের মতো নেমে আসে মাঝখানে, যখন থাকে শুধু বেহুঁশ রক্তের বিড়বিড়—'ভালোবাসা স্বপ্ন

আহ্লাদ ইত্যাদি, পৃথিবীতে স্বর্গ ইত্যাদি।' তাহলে এই বিচ্ছিন্নতা নিজেরই ব্যর্থতা এমনও মনে হতে পারে। কিন্তু এরপর যখন তিনি সংশয় জানান, 'তাহলে কি প্রশ্ন আর দিক ঠিক করার নয় ? এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যাওয়ার ?' তখন বোঝা যায় ব্যর্থতাটা তাঁর নয়, তিনি দিক ঠিক করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু দূরে চলে যায় বন্ধুরাই। ফলে ওই নিঃসঙ্গতা নিয়ে তাঁকে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। ছড়ানো ভালোবাসায় শিকড় গাড়তে গিয়ে টের পেতে হয় পায়ের তলায় মাটি কেবলই কাঁপছে, কাতরতা জাগে, 'কোনো সহযাত্রী গলা / আমাকে উত্তাপ দেয় না কেন ?' যেন কোথাও কোনো আশ্রয়ই নেই—'মা তোমার মুখ কোথায় ধরেছ / সে কি খরার রাত ?' মানতেই হয়, রক্তাক্ত প্রতিবাদের দিনগুলি পেরিয়ে আসার পর এই দেশ জুড়ে নেমে এসেছিল এক বিপুল অন্ধকার, কোনো মায়াবী আলোয় সে অন্ধকারকে এড়ানো যায় নি। কিন্তু আকালের নিশ্চয়তার বদলে এখানে যে জিজ্ঞাসা, সেই জিজ্ঞাসাই বুঝিয়ে দেয়, এই খরাকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না। চারপাশে সমস্ত সাজানো সংসার তাঁর দমবন্ধ করে দেয়, কেননা 'এত নড়াচড়া তবু বুকের মধ্যে থেকে উঠে-আসা শব্দ নেই / অন্ধকার রক্তে কোনো সূর্যের জন্ম নেই।' ('এ কি কোনো নির্জনতা')। খুবই যন্ত্রণাদায়ক এই অভিজ্ঞতা, প্রায় সব সম্বল কেড়ে নিয়ে কেউ যেন নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে, অনেক জেনে, দেখে, চিনে উপলব্ধির যে নিশ্চয়তায় পৌঁছনো গিয়েছিল, তা যেন ধসে যায় একেবারে, মনে হয়, '…কত পথ ভেঙে / আমি এসে গেছি অন্ধকার যে-মাটিতে / মৃত্যু ভর রাখে, মৃত্যু।' ('কি ক'রে আগলাব আমি', 'প্রথম পলি শেষ পাথর')। ফলে ভরসা করার জোরটুকুও যেন হাবিয়ে যায়, যন্ত্রণার মুখ আকাশ ছোঁওয়ার মতো বড় হয়, সোজা বাঁকা সব রেখা ঝলসে যায়, রক্তে ডুবে যায়। এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা যখন বারেবারে উচ্চারণ করেন কবি, তখন তাঁর যন্ত্রণাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঠকের, তাঁর আর্তি অনায়াসেই ছুঁতে পারে আমাদের।

কিন্তু এখানেই কি শেষ ? এই হতাশাকেই চরম মেনে নিয়ে হার মানবেন কবি, মনে করাতে চাইবেন এটাই সার সত্য ? একজন সৎ কবি,

যিনি খুলে রাখতে চান সব দরজা, হতাশা আর বিষণ্ণতা মাঝেমাঝে তাঁর উপর চেপে বসতেই পারে ; কিন্তু কীভাবে তার মোকাবিলা করবেন তিনি, সেটাই তাঁর পরীক্ষা—যা কিনা নিজের সঙ্গেই লড়াই। আর কবির এই লড়াই তো কবিতার মধ্যেই, কবিতা দিয়ে, কবিতাকে নিয়েই। সেজন্যই তাঁকে অনুভব করতে হয় নিজেকে নাড়া দেওয়ার প্রয়োজন ; পাঁজরের আগুন নিয়ে অন্ধকার গুঁড়িয়ে যারা ভোরে পৌঁছতে চায়, মনে হয়, 'আরো বড় অন্ধকারের ভিতরে / আমি যদি তাদের বুকের পাশে বুক রাখতে পারি।' কিন্তু আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণতা নয়, তার জন্য প্রয়োজন হয় নিজেকেও বদলানো। যে প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন তিনি, তা বাইরের বানানো বিশ্বাস ছাড়িয়ে উপলব্ধির সত্য হয়ে উঠেছিল একদিন ঠিকই, কিন্তু সত্য তো কোনো আবদ্ধ জলা নয়, আর স্রোতও বয়ে যায় না সরলরেখায়, অজস্র বাঁক আর কুটিল পথ বেয়ে যেতে হয়, ফলে প্রতিমুহূর্তেই নানা ধাক্কা সামলিয়ে স্থির রাখতে হয় জানা সত্যকেও, উপলব্ধিকে যাচাই করতে হয় নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতায়। বারেবারে প্রত্যয়ের কথা বলে গেলেই হয় না, শব্দের ভাঁড়ার যতই উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে ভরা থাক, একসময় তাদের বর্ণ আলো হারিয়ে যায়, ফলে নষ্ট হয়ে যায় প্রত্যয়ের গাঢ়তা। অথচ কথা দিয়েই তো কবি গেঁথে তোলেন তাঁর জগৎ। সেদিকে তাকিয়ে তাঁকে বুঝতে হয় এক নিষ্ঠুর সত্য—

> আমি কথাগুলোকে সাপ্‌টে ধরতে যাই।…তারা আমার মুঠো ফসকে নেমে দম-দেওয়া চাকায় ঘোরে সেই আগের আওয়াজ। 'তুমি বুঝি আমায় ভালোবাসো না ?' অথবা 'তুমি কি আমাকে ভয় পাও নাকি ভয় দেখাও ?' ভালোবাসা, ভয়, মানে কী ? অথবা 'চলো আমরা ওইখানে পালাই' নয় 'এসো আমরা মরুভূমি বানাই আর বালিতে মুখ গুঁজি' নয় 'ধন্য যন্ত্রণা ধন্য বসুন্ধরা' নয়তো 'সমস্ত কথাবার্তাকে ত্রিশূলে ফুঁড়ে আমরা জয়পতাকা উড়িয়ে দিই কেননা আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছি চুপ।'
>
> 'কথাগুলোকে'

শুধু কিছু বাঁধা গৎ, আর সে-গৎ হয় পালাবার প্ররোচনা দেয়, অথবা জাগায় অলীক জয়ের আশা। কী করে এ থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

আসলে এ তো শব্দের খেলা নয়, এ হল শব্দের পিছনে থেকে-যাওয়া ভাবনার ভ্রান্তি। ভাঙা দরকার তাহলে এই ভ্রান্তিকেই। অরুণ মিত্র সেই বদল ঘটাতে চান, তাঁর প্রিয় ফসলের প্রতীকেই তিনি এই বদলের কথা বলতে চান।

> কেতাদুরস্তি শেষ হোক। তোমার হাতটাকে লাঙল করো মাটি যেমন উলটে দেয় তেমনি ক'রে উলটোও কথাগুলোকে তবেই তাদের উপর থরে থরে চারা জন্মাবে চোখ-ছাপানো ফসল। তখন নবান্ন তখন বসন্ত তখন শান্তি।
>
> 'কথাগুলোকে'

এই নবান্ন, এই বসন্ত তাহলে নতুন করে প্রত্যয়ে পৌঁছনোরই প্রতীক। ঋতু-আবর্তনে যেমন ঘুরে আসে বসন্তের দিন, তেমনি খরা আর আকাল পেরিয়ে তাঁর কবিতা আবার পৌঁছয় বসন্তে বা পৌঁছবার পথ খুঁজে পায়, তখন বলা যায় 'কিছুই স্তব্ধ নয় এই ফের আরম্ভ।' হতাশা থেকে জেগে ওঠেন তিনি, শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল যাসব, অনুভব করেন তার কিছুই হারায় নি, কোনো কিছুই শূন্য হয়ে যায় নি। আর তা যদি না হয়, তাহলে তো মানতেই হয়, ভালোবাসারই মৃত্যু নেই; চারপাশের নৈরাশ্যের মাঝেও যদি নতুন আরম্ভের কথা ভাবা যায়, সে তো জীবনকে ভালোবেসেই সম্ভব। খুব স্পষ্ট করেই তিনি তাই মনে করিয়ে দেন—

> হাওয়ায় সমুদ্রের ছিটজল হাওয়ায় খোড়ো চালের আগুন হাওয়ায় খিদেতেষ্টার টান। ওইখানে প্রেম চূড়ান্ত রক্ত নিয়ে জেগে।
>
> 'ওই তুঙ্গে'

এখন তাই প্রত্যয় আর টাল খায় না। নানা ওলটপালট স্রোতেও তা স্থির থেকে যায়। অথচ তিনি যে স্রোত থেকে দূরে নন, স্রোতের মাঝখানে থেকেই যে তিনি স্থির থাকতে চান তাঁর উপলব্ধিতে, সেটা বোঝা যায় তাঁর কবিতার শরীরে নানা আঁকিবুঁকি টান থেকে। এর দুটো ফল বোঝা যায়। একদিকে সমস্যাটা একটু কম বলেই কবিতা নিয়ে একটু খেলার দিকে লোভ যায়, যার নিদর্শন তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এর 'প্রদর্শনী' অংশের কবিতাগুলি। এ নয় যে তৎসম শব্দের

বদলে এখানে ব্যবহৃত হল প্রচুর পরিমাণে দেশজ শব্দ আর আটপৌরে কথা, আর সেজন্যই তা অন্যরকম। এখানে তিনি ব্যবহার করতে চান এমন একটা ভঙ্গি, যা না হতে পারে যথেষ্ট হালকা আবার না পারে খুব গভীর কোনো অনুভবকে প্রকাশ করতে। 'নাটকীয়', 'শিল্প', 'খেলা', 'এ এক রাজা', 'সাপের পাঁচালি'—এসব রচনায় কেবলই বড় হয়ে ওঠে ভঙ্গি, যেন খুব বড় একটা কথা হচ্ছে এমন ভাবটাই বেশি চোখে পড়ে। কেন এমন হয়? কখনো কখনো কবিরা এরকম করেন বটে, যখন সত্যি তিনি কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না, তখন আশ্রয় নেন প্রকরণের নতুনত্বে বক্তব্যধার্যতায়। সমর সেন যেমন কবিতা ছেড়ে দেবার আগে করেছিলেন। কিন্তু অরুণ মিত্রের যে তা হয় নি, তার প্রমাণ তো এই কাব্যগ্রন্থেরই অন্যত্র আছে। মনে হয়, এক ধরনের পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিলেন তিনি, আর তাতে সাফল্য আসে নি আদৌ।

আরেকটা ব্যাপারও ঘটে। কবিতা এখন হয়ে ওঠে জীবনযাপনেরই একটা বড় লক্ষণ, নিজের সঙ্গে এবং কবিতার সঙ্গে নানা বোঝাপড়া শেষ করে এখন কবিতা অস্তিত্বেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। 'আমি এই মাটি আর মানুষকে বুঝি / অথচ তারা আমার রক্ত থেকে ছিঁড়ে যায় / ···কোন্ বিন্দুতে কখন স্থির হব / ···তার আগে কি অনেক রক্ত ইঁটকাঠের গুঁড়ো দোমড়ানো লোহা ছেঁড়া মাংস?' ('কোন বিন্দুতে কখন')। এখানে জিজ্ঞাসা থাকলেও তা আসলে অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধিতে পৌঁছনোরই পুনর্বাচন। একথা ঠিক যে 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এর বহু কবিতাকেই মনে হতে পারে পুনর্বাচন, এখন যেন বলার কথা একটাই, নানাভাবে শুধু তা বলার চেষ্টা। সেদিক থেকে এই কবিতা-সংকলন হয়ে ওঠে কবির যাত্রা ও পরিণতির চিহ্নবাহী, যেখানে পৌঁছনোর নানা প্রয়াসের কথা তো বটেই, পৌঁছনোর কথাও এর আগেই শোনা হয়ে গেছে। এখনো তাঁর কবিতায় কখনো লেগে থাকে দীর্ঘশ্বাস—'তোমার গন্ধের কিছুই এখানে নেই / না শিশির না বৃষ্টি / চোখের জলও নেই···' ('পাতা উল্টে গেলে'), হয়তো এক বিপর্যস্ত দিনকালের দিকে তাকিয়ে একটু আশঙ্কা জাগে, '···প্রতি নিঃশ্বাসে ভয় পাচ্ছি / এই বুঝি গেল সব ধুয়েমুছে / এই বুঝি গুঁড়োগুঁড়ো হল

হাওয়াপাথরে লেগে' ('এমনই ভঙ্গুরতা')। তবু আবার ফিরে ফিরে আসে ফসলের কথাই—'পোড়া-ছাই ওড়া-ছাইয়ের রাত্তির / বোঁজা-চোখের আকাশ / তার নীচে এলিয়ে থাকে মরা খাল। / স্তব্ধতা। / এই স্তব্ধতায় চুপচাপ কে আসে / ফসল ফলানোর কথা বলে?' ('এই স্তব্ধতায়')।

তাঁর এইসব ভাবনাকেই তিনি যেন সাজিয়ে দেন একটি প্রতিমায়—কামিলা। এই কাব্যগ্রন্থের একটি পর্ব হল 'কামিলার দিনরাত'। কামিলা কে? অবশ্যই তার কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় দিচ্ছেন না কবি; এও ঠিক যে তার ফলে একটু বেশি ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে চায় এই প্রতিমা, পাঠকের পক্ষে একটু যেন দুরধিগম্য। কিন্তু কামিলার প্রসঙ্গাকীর্ণ কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে মনে হয়, কবি যেন কামিলাকে চেনাতে চাইছেন নিজেরই আরেক অস্তিত্ব বলে। আরেক অস্তিত্ব মানে, তা আলাদা কিছু নয়, যেন নিজেকেই ভাগ করে দেখানো। এর আগে তাঁর কবিতায় 'তুমি'কে সম্বোধন করে কথা বলেছেন তিনি, এখানে সে-ধরনটা নেই, তার বদলে যেন একটু নিজের সঙ্গেই কথা বলার মতো তিনি বলেন কামিলার কথা। কী সে কথা? 'আমাকে এত সব চিনিয়েছিল কামিলা: / সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ' ('এত সব চিনিয়েছিল')। তার যাত্রা, তার পথচেনা শুধু আরম্ভের দিনে নয়, 'আমি টের পাচ্ছি ধুলোর শব্দ / রাত্তিরের বুকে উষ্ণ বাতাস, / এবার আমাদের নিশুত যাত্রা / একসঙ্গে / আগুনের শিবিরে' ('একসঙ্গে')। স্পষ্টতই এ তাঁর নিজেরই কথা, নিজেকেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা। এই প্রয়াসেই পাঠকও চিনে নিতে পারেন কবিকে, তাঁর কবিতাকে। সেই কবি, তাঁর কবিতায় ধরে রাখেন এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসকে—ঘটনায় নয়, ইতিহাসের ভিতরে ভিতরে বয়ে যাওয়া জীবনের সঙ্গে যোগাযোগে। তাই এখানে আমরা যেমন পাই এইসব উচ্চারণ—'আমি অগুনতি মানুষের মধ্যে ঘুরছি / আর চব্বিশঘণ্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে / আমার কামিলার তাপ' ('এত সব চিনিয়েছিল'), বা 'উছলে উঠেছিল আমার কামিলা / ···ওর দৃষ্টিতে তখন কচি কচি চারা / এবং ধোঁয়াঘরের ওপর দিয়ে পাখি-ওড়া' ('উছলে উঠেছিল'), তেমনি শুনি, 'আমি টের পাচ্ছি হাড় ভাঙছে কল্‌জে ছিঁড়ছে / আর মেশিনের জোড়দাঁত খুলছে, বন্ধ

হচ্ছে / ঠিক আমার সামনে। / এ হল কামিলার সময় / আমাকে, উপহার দেওয়া আমার নেওয়া' ('কামিলার সময়ের ভিতরে')। এখানে টের পাই এই সময়ের, আমাদের সমকালের, হয়তো কিছুটা অতীতের, আর কিছুটা আগামীদিনেরও, এক ধ্বস্ত চেহারা। রাজনীতির কোনো বিপর্যয় নয়, আমাদের চারপাশের নানা সামাজিক বিকার আর বিপর্যয়ের যন্ত্রণা বেজে ওঠে কামিলার প্রতিমাকে ঘিরে। ফলে যা মনে হচ্ছিল পুনর্বাচন, তাও পেয়ে যায় এক নতুন মাত্রা, সময়েরই অভিজ্ঞতায়। কিন্তু তা হয়ে উঠতে পারত এক আত্মিক মৃত্যুর কবিতা বা মৃত্যুর বন্দনা—তা যে হয় না, সে শুধু কবির প্রত্যয় হার মানে না বলেই। আলো-আঁধারির তামাশায় এক অন্ধ এলাকায় থেকে গেলেও হাওয়া থেকে রস টানা আটকানো যায় না কিছুতেই, আর তিনি জানেন কী ক্রূর এখন সময়. পথের দুধারে খাদ আর হাঁটা কেবল ক্ষুরধার পথে, তবু এই হাঁটার বিরাম নেই। বস্তুত কখনোই তিনি মনে করেন না যাত্রাবিরতির কথা। এই অবিরাম চলিষ্ণুতা তাঁর মানবিক ধর্ম, তাই গড়ে তোলে তাঁর কবিতাকে। ফলে অসংখ্য বদল অসংখ্য বিপর্যয় সত্ত্বেও, তিনি নিজেকে কিছুটা বদলে নিলেও, তাঁর চেনা ভুবন অচেনা হয়ে ওঠে না কখনো, তার পিছনে থেকে-যাওয়া এক অমলিন প্রত্যয়ের আলোয়। আবার যখন তাঁর 'তুমি'র দেখা পাই আমরা, বুঝি কত সহজভাবেই তিনি বলতে পারেন

> তোমার মূর্তি আমি গড়ছি আদ্ধেক গ'ড়ে গুঁড়িয়ে আবার গড়ছি হাড়-ভাঙা রাস্তার মাঝখানে তোমার মূর্তি আমি নগরবাসীরা দেখুক ঘামে পাথরে আমি কী ভাবে আমার পরাজয়কে ছানি ভালোবাসাকে ছানি।
>
> 'তোমার মূর্তি আমি'

পরাজয় আর ভালোবাসা—দুটোই তিনি মেনে নেন, কেননা আপ্তবাক্য অস্বীকার করে তিনি আধখানা জীবনকে জানতে চান না।

এটাই তাঁর সবথেকে-বড় পরিচয়। আধখানা নয়, পুরো জীবন আর পুরো মানুষের কথাই তিনি জানতে চান, বলতে চান। সেই পুরো মানুষ কখনো মৃত্যুতে অবসিত, কখনো বা জয়ে উদ্ভাসিত। তাঁর কবিতা, তিনি জানিয়ে দেন, তৈরি করতে 'দিন যায় রাত যায় বিন্দু বিন্দু রক্ত যায়'। মনে

হতে পারে, সেই যে কোনো কোনো কবি একদা বোঝাতে চেয়েছিলেন, শুধু কবিতার জন্যই জীবন, কবিতার জন্যই বেঁচে থাকা, এও যেন তেমনি কিছু। আসলে তা নয়। কবিতাকে শিল্পকে জীবনের থেকে বড় করে তোলার কথা তিনি ভাবেন না—জীবনের জন্যই তাঁর কবিতা। কবিতাকে জীবনের যোগ্য করে তোলার জন্যই তাঁর যত শ্রম আর সাধনা। তাই তাঁকে জানতেই হয়, কবিতা কেমন হয়ে উঠল: 'একবার পরে দেখতে পারো / কোথায় তা ঠিক্‌রোয় আলো, প্রসাধনে, / না তোমার হৃৎপিণ্ডে? হাজারটা কোণ / চামড়াকে আদর করে, না রক্তাক্ত পথ ধ'রে / হাড়ে বেঁধে?...' ('অলঙ্কার')—এ যেন আরেকরকমের যাচাই। নিজের সঙ্গে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নানা বোঝাপড়া করতে করতে যে কবিতাকে তিনি তৈরি করছিলেন, সেই কবিতা মিলল কিনা জীবনের সঙ্গে, এবারে তাই যাচাই করে নিতে চান। কবিতা ও জীবনের এই যোগাযোগই তো সব-থেকে বেশি আকাঙ্ক্ষিত একজন কবির কাছে।

অরুণ মিত্র একদা সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, পরে তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর কবিতায় নেই সুভাষ বা সুকান্তর উচ্চকিত অঙ্গীকার, খুব নিচু স্বরেই কথা বলতে ভালোবাসেন তিনি, কিন্তু তার মধ্যে থেকে যায় একটা বড় আশ্বাসের টান। তাঁর একেবারে সাম্প্রতিকতম কবিতাতেও মাঝে মাঝে শোনা যায়: 'ভরা যুবতী ভেঙে পড়েছে / থ্যাঁতলানো স্বপ্নের গাদায়' বা 'তবে কি ভোরের পথ / কাঁটাবনের বুকে?' বা 'আমাদের পাঁজরার হাড় ঘুণে খাওয়া / আমরা টেরও পাই নি আমাদের হাত / হন্তারক হবে বলে উঠে আছে' যে-সব উচ্চারণকে মনে হয় নৈরাশ্যের ছোঁয়া-লাগা। তবু তা নিতান্তই সাময়িক প্রতিক্রিয়া। আর এসব উচ্চারণে বোঝা যায়, কবির যন্ত্রণা আর রক্ত-ক্ষরণ। সে-যন্ত্রণা কেন, কেন তাঁর রক্ত ঝরে? আসলে এ-রক্তক্ষরণও আসে ভালোবাসা থেকেই। জীবনকে মানুষকে অনেকটাই জড়িয়ে নেন বলেই তাঁর বিকার আর অপচয়ে এতটা নাড়া খান তিনি। অরুণ মিত্র যে ছন্দকে বেছে নিয়েছিলেন, সমর সেনের বিপরীতেই—তার আটপৌরে ঘরোয়া চালের সঙ্গেই মিশে যায় এক স্বপ্নচারিতা, রোম্যান্টিক আকুলতা,

'লিপিকা'র গদ্যের মতোই। এই রোম্যান্টিকতা ভালোবাসারই। প্রেমিক প্রেমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে যখন অনর্গল বলে যায় প্রেমের কথা, তার যাবতীয় শব্দ দৈনন্দিন জীবন থেকেই তুলে আনা হলেও তাতে লেগে যায় অন্য এক স্পর্শ, পারিপার্শ্বিকের সব দায়কে মেনে নিয়েও এক স্বপ্নের সম্ভাবনা—অরুণ মিত্রের কবিতায় সেই স্পর্শ টের পাওয়া যায়। 'আমি যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়েছি / সেখানে শিকড়ের উসখুস, / ···আর ফিসফিস : ডানা ডানা'—হিমেনেথের প্রতিধ্বনি নয়, নিজের মতো করেই অরুণ মিত্র মেলান শিকড় আর ডানাকে। মানুষকে জড়িয়ে জীবন, জীবনকে জড়িয়ে ভালোবাসা—তাঁর কবিতার শিকড় এই জীবনে, তাঁর কবিতায় সেই ভালোবাসার ডানা মেলা। মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি, সে-যোগাযোগ রইল কিনা বা তত্ত্ব কতটা এল তাঁর কবিতায়, এর চেয়েও বড় কথা হল তাঁর কবিতায় জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ।

শুভ বসু

—

কামিলার খোঁজে

দোষ বা গুণ যা-ই বলা হোক না কেন, কবিদের একটা ব্যাপার নিয়ে পাঠকমহলে সপ্রশ্রয় কৌতুকের শেষ নেই। প্রিয়তমা বা মানসীদের নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করেন তাঁরা। খুব রক্ষণশীল পাঠকও তাতে যে খুব চটেন, তা নয়। ভাবখানা 'কবি তো,—ও এমন একটু হবেই।'

কিন্তু সব সময় ব্যাপারটা এমন স্নিগ্ধ কৌতুকে শেষ হয় না মোটেই। কখনো কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখে এইসমস্ত নারীচরিত্র পাঠকদের রীতিমতো ধন্দে ফেলে দেয়। সবাই যে এমন করেন তা অবশ্য নয়। 'প্রিয় লিলি! চিঠির বদলে' কবিতায় মায়াকোভ্স্কি যখন বলেন :

কাল ভুলে যাবে নিশ্চিত
আমিই তোমাকে মুকুট পরিয়েছিলাম,
...
আমার সমস্ত শব্দ
যারা আজ বিশুষ্ক পাতাই,
পারবে স্পন্দমান অধীর হৃদয়ে
তোমাকে আটকে রাখতে?

হায় রে
এই যে আমার শেষ প্রহরের মাধুরী
হোক তা গালচে
তোমার বিদায়-লগ্নের পদপাতে।

তখন পাঠকদের যেমন লিলিকে তেমনি তার সঙ্গে কবির সম্পর্ক বা তার প্রতি কবির আবেগের স্বরূপকেও চিনতে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ আলম্বন আর উদ্দীপন বিভাবের স্পষ্ট আদল পেয়ে পাঠক দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারেন 'বোঝা গেল'।

এমন স্পষ্টতার উদাহরণ অবশ্য আরো অনেকই পাওয়া যাবে এমনকী ঘোর দুর্বোধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত আমাদের এই বিশ শতকের কবিতাতে। 'এলসা'র কথাই ধরা যাক, আরাগঁ-র এলসা। বা নেরুদা-র মাটিলডে। সেসব ক্ষেত্রে মহিলা দুজনের মোটামুটি চেহারা আর সেইসঙ্গে তাঁদের কবিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, ও কাব্যধৃত আবেগের জাতিচরিত্র বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু এমন উল্লেখ বা এমন সম্বোধন কবিতার ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যাবে. যা নিয়ে পাঠকের মনে ধন্দ লাগার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী'র কথাই মনে আসতে পারে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—

তখন এ বিদেশিনী এবং আমাদের সেই খুব চেনা গানটির

আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।

সেই বিদেশিনী, আর জীবনের শেষপর্বে ১৯২৪ সালে যে বিদেশিনীকে শুধুমাত্র 'নারী' সম্বোধন করে বলছেন : 'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী' এ তিনজনই বিদেশিনী হলেও নিশ্চয় এক নন। এ তিনের শনাক্তীকরণে পাঠক একটু বিহ্বল বোধ করলেও তাকে মনে রাখতেই হবে যে, কবিকে পুরোপুরি বুঝে ওঠার দিক থেকে ব্যাপারটা জরুরি।

রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই আমাদের কবিতার যে একেলে সাবালক পর্ব শুরু হল, সেখানে এমন রহস্যময়ীদের আনাগোনা প্রত্যাশিতভাবেই যে একটু বেড়ে যাবে তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, মৃণালিনী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত স্বর্ণকেশিনী, বিষ্ণু দে-র

'ক্রেসিডা'র চরিত্র-পরিচয়ে কিছু রহস্য যদি উদ্ধারাতীত থেকেও যায়, তবু সম্ভবত কঠিন নয় তাঁদের সঙ্গে সেইসব কবির সম্পর্কের ধ্যায়টিকে অনুমান করতে পারা।

ধরা যাক বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা'র কথাই। সেই যে বলা হল :

সোনালি হাসির ঝর্না তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল ?

তা নিশ্চয় বলা হল অন্যের জবানিতে, 'মনোলগ'-এর আঙ্গিকে, তবুও তার ভিতর দিয়ে সম্বোধক-সম্বোধিত সম্পর্কটি অস্পষ্ট রইল না। ফলে, ক্রেসিডার যে রহস্যময়তা বা সুদূরতা, তা নিহিত রইল কেবলমাত্র তার গ্রীসীয় পৌরাণিকতায়।

কিন্তু আরেকরকম কৃটও আছে, যার কথা খেয়াল রাখলে আমাদের এই সন্ধান একটু সহজ হতেও পারে। কোথাও কোথাও স্ত্রীলিঙ্গবাচক সম্বোধন-মারফৎ এমন চরিত্র উপস্থাপন করা হয় যাকে তার সেই সম্বোধন, বা সেই সেই সম্বোধনসূত্রে বর্ণিত বাচ্যের ভিতর থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সবারই অত্যন্ত পরিচিত একটি উদাহরণ নেয়া যাক :

মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন অনাদি কাহিনী
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর ?

'অন্তর্যামী', 'চিত্রা'

এই উচ্চারণের ভিতর উদ্দিষ্টের যে ছবি মনে ভেসে উঠতে পারে, আমরা জানি, শুধু সেটুকুরই ভিতরে সম্পূর্ণ হবে না তার স্বরূপকে চেনা।

এভাবেই, কবিতার জগৎ সংরক্ত হয়ে ওঠে কখনো স্পষ্ট আদলের আবার কখনো রহস্যময়ী নানা চরিত্রের উল্লেখে ও বর্ণনায়।

কিন্তু এসব সাত-সতেরো যে কারণে ফাঁদা হল, এবার সেদিকে ফেরা যাক। আমরা খুঁজতে চাইছি অরুণ মিত্রের কবিতার 'কামিলা'কে। কিন্তু তার আগে দেখা যাক যিনি এই কবিতাটির স্রষ্টা, ইতিপূর্বে তাঁর কাছে এমন কোনো চরিত্রের সন্ধান পেয়েছি কিনা, বা পেলে কতবার কীভাবে পেয়েছি, যাকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কারণ থেকে যায়।

তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে যাঁরা তাঁকে বেশ ভালোভাবে চিনতে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় মানবেন যে, সহজে এসব রহস্যময়ীর জগতে পৌঁছবার ধরনই ছিল না তাঁর। নারী আর প্রেমের অজস্র আভাস ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতা জুড়ে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে বিষয়ী ও বিষয়ের, সম্বোধক ও উদ্দিষ্টের সম্পর্ক সহজ ও স্পষ্ট। তা ছাড়া, নির্দিষ্ট নামোল্লেখে আলাদা কোনো চরিত্রের আদলও দেওয়া হয় নি সেসব কবিতার 'তুমি' বা 'সে'-কে।

অবশ্য যথেষ্ট পরিণত বয়সে এমন একটি চরিত্রকে আমরা তাঁর কবিতায় আদল পেতে দেখি। অরুণ মিত্রের কবিতায় আজকের যে-কোনো পাঠকেরই পরিচিত সেই চরিত্র—'বুলা'। তার উল্লেখের পরিচয় 'শুধু রাতের শব্দ নয়' কাব্যগ্রন্থ থেকে এখানে নেয়া যাক।

ক. যখন কালকের সূর্য উঠবে কলকাতা
দ্বীপের ইশারা-লাগা সোনার রোদ্দুরে
ইস্কুলের ফিরতি পথে হৈ হৈ বাড়ি
আশ্চর্য হবার গল্প
সব গলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুলার চিৎকারে
খুশির হাজার লক্ষ ঢেউ।

'লক্ষ লক্ষ শিশু'

খ. দুরন্ত স্রোতে আমার পা
ঘাসমাটিপাথর হুড়মুড়িয়ে
ঘরবাড়ি টলতে টলতে
আমাকে মাঝখানে নিয়ে দুরন্ত,

লক্ষ মুখ বিস্ফোরণের আভায়
আর, কি ওই আহা আগমনীর গান,
কোন্ আশ্বিনের সূর্য
বুলার ছোট্ট মুঠোয় ধরা,
আমি পৌঁছলাম
আমার কেন্দ্রে বাংলায় আমার বাংলাদেশে।

'বদলটা অন্ধকারে হয়'

গ. আমরা হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে এসেছি? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ওই তারা এখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।

'গর্জনের সামনে'

বুলার এমনিসব উল্লেখ আরো অজস্র রয়েছে তাঁর পরিণততর পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলিতে। কিন্তু বুলা তাঁর নাতনির নাম, এই ব্যক্তিগত সংবাদটি যাঁরা জানেনও না, তাঁরাও বুঝতে পারেন যে, তার সঙ্গে জড়িয়ে নেই সেইসব অনুষঙ্গ, আগের আলোচনা আর উল্লেখগুলিতে আমরা যার ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট একটি দিকে এগতে চাইছি।

কারো কারো চুল যত পাকে, তারুণ্য ততই ঝলমলায়। সেই আনন্দে এই মাঝ-সত্তরে মাত্র দশটি কবিতায় কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন 'কামিলা'। তার আগে-পরে এ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ কবি। অতএব পাঠক হিশেবে আবার আমাদের মহা ধন্দে পড়া।

ব্যাপার কী? কে এই কামিলা?

ছিয়াশির বইমেলায় বেরুল অরুণ মিত্রের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'। তার একটি আস্ত কিন্তু ছোট্ট অংশের নাম : 'কামিলার দিনরাত'। এখানেই মাত্র দশ পৃষ্ঠায় দশটি কবিতায় কামিলা সম্পর্কে আমাদের যত কিছু জানা। আর সেই থেকেই আমাদের মতো পাঠকের অদম্য কৌতূহল। হবেই বা না কেন? কবি স্পষ্টই কবুল করছেন :

আমি ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছি
আমার কামিলার রাত্তিরে।

'ওই কোন্ নক্ষত্রের'

বলছেন :

আমি আগাপাস্তলা গুঁড়োর মধ্যে
কোনো পালক দেখতে পাচ্ছি না পাতাও না
কাছ থেকে নাকি দূর থেকে আমি ডেকেই চলেছি :
কা—মি—লা

'উছলে উঠেছিল'

আবার :

আমি অগুন্তি মানুষের মধ্যে ঘুরছি
আর চব্বিশ ঘণ্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে
আমার কামিলার তাপ।

'এত সব চিনিয়েছিল'

এতখানিই গভীর সম্পর্ক কবির সঙ্গে কামিলার। অথচ কাণ্ড, এর কথা আগে কোথাও বলেন নি কবি। মাত্র দশটা কবিতার ভিতর যা বলবার বলেছেন। কিন্তু তাতেও জানিয়ে দিয়েছেন কবির প্রায় দ্বিতীয় সত্তার গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত এই কামিলা। তাকে না চিনলে হয়তো কবিকে চেনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কামিলার প্রতি কবির আকর্ষণের খানিকটা আঁচ আমরা পেয়েছি। তা খুব তীব্র বলেই কবি কবুল করেন 'সারা জীবন আমি ছোট ছোট কথা বলেছি। এবং তা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি কামিলার আকাশ।' ('আবার কথা খুঁজতে হবে')।

অবশ্য মনে রাখা ভালো, কবিতাগুলির ভিতর এমন কিছু নেই যাতে বলা চলে কামিলার সঙ্গে কবির দহরম-মহরম এখনো বর্তমান। আসলে কবির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ দেখাশোনার যেটুকু বিবরণ রয়েছে তার সবটাই অতীতকালে বিধৃত। এখন যা রয়েছে তাকে বলা চলে স্মৃতি, কিন্তু এত গভীর আর এত অর্থময়, কবিতাকটি পড়তে পড়তে এ অনুভবকে পাশ কাটানো যায় না যে, কবির অস্তিত্বের বর্তমানেও কামিলার ভূমিকা অনেকটাই

নিয়ন্ত্রকের। সে যা কিছু দেখিয়েছিল বা চিনিয়েছিল তার রেশ কবির মনে শুধু লেগেই থাকে না, বহুদূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে তাঁর আজকের জিজ্ঞাসা পিপাসা আর দিনযাপনকে।

অতএব মাত্র দশটি ক্ষুদ্রাকার কবিতার ভিতর কবি ধরে দিয়েছেন কামিলার সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্কের স্বরূপ এবং কামিলার স্মৃতির টানে নিয়ন্ত্রিত বর্তমানের যন্ত্রণা। এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিশ্চয় সম্ভব নয় এ-দুইকেই স্পষ্ট বাচ্যের অনুপুঙ্খে ধরা, যাতে আমরা একেবারে দুই-এ দুই-এ চারের মতো মিলিয়ে মিলিয়ে বলতে পারব, এই হল ওই। কিন্তু আভাসগুলোর ভিতর দিয়ে খুব সাবধানে সন্তর্পণে চললে খানিকটা চিনে নেয়া বোধহয় অসম্ভব হবে না।

তাহলে, অন্তত যতটা পারা যায়, কবির সঙ্গে কামিলার অতীত সম্পর্কের চেহারাটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। পরে তার সঙ্গে মিলিয়ে বর্তমানকে চেনা যাবে।

ক. দিনরাতের মাথামুণ্ডু নেই
তাদের কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মানে হয় না—
আমাকে বলেছিল কামিলা
এবং আমি সায় দিয়েছিলাম।

'জানি না কত কাছে'

খ. কিন্তু ও কি ওপরের দিকে তাকিয়েছিল কখনো ?
হয়তো না। ও এমনই প্রতিশ্রুত ছিল নীচে,
এত পাথর ভাঙবার ছিল
এত জল বইবার ছিল
এত বীজ বোনবার ছিল
আর ছিল খুনীদের হাতে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া
সেকেণ্ড থেকে সেকেণ্ডে এক ধকধক থেকে আরেক ধকধকে।

'আবার কথা খুঁজতে হবে'

গ. আমাকে এত সব চিনিয়েছিল কামিলা :
সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ

ইস্পাতফলায় সুফলা মাটি আর মৃত্যু,
কিন্তু আমাকে ও দেখায় নি ছায়াদীঘি
চিকণ জলে মুখ দেখবার আয়না।

'এত সব চিনিয়েছিল'

ঘ. কামিলা তো আমাকে দেখিয়েছিল সবুজ পাতা
বুক পেতে শুনিয়েছিল ঝর্নার হাজার ধারা।

'ফটিকজল চিৎকারে'

এসবের ভিতর যেন খানিকটা আভাস পাওয়া যায় কামিলার। প্রতিটি কবিতায় এমন আভাসটুকুমাত্র দিয়ে কবি দ্রুত চলে আসেন বর্তমান আত্ম-জিজ্ঞাসার ভিতর। কিন্তু এ কি কোনো নায়িকার চেহারা হল? সবুজ পাতা বা ঝর্নার হাজার ধারা দেখানো পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এ কেমন নায়িকা যে চেনায় 'সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ / ইস্পাতফলায় সুফলা মাটি আর মৃত্যু', যার 'ছিল খুনীদের হাতে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া / সেকেণ্ডে এক ধকধক থেকে আরেক ধকধকে।'

তাছাড়া, কামিলা যে নারী-ই তার প্রমাণটুকুই-বা কই? এমনকী নামটাও কেমন বেখাপ্পা বেমানান। যে কবির সবটাই না কি ফরাসি অনুষঙ্গে জড়ানো, তাঁর হৃদয়েশ্বরী হবার পক্ষে এ কি কোনো যোগ্য নাম?

ঠিক, এভাবে কেউ বললে সরাসরি উড়িয়ে দেয়া যাবে না। তবে কামিলা যে নারী, সে-অনুমানের রসদ হয়তো আছে নীচের লাইনগুলিতে:

কামিলা হাঁটছিল
আহারে কী ছন্দ ছিল!
কেউ শিষ দিয়ে ছুঁড়ল বাহবা
কেউ নাচের মজায় জিব চুষল।
ওর সারা শরীরে জখম-নড়া ঢেউ
আসছে যাচ্ছে আহা রে কী ছন্দ
আর মাথায় কোমরে থরে থরে ভার
ত্রিভঙ্গে উঠছে নামছে আহা রে কী ছন্দ।

'কামিলা হাঁটছিল'

তবে 'কামিলা' নামটা সত্যিই কোনো কবির হৃদয়েশ্বরীর অনুষঙ্গ সেভাবে আনে না। তবু হয়তো এই নাম থেকে শুরু করলেই আমরা তাকে এবং সেইসঙ্গে কবিকেও চেনার দিকে নির্ভুল এগতে পারব।

'কা—মি—লা' কবির এই ডাক কি বনলতা, অরুণিমা, মৃণালিনীর মতো কোনো নারীর উদ্দেশে? বাচ্যার্থ কী সেই নামের? যদি সেখান থেকে কোনো সূত্র বেরিয়ে আসে! একটু লাভও হবে না তা নয়। কেননা অভিধানে 'কামিল' অর্থ পাচ্ছি কর্মনিপুণ। তার স্ত্রীলিঙ্গে কামিলা। অতএব, ভাবাও যায় যে 'কামিলা' স্বভাবতই থাকেন কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে। অবশ্য, এভাবে ঠিক কোথাও পৌঁছনো যাবে, এতখানি নির্দিষ্টতার আশঙ্কা অরুণ মিত্রের ক্ষেত্রে অমূলক। এর চেয়ে অনেক বেশি কাম্য অনুষঙ্গের দিকে লক্ষ রাখা। সেদিক দিয়ে খুব খেয়াল করে দেখলে অনুভব করা যায় কবি-কামিলার সম্পর্কের ভিতর এমন কিছু নেই যা নির্দিষ্টভাবে পুরুষ-নারী সম্পর্কের অনুষঙ্গ রচনা করে। এই যে কামিলা, যাকে দেখবার জন্য আজও পথ হাতড়াচ্ছেন কবি, 'ইটকাঠ-মাঠঘাটের ডামাডোলে এক রক্ত-পথ', সে যেসব ছড়িয়ে রেখে যায়, সে-সমস্তের চিহ্ন ধরে খুব সন্তর্পণে এগতে থাকলে তার একটি মোটামুটি আদলের শনাক্তীকরণ হয়তো সম্ভব হতে পারে সময়স্রোতের নাতি-অতীত একটি বাঁকে, স্রোতেরই টানে কবি যাকে ছাড়িয়ে এসেছেন এবং আজ অনেক দূরে পৌঁছেও বুঝতে পারছেন তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে সময়ের এক নির্দিষ্ট বাঁকের সারাৎসারের সঙ্গে শনাক্তীকরণযোগ্য সেই অমোঘ প্রতিমা কামিলা—তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। তাই, প্রায় দ্বিধাহীন তাঁর এই উচ্চারণ : 'একটা গোটা মানুষ এই কামিলা এই আমি।'

শুরুতেই দেখি, কবি অপেক্ষা করে আছেন, কারণ 'কামিলা ঘরের মধ্যে নেই / সেই কখন অদৃশ্য হয়েছে কারখানার বাঁকে' অথচ 'কামিলা রাত্তিরে' কবির এই 'ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে থাকা' যে প্রত্যাশাহীন নয় তার প্রমাণ রয়েছে এমন চিত্রকল্পে—'উলটে আছে মরাই তবু তার ছড়ানো দানাগুলো / যেন জোনাকি হয়ে জ্বলছে!' আর, উলটে থাকা মরাইকেও যে এভাবে দেখতে পারা, তা সম্ভব হতে পারে কোন্ দাক্ষিণ্যে? কামিলারই নিশ্চয়! কারণ

ও নিশ্চয় জানত একলা ওর কোথাও যাবার নেই
আমারও নেই
ও নিশ্চয় জানত সময় দাগা রয়েছে ওর মুখে
আমারও মুখে,
একলা নয় একলা নয়।

'এত সব চিনিয়েছিল'

এ পর্যন্ত যেটুকু চেনা তার বেশি বিশদ করে কবি চেনান নি কামিলাকে। শুধু জানি তার সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ ঘটে গেছে বহুকাল : 'ঘূর্ণিহাওয়ার পাকে মিলিয়ে যেতে যেতে / ও হাত নেড়েছিল ছুটিতে হাওয়াবদলে যাওয়ার মতো, / আর ওকে দেখা গেল না, ('ফটিকজল চিৎকারে'),'...অগুনতি মানুষের মধ্যে ও মিলিয়ে গেল' ('এতসব চিনিয়েছিল'), 'সেই মুখের আদলটা বারুদের গন্ধে জড়িয়ে আছে' ('উছলে উঠেছিল')। আর তাই কবির এ প্রায় নিরুপায় স্বীকারোক্তি : 'আমাকে এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে, / কিন্তু কোথায়, কবে পর্যন্ত ?' ('কামিলার সময়ের ভিতরে')।

কিন্তু কবির অস্তিত্বের স্মৃতি-সত্তায় যে কামিলার ভূমিকা এতখানিই, তার স্বরূপ কী ? কবি আভাস দিয়ে আমাদের কৌতূহলকে তীক্ষ্ণ করে তুললেন যতটা, তার সামান্যাংশও আমাদের সাহায্য করলেন না। অতএব এমন ক্ষেত্রে পাঠককে অনুমাননির্ভর হতে হলে সেটা খুব অনৈতিক হবে না। তাছাড়া আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ যেসব বহু কবিতার কর্তৃত্ব অনেকখানিই চলে যায় কূটাভাসের হাতে, সেসব ক্ষেত্রে অনুমানকে ভার্জিল-জ্ঞান করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না অমৃতসন্ধানীর।

তাকে অনুসরণ করে চিত্রকল্প আর অনুষঙ্গগুলির চিহ্ন ধীরে-ধীরে এগতে থাকলে আমরা কি পৌঁছে যাব না আমাদের ইতিহাসের চল্লিশের দশকের দিনগুলোতে, আজকের পরিণত তরুণ কবির যখন উদ্দাম তারুণ্য ? তথ্য-পঞ্জির উল্লেখ ছাড়াই পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়বে কীভাবে চল্লিশের দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংঘাতমুখরতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল আমাদের এখানকারও জীবন। মনে পড়বে, সাম্রাজ্যবাদী সংকটের লগ্নে এদেশে একদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের তীব্রতা ও অন্যদিকে সাম্য-বাদী মতাদর্শের সূত্রে জনজীবনে নানা আন্দোলনের জোয়ারের কথা।

নিশ্চয় মনে পড়বে প্রগতি-লেখকসঙ্ঘ ও গণনাট্য-আন্দোলনের কথা, যা ছিল ভূমিকম্প আর ঝঞ্ঝায় টালমাটাল আমাদের তৎকালীন জন-জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার সাংস্কৃতিক প্রকাশ। আর, নিশ্চয় এও মনে পড়বে যে, অরুণ মিত্র ছিলেন সেইসব শিল্প-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কুশীলবদের একজন। তাই এমনকী আজও সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বহু প্রবীণ মানুষকেই দেখি অরুণ মিত্রের কথা উঠলে প্রবল সংরাগে 'একটি নিবেদন', 'লাল ইস্তাহার' বা 'কসাকের ডাক: ১৯৪২'-এর থেকে অনায়াসে পঙ্‌ক্তির পরে পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে পারেন। সে-সময়কার আকাঙ্ক্ষিত ভাষা হিশেবে এতটাই সার্থকতা লাভ করেছিল এসব স্তবক :

প্রাচীরপত্রে পড়ো নি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ—
ভোঁতা হ'য়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।

'লাল ইস্তাহার'

বস্তুত চল্লিশের দশকের সেই দিনগুলি ওই প্রজন্মের বিবেকবান মানুষ-দের একটা উল্লেখযোগ্য রকমের বড় অংশের অস্তিত্বের প্রশ্নে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা রেখে গেছে। স্বপ্ন, কল্পনা আর বাস্তবের টানাপোড়েনের ভিতর যেন জীবনের একটি প্রতিমার সঙ্গে তাঁদের মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রথম মিলনের সেই তীব্রতা ফিকে হয়ে এসেছে, সময়-স্রোত কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সেই প্রতিমাটিকে। কিন্তু সেই প্রজন্মের এ ধরনের যেসমস্ত মানুষের দেখা আমরা আজও পাই, তাঁদের ভিতর দেখি সেই প্রতিমার স্মৃতি মর্মান্তিকভাবে ক্রিয়াশীল। তাই হয়তো বিরামের বয়সে পৌঁছেও সময়স্রোতের দিক থেকে নিজের জিজ্ঞাসাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন না তাঁরা, পারেন না জড়ের স্বস্তি মেনে প্রত্যাশাকে ভুলতে। যেন সময় একটু অনুকূল হলেই তাঁরা আবার সেই প্রতিমাটিকে ফিরে পাবেন

আর তাকে চুমু খেয়ে সার্থক করতে পারবেন তাঁদের এতকালের গোপন প্রত্যাশাকে।

কিন্তু, শুধু অনুমাননির্ভরতাই বা কেন? তাঁর নাতি-পুরনো কবিতার ভিতরে বোধহয় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না আমাদের ওই অনুমানের সারবত্তার প্রমাণ। সত্তরের দশকে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'শুধু রাতের শব্দ নয়' থেকেই এমন একটি প্রয়োজনীয় উদাহরণ থেকে এর সন্ধান করা যাক। চল্লিশের দশকের সেইসব দামাল দিনগুলোর থেকে বহুদূরে চলে এসেছেন তখন তিনি। সেইসব দিন তখন স্মৃতির বিষয়। কিন্তু কী অর্থময় সেই স্মৃতি, কত সত্তাময় তার রেশ কবির তৎকালীন অস্তিত্বে, তার সুন্দর একটি দলিল যেন ধরা রয়েছে 'গভীর শহরে' কবিতাটিতে।

কবিতাটির শুরুই হয়েছে তৎকালীন বর্তমানের বিশ্লেষণে। অনাটকীয় বিশ্লেষণে তার যে ছবি আমরা দেখি তা এরকম : 'বাড়িগুলোর গায়ে নাম-ঠিকানা একাকার, / জলে ভিজতে ভিজতে বা দিনদুপুরে পুড়তে পুড়তে / তাদের ধাঁধা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, / কড়া নাড়লেই শব্দটা পাথরে লেগে ফিরে আসে, / মানুষের সম্পর্কিত রক্তে হাড়ে / কোনো পরিচয় স্থির হয় না / গেলাস পেলেট চাম্‌চের বাজনা।' এমন ক্ষেত্রে যা হওয়ার কথা, তা-ই হয়। 'অতএব সারাক্ষণ একই রকম চলা / হাতড়ে হাতড়ে : কই, মুখের আলো কই?'

এমন রুদ্ধনিঃশ্বাসের গোলকধাঁধায় তাই 'ফ্ল্যাশ ব্যাকে' চলে যান কবি :

> কাছেই এক নদী রয়েছে বহতা স্মৃতি :
> পলিমাটি বীজ বোনার ঋতু
> নৌকো ঘোরানো দুর্ধর্ব বাতাসের সামনে,
> বহতা স্মৃতি :
> এক পাড় ভাঙে তো অন্য পাড় গড়ে ;
> হোই তুমি কোথায় আছো ?
> এই যে এখানে—
> সাবাস তুমিও পৌঁছলে।

চত্রের শিকড়ে শিকড়ে রোদ নামে বৃষ্টি নামে
রক্তের অলিগলি বেয়ে নামে,
বুকের পাটা জুড়ে ভবিষ্যৎ সবুজে ঘনিষ্ঠ স্বর্ণে।
কোন্ সে রোদ ক্ষেত মুড়ত সোনায়
এবং অন্ধকারে সবুজ জ্বলত : এগোও।
হোই তুমি কোথায় আছো ?
এই যে এখানে—
হ্যাঁ, তুমি আমার হৃৎপিণ্ডের দামামায়।
উতরোল ঘণ্টাগুলো দিগন্তে দিগন্তে পুরো দোলে,
এক পথ পার হ'য়ে আর এক পথ : এগোও।

এভাবে, দুটি স্তবক জুড়ে তাঁর স্মৃতিমগ্নতায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে আমাদের ইতিহাসের পূর্বোল্লিখিত নির্দিষ্ট কালপর্ব, কবির জীবনের সেই অতীত যা তাঁর অস্তিত্বে স্থায়ী অভিজ্ঞান রেখে গেছে। তাঁর প্রজন্মের মানুষজনের যে মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে যেন তারই চিহ্ন ধরা রইল প্রতিমায়িত ভাষায়। তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য মানুষদেরই মতো, বা এমনকী আমাদেরও প্রজন্মের মানুষদের মতো তাঁরও মোহহীন বর্তমানের যন্ত্রণা তীব্র—'এগোনো নয়, এখন বাড়িঘর গোলকধাঁধা, / এধারে ওধারে কাঁটাতারের নিয়মকানুন : খবরদার কে যায় ?'

তাহলে এভাবে, এবং আরো সব উদাহরণের ভিতর দিয়ে যদি এগোই, তাহলে নিশ্চয় এ অনুমান আর কেবল ভিত্তিহীন অনুমানমাত্র থাকে না যে, তাঁদের প্রজন্মের যে কালপ্রতিমাটির কথা বলা হয়েছে এর আগে, তার অস্তিত্ব বাস্তব ছিল অরুণ মিত্রেরও জীবনে এবং তা-ই তাঁর জীবনের শেষ-পর্বে শিল্পোত্তীর্ণ এক চরিত্ররূপ লাভ করল 'কামিলা'র ভিতর। কবির সঙ্গে কামিলার সম্পর্কের যেটুকু বিবরণ আমরা পেয়েছি 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এর 'কামিলা'-পর্বে, তার প্রকৃতি একটু খোলা চোখে ও কল্পনার সহায়তা নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, প্রাগুক্ত স্তবকদ্বয়ে বর্ণিত প্রতিমার সঙ্গে গুণগত-ভাবে তা এক।

সে যে স্বরূপে কবির দ্বিতীয় সত্তার মর্যাদা পেতে পারে, আমাদের সে-

অনুমানের সমর্থনে তিনি নিজেই তো ঘোষণা করেন এখানে — 'একটা গোটা মানুষ এই কামিলা এই আমি।' ('জানি না কত কাছে')।

তবু সংশয় উঠতে পারে এভাবে যে, খুব নিশ্চিত করে চেনা গেল কি কামিলাকে? তার উত্তর এই: খুব নিশ্চিত চেনার প্রশ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে আসেই বা কী করে? যতটা আভাস পাওয়া গেল, অনুষঙ্গমালার সূত্র ধরে যতটা অনুমান করা গেল, তার ভিত্তিতে তো এভাবেই কামিলাকে খানিকটা চেনা যায়। খানিকটা বোঝা যায় তাকে, যে 'প্রতিশ্রুত ছিল নীচে', যার 'পাথর ভাঙবার ছিল,' 'জল বইবার ছিল', 'বীজ বোনবার ছিল / আর ছিল খুনীদের হাতে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া / সেকেণ্ড থেকে সেকেণ্ডে এক ধকধক থেকে আরেক ধকধকে।'

তাকে আরও খানিকটা চেনা যায় তার স্মৃতির নিয়ন্ত্রণে কবির বর্তমান আত্মজিজ্ঞাসার ধরনটিকে অনুধাবন করলে। আগেই বলা হয়েছে যে, জীবনের সেই প্রতিমাটির স্পর্শ যারা পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি সময়ের অগ্নিস্রাবী নিঃশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্ভাঁজ স্বস্তির কিংখাবে মুখ গোঁজা। তাই এসব থেকেও আমরা পেয়ে যেতে পারি কামিলার পরিচয়:

ক. আমার পায়ের তলায় কামিলার মাটি
সেখানে রাবণের চিতা জ্বলছে।

আমাকে আবার কথা খুঁজতে হবে
এমন কথা যা ঝোড়ো হাওয়ায় ঘুরবে
অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে
আর আমার কামিলাকে আদর করবে যেখানেই ও থাকুক।

'আবার কথা খুঁজতে হবে'

খ. আমার চার দিকে আওয়াজ শুরু হয়েছে
আমি টের পাচ্ছি হাড় ভাঙছে কলজে ছিঁড়ছে
আর মেশিনের জোড়দাঁত খুলছে বন্ধ হচ্ছে
ঠিক আমার সামনে।

এ হল কামিলার সময়ে
আমাকে উপহার দেওয়া আমার নেওয়া।

'কামিলার সময়ের ভিতরে'

গ. আমার আশেপাশে নগর-কীর্তন,
সেই চেনা গলা নিশ্চয় মাঝখানে ডুবে আছে,
তার সন্ধানে আমি এগোই
খুব সাবধানে পা টিপে টিপে
তবু বুলভারের সাঁকো কেবলই টলমল করে।

'বাইরে'

এই হল কামিলা, কবির আর এক সত্য। সময়ের সঙ্গে, সময়ের অগ্নি, উত্তাপ আর ধুলোবালির সঙ্গে জড়িয়ে কবির যে হয়ে-ওঠা, তারই অমোঘ অংশ যেন সে। বা, এভাবে বলা চলে, কবি ও তাঁর হয়ে-ওঠার নির্দিষ্ট এক পর্বে সময়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সারাৎসারের প্রতিমায়িত প্রতীক এই কামিলা।

আমাদের মতো পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের অস্তিত্বের অব্যবহিতে হয়তো সে আর সেভাবে বাস্তব নয়। কিন্তু সমস্ত মহৎ কবিতায় যেমন কবির বিমূর্ততম অভিজ্ঞতা-অনুভূতি অস্তিত্বের নানা আশ্চর্য মাত্রাকে চিনতে শিখিয়ে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, এখানেও তেমনি ঘটে। কামিলাকে নিয়ে কবির অনুভবের ভাষা প্রায়ই আমাদের অনুভবের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। কেননা এমন অনুভব তো আমাদেরও অস্তিত্বের যন্ত্রণা আর বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে যে :

আমি টের পাচ্ছি ধুলোর শব্দ
রাত্তিরের বুকে উষ্ণ বাতাস,
এবার আমাদের নিগুত যাত্রা
একসঙ্গে
আগুনের শিবিরে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

সাহিত্য-অনুবাদক অরুণ মিত্র

আমাদের এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য : অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের গুরুত্ব বিচার। এই বিচারকে আমরা একটা তাত্ত্বিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে চাই। ফলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে একটি গৌণ উদ্দেশ্যের আবির্ভাব ঘটেছে তা হল, সাহিত্য-অনুবাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এই গৌণ উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা কখনোই কোনো পদ্ধতিতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাই বাংলা সাহিত্য-অনুবাদ এবং সে-সম্পর্কে আলোচনা সাধারণভাবে ভাববাদী স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, বাজার-চলতি সাহিত্য-অনুবাদের বেশির ভাগই এই স্বেচ্ছাচারের নিদর্শন। আবার সাহিত্য-অনুবাদকে বিচার করার কোনো পদ্ধতিগত মান না থাকায় অনুবাদ সম্পর্কে সমালোচনা সাধারণত অস্পষ্ট কিছু মন্তব্য ও উক্তিতে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণহীন অসার চর্বিতচর্বণে পরিণত হয়। এ ছাড়া অনুবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবে ও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের মোহগ্রস্ত যুক্তিহীনতায় অধিকাংশ 'শিক্ষিত' বাঙালি পাঠক বিভিন্ন বিদেশি ভাষার রচনার ইংরেজি তর্জমা পড়ে 'মূল' পড়ার গৌরব বোধ করেন। ইংরেজি অনুবাদেরও ত্রুটিপূর্ণ বা অক্ষম হওয়া যে সম্ভব এবং বাংলা অনুবাদ যে ইংরেজি তর্জমার চেয়ে সার্থকও হতে পারে, এ কথা তাঁদের মাথায় আসে না।

মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যের সমবায়ে আমাদের অভিপ্রেত হল, কোনোরকম আবেগ, অস্পষ্ট ধারণা বা সাহিত্য-বহির্ভূত কারণ (ব্যক্তিগত কিংবা

গোষ্ঠীগত সম্পর্ক, আলোচিত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি) দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, একান্ত তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা।

অরুণ মিত্রের প্রথম ও প্রধান পরিচয়, তিনি বাংলাভাষার আধুনিক কালের গুরুত্বপূর্ণ কবিদের একজন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়, তিনি বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান সাহিত্য-অনুবাদক। পূর্ব-উল্লিখিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখানে আমাদের লক্ষ্য হল তাঁর এই দ্বিতীয় পরিচয়। বলা প্রয়োজন যে, আমরা 'অনুবাদক' শব্দটির পরিবর্তে 'সাহিত্য-অনুবাদক' এই যৌগিক সমস্ত-পদটি ব্যবহার করছি। অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আলোচনাকে পদ্ধতিগত অনির্দিষ্টতা ও অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে অনুবাদের একটা প্রাথমিক শ্রেণীবিভাজন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। আমাদের ধারণা, সাহিত্য নয় এরকম ব্যবহারিক রচনার অনুবাদ থেকে সাহিত্যিক রচনার অনুবাদ আলাদা একটি ভাষিক প্রক্রিয়া। প্রথমটিকে আমরা বলব 'ব্যবহারিক অনুবাদ', দ্বিতীয়টিকে 'সাহিত্য-অনুবাদ'। সাহিত্য-অনুবাদের মৌল লক্ষণ হল, উৎস বা ধারক -ভাষার কোনো সাহিত্যিক রচনা থেকে অনূদিত হয়ে ঐ রচনা লক্ষ্য বা গ্রাহক -ভাষায় সাহিত্য হিশেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর থেকে যে অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হল, ধারকভাষার সাহিত্যিক রচনার অনুবাদ হয়েও কোনো একটি রচনা গ্রাহক-ভাষায় সাহিত্য হিশেবে গৃহীত হবার যোগ্য না হতে পারে—সেক্ষেত্রে ওই অনুবাদকে সাহিত্য-অনুবাদ বলা যাবে না। অতএব বলা যায়, বিশেষ একটি উৎসভাষার সাহিত্যিক রচনা থেকে বিশেষ একটি লক্ষ্যভাষায় অনূদিত হয়ে কোনো রচনা যখন উক্ত গ্রাহকভাষায় সাহিত্য হিশেবে মর্যাদা পাবার যোগ্য হয়, তখনই ওই অনুবাদ-কর্ম 'সাহিত্য-অনুবাদ' এবং ওই অনুবাদ-কৃতির উৎপাদক 'সাহিত্য-অনুবাদক'। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে অরুণ মিত্র, আমাদের মতে, বাংলাভাষায় আধুনিক কালের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ সাহিত্য-অনুবাদকদের একজন।

যেহেতু আমাদের নির্ধারিত আলোচ্য অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদ,

অতএব আমরা তাঁর স্বল্পসংখ্যক ব্যবহারিক অনুবাদকে এ আলোচনার বাইরে রাখছি, যদিও ব্যবহারিক অনুবাদেও অরুণ মিত্র অনস্বীকার্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তা ছাড়া, আলোচনার পরিসীমা নির্ধারণের জন্য আমরা অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের একটি পঞ্জি উপস্থাপিত করছি।

পুস্তকাকারে বা সংকলনে প্রকাশিত অনুবাদ :১

১. ভের্‌কর : স্তব্ধ সমুদ্র [গল্প] (১৯৪৬)

২. ভলত্যার : কাঁদিদ [দার্শনিক উপন্যাস] (১৯৭০)

৩ লুই আরাগঁ : দেখা-সাক্ষাৎ [গল্প] (১৯৭৫)

৪. এলসা ত্রিয়োলে : মায়াকোভস্কি [স্মৃতিকথা] (১৯৭৯)

৫. ঝাঁ-পল সার্ত্র্ : শেষ সংলাপ [সাক্ষাৎকার] (১৯৮১)

৬. অন্য স্বর [বিভিন্ন সময়ে ফরাসি থেকে অনূদিত কবিতার সংকলন] (১৯৮৩)

৭. পল এল্যুয়ারের কবিতা [এল্যুয়ারের নির্বাচিত কবিতা] (১৯৮৫)

এছাড়া নানা পত্রিকায় অরুণ মিত্রের আরো কিছু অনুবাদ ছড়িয়ে রয়েছে। এখন পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা কোনো সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এই অনুবাদগুলি সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে। সেসব অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য অনুবাদ আমরা তালিকাভুক্ত করছি না, কারণ আমরা কেবল পুস্তকাকারে প্রকাশিত অনুবাদগুলির অবলম্বনে অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের আলোচনা করতে যাচ্ছি। তবে বর্তমান তালিকা থেকে যা স্পষ্ট হয়, তা হল : অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের উৎসভাষা একমাত্র ফরাসি এবং তিনি ফরাসি থেকে গদ্য এবং কবিতা দুইই বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

সাহিত্য-অনুবাদ : গদ্য ও কবিতা

অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনার ভূমিকা হিশেবে আবার 'সাহিত্য-অনুবাদে'র প্রসঙ্গে ফিরে আসাটা প্রয়োজনীয়। কেননা বিশেষ-ভাবে বলা দরকার, সব ধরনের রচনার অনুবাদপ্রক্রিয়া এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি এক হতে পারে না। রচনার চরিত্র অনুসারে ভাষিক প্রক্রিয়া হিশেবে

অনুবাদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়। অতএব অনুবাদের শ্রেণীবিভাজনের প্রাক্‌-উপাত্ত হিসেবে উৎসরচনার চরিত্র-নির্ণায়ক শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োজন। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রীরা শব্দের বৃত্তির যে বিভাগ করেছেন তাকে আমরা ভাষা-ব্যবহারের বৃহত্তর এককগুলির (অর্থাৎ বাক্য, বাচন এবং রচনার) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করি। ফলত, আমাদের মতে রচনাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : বাচক, লক্ষক ও ব্যঞ্জক। বৃত্তির প্রাধান্য বা গুরুত্ব বিচার করে এই বিভাজন, অতএব একই রচনায় একাধিক বৃত্তির উপস্থিতি থাকতে পারে এবং থাকে। বৃত্তির প্রাধান্য অনুযায়ী আমরা প্রস্তাবিত বিভাগকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে উপস্থাপিত করতে পারি :*

বৃত্তি :	অভিধা	লক্ষণা	ব্যঞ্জনা	বৃত্তির প্রাধান্য অনুসারে রচনার শ্রেণী
ব্যবহারিক রচনা :	(+)	+	—	বাচক
গদ্য :	+	(+)	+	লক্ষক
কবিতা :	+	+	(+)	ব্যঞ্জক

আবার রচনার চরিত্র কিভাবে অনুবাদ-প্রক্রিয়ার স্তরভেদ এবং তার ফলে শ্রেণীভেদ ঘটায়, তাও একটা বিন্যাসের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে :

অনুবাদের স্তর :	আভিধানিক ও ব্যাকরণগত স্তর	কৃষ্টিগত প্রসঙ্গ/ অনুষঙ্গের স্তর	প্রকাশ-প্রকরণ -গত স্তর	স্তরভেদে অনুবাদের চরিত্র-অনুসারী শ্রেণী
বাচক :	(+)	+	−	প্রতিরূপ
রচনার লক্ষক :	+	(+)	+	অনুরূপ
শ্রেণীব্যঞ্জক :	+	+	(+)	রূপান্তর

আবার অন্যদিকে, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারায়, বিবর্তনের পথ ধরে প্রতিটি ভাষায়, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যে বিশেষ একটা গ্রহণের ছাঁচ গড়ে ওঠে, অর্থাৎ সাহিত্যের আধার ও আধেয় সম্পর্কে বিশেষ যুগের পাঠকের মনে নির্দিষ্ট সীমারেখা-যুক্ত সাময়িক কিছু ধারণা তথা

* যোগচিহ্ন দিয়ে উপস্থিতি, বিয়োগচিহ্ন দিয়ে অনুপস্থিতি এবং বন্ধনী দিয়ে প্রাধান্য নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রত্যাশা তৈরি হয়। আর ওই আদর্শের বাইরে, সীমারেখা অতিক্রম করা কোনো অপরিচিত অপ্রত্যাশিত গড়নের রচনা গ্রহণ করা, তাকে উপলব্ধি করা কিংবা উপভোগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই লক্ষ্যভাষায় অপরিচিত এমন কোনো উৎস রচনাকে অনুবাদ করা কঠিন হয়, অথবা তার অনুবাদ করলে সে-অনুবাদে যদি নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্যের নিদর্শনও থাকে তবু তা গ্রহণের ছাঁচের বাইরে থাকার ফলে গ্রাহকভাষায় আবেদনহীন, অনুপ-ভোগ্য হয়ে পড়ে।

সাধারণভাবে কোনো সাহিত্য-অনুবাদকে সার্থক বলা হয় তখনই, যখন : ১. অনুবাদে উৎসরচনার 'বক্তব্য' ('অর্থ') ও বাইরের চরিত্রকে যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা থাকে এবং ২. অনুবাদ লক্ষ্যভাষার পাঠকের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাগত প্রত্যাশা মেটায় অর্থাৎ তা পাঠকের মনে প্রথাগত পূর্বগঠনের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া গ্রহণের কাঠামোতে সহজে খাপ খেয়ে যায়। তবে যে নির্ণায়কের ওপর সাহিত্য-অনুবাদের গুরুত্ব নির্ভর করে তা হল : ক. বিভিন্ন স্তরে আধার-আধেয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ধারক-রচনার সমগ্র রূপকে অনুবাদক-লেখক কতটা পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছেন আর খ. তা করার জন্য পাঠকের গ্রহণের কাঠামোকে প্রয়োজন-অনুযায়ী কীভাবে কতটা পালটে নিতে পেরেছেন এবং ওই কাঠামোর পরিধিকে ঘাতসহভাবে কতটা প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মাননির্ণয়ের এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত পরিসরের মধ্যে, অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদের গুরুত্ব নিরূপণের প্রয়াসে, তাঁর কবিতা ও গদ্যের অনুবাদ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

কবিতা-অনুবাদ

অরুণ মিত্র দীর্ঘকাল ধরে ফরাসি কবিতার অনুবাদ করছেন। সেসব অনুবাদ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও সংকলনে ছড়িয়ে ছিল। সাম্প্রতিক কালে তাঁর করা বিভিন্ন ফরাসি কবির কবিতার অনুবাদের একটি সংকলন এবং পল এল্যুয়ারের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে বইদুটির উল্লেখ করেছি। অরুণ মিত্রের কবিতা-অনুবাদের

পরিধি, বিস্তার ও নির্বাচন সম্পর্কে ধারণার জন্য আমরা অনূদিত কবি ও তাঁদের অনূদিত কবিতার সংখ্যার একটি তালিকা উপস্থাপিত করছি :

শতক	কবি	অনূদিত কবিতার সংখ্যা
পনেরো শতক	মরিস সেভ	দুই
ষোলো শতক	পিয়ের দ্য রঁসার	তিন
	দ্যু বেলে	এক
উনিশ শতক	শার্ল বোদলের	এক
	পল ভের্লেন	এক
	আরত্যুর র‍্যাঁবো	আট
বিশ শতক	পল ক্লোদেল	এক
	মাক্স ঝাকভ	তিন
	গীয়োম আপোলিনের	এক
	ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল	তিন
	স্যাঁ-ঝন্ পের্স	সাত
	পিয়ের র‍্যাভেরদি	তিন
	পল এল্যুয়ার	তেত্রিশ
	আঁরি মিশো	এক
	ঝাক প্রেভের	দশ
	ঝঁ ফলঁ্যা	নয়
	র‍্যনে শার	ছয়
	গিলভিক	পাঁচ
	[রিলকের ফরাসি কবিতা	দুই]

এই তালিকা থেকে আমরা কয়েকটি সাধারণ অনুমিতিতে পৌঁছতে পারি :

ক. কবিতা-অনুবাদে অরুণ মিত্রের মনোযোগ আধুনিক কালের —বিশেষ করে বিশ শতকের—ফরাসি কবিতার প্রতি।

খ. সতেরো ও আঠারো শতকের কবিতা তাঁর অনুবাদের তালিকায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং এ কথা সত্য যে ফরাসি কবিতার ইতিহাসে এ দুটি শতক তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাম্প্রতিক কালে বিদগ্ধ মহলে আঠারো শতকের

'মহান আলংকারিকদের' কবিতার প্রতি যে কৌতূহল লক্ষ করা যায় তা ইদানীন্তন কালের ফরাসি সাহিত্যে ভাষা সম্পর্কে অন্বেষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গ. উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ রোম্যান্টিক কবিদের কারো নাম এই অনুবাদ-তালিকায় নেই, এমনকী বাংলাভাষায় বহুকাল ধরে পরিচিত ও চর্চিত ভিক্তর য়ুগো পর্যন্ত অনুপস্থিত। বাংলাভাষার একজন আধুনিক কবি হিশেবে সাধারণভাবে প্রথানুগ রোম্যান্টিক কবিতার সীমা পেরতে চাওয়া এবং পেরিয়ে আসা অনুবাদকের মানসিকতাই কি এর একমাত্র কারণ? অবশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'অন্তস্বর' সংকলনের ভূমিকায় অরুণ মিত্র পনেরো শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত 'প্রত্যেক যুগের প্রধান ও প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের রচনার অনূদিত রচনার নিদর্শন দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন'-এর মাধ্যমে ফরাসি কবিতার ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়ার অপূর্ণ ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে করা অনূদিত রচনাই আমাদের অবলম্বন, তার থেকেই আমরা অনুবাদক-লেখকের মনোযোগ ও মানসিকতার বিচার করব।

ঘ. অরুণ মিত্র মোট নিরানব্বইটি (+দুইটি) ফরাসি কবিতার বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আর কোনো অনুবাদক সরাসরি ফরাসি থেকে এতগুলি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন নি। তরু দত্তের অনুবাদের কথা আমরা স্মরণ করছি না, কেননা তিনি বাঙালি অনুবাদিকা হলেও অনুবাদ করেছিলেন ফরাসি থেকে ইংরেজিতে। এ ছাড়া অরুণ মিত্রের অনূদিত কবিতার মোট সংখ্যা থেকে কিছু কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য বের করা যায় :

পনেরো শতকের কবিতা : দুই
ষোলো শতকের কবিতা : চার
উনিশ শতকের কবিতা : দশ
বিশ শতকের কবিতা : তিয়াত্তর (+দুই)

ছন্দমিলের কবিতা : এগারো (+দুই)
(টানা) গদ্যকবিতা : কুড়ি
মুক্তছন্দে কবিতা : আটষট্টি

শতক অনুযায়ী কবিতার সংখ্যা আমাদের পূর্ববর্তী অনুমিতিগুলিকে সমর্থন করে। তাছাড়া দেখা যায় যে উৎসভাষার ছন্দমিল-যুক্ত কবিতাগুলিকে বাংলায় ছন্দমিল অনুসরণ করে অনুবাদ করলেও কবিতা-অনুবাদে অরুণ মিত্রের প্রধান আগ্রহ মুক্তছন্দের কবিতার প্রতি এবং তারপর গদ্যকবিতার প্রতি। কবি অরুণ মিত্রের কবিতাপ্রকাশের বিবর্তনের ইতিহাসে এই মনোযোগের সাদৃশ্যভিত্তিক একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। কবি হিশেবে অরুণ মিত্র নিপুণ ছন্দমিলের অবলম্বন পার হয়ে ('প্রান্তরেখা' থেকে 'উৎসের দিকে') টানা গদ্য আর (বাংলার যা পঙ্‌ক্তিভাঙা বিন্যাসে সাজানো গদ্য হিশেবে পরিগণিত) মুক্তছন্দকে অবলম্বন করে ক্রমশ আরো বেশি মুক্তছন্দকে ব্যবহার করছেন।

ঙ. বোদলের ও ভের্লেনের একটি করে কবিতার অনুবাদ তাঁদের প্রতি অনুবাদকের যথেষ্ট মনোযোগের পরিচায়ক নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, আদি-কাল থেকে ফরাসি মানসিকতার দুটি রূপ : একদিকে রয়েছে মরমিয়া উপলব্ধি, অন্যদিকে প্রজ্ঞা-নিয়ন্ত্রিত যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা—পাস্কাল এবং দেকার্ত যেন ফরাসি মানসিকতার দুই প্রবণতার প্রতীক। ফরাসি কবিতারও যেন এই দুই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে—তার একদিকে রয়েছে অন্তর্গত অভিজ্ঞতা, বোধ, অন্যদিকে সচেতন শিল্পচিন্তার আধারে বুদ্ধি এবং বোধির সমন্বয়—একদিকে 'দ্রষ্টা' র‍্যাঁবো, অন্যদিকে 'শিল্পী' মালার্মে। অরুণবাবুর অনুবাদে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ফরাসি কবিতার প্রথম ধারা ও তার বিবর্তন ; তাই হয়তো মালার্মে বা ভালেরি সেখানে সম্পূর্ণ অনু-পস্থিত, বোদলের এবং ভের্লেনের উপস্থিতি নগণ্য, এল্যুয়ারের গুরুত্ব এবং আরাগঁর অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। [অবশ্য আরাগঁ সম্পর্কে অরুণ মিত্র 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় যে ধারাবাহিক রচনাগুলি লিখেছিলেন তার পুস্তকাকার -প্রকাশকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য তিনি আরাগঁর কিছু কবিতার অনুবাদ করছেন বলে শুনেছি। এখানে কারণটা অনেকটা সাহিত্য-বহির্ভূত; হয়তো বা রাজনৈতিক মতবাদ-প্রভাবিত।]

চ. কবি অরুণ মিত্র সম্পর্কে 'প্রগতিবাদী', 'দায়বদ্ধ' জাতীয় প্রবচন-মূলক বিশেষণ প্রয়োগ করে তাঁর কবিতার গুরুত্বকে অতি-সরলীকৃত করা

হয়। অথচ তাঁর কবিতা-অনুবাদের পরিধি এবং বৈচিত্র্য যেন তাঁর মানসিকতা তথা তাঁর কবিতার বহুমুখী জটিল বয়নের চরিত্রকে প্রতিবিম্বিত করে। গোষ্ঠীপরিচয় জাতীয় সাহিত্য-বহির্ভূত প্রভাব তাঁর কবিতা-অনুবাদে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। তাই 'দায়বদ্ধ' এল্যুয়ার ও গিলভিকের পাশে তিনি র‍্যাঁবো, ক্লোদেল, পের্স, শার, মিশো ইত্যাদি কবির কবিতারও অনুবাদ করেছেন।

জ. অরুণ মিত্র একক কবি হিশেবে পল এল্যুয়ারের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কবিতার অনুবাদ করেছেন। একমাত্র এল্যুয়ারের কবিতার অনু-বাদকেই তিনি আলাদা একটি বইয়ের স্থায়িত্ব দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে এল্যুয়ারের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অরুণ মিত্রের একসময়ের কবিতার উচ্চারণের সঙ্গে এল্যুয়ারের কবিতার উচ্চারণের কিছুটা সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তবে কি কবি অরুণ মিত্র একসময়ে এল্যুয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? কবিতা-অনুবাদে এল্যুয়ারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ কি সেই প্রভাবের স্মৃতিবাহী? প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে তাৎপর্যহীন, কারণ 'প্রভাব' কথাটি আমাদের কাছে গুরুত্বহীন, অবান্তর; আমরা সাহিত্য তথা কবিতার নির্মাণে বিবর্তনমূলক আন্তরবাচনিকতার ভূমিকায় বিশ্বাস করি।

উল্লিখিত সাধারণ অনুমিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কবিতা-অনু-বাদের তাত্ত্বিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অরুণ মিত্রের কবিতা-অনুবাদকে নিরীক্ষা করার চেষ্টা করব। তাঁর অনুবাদের বিশেষ চরিত্রকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে তথা কবিতা-অনুবাদের পদ্ধতিগত পার্থক্য নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের বিশ্লেষণ হবে কিছুটা তুলনামূলক।

ইতিপূর্বে শ্রেণীবিভাজনে আমরা রচনা হিশেবে কবিতাকে ব্যঞ্জক রচনা বলে নির্দেশ করেছি, তার অনুবাদ হল গ্রাহকভাষায় তাত্ত্বিক বয়নের দ্বারা আধার-আধেয়ের সুষম সমন্বয়ে একটা সমান্তরাল রূপ নির্মাণ—যাকে আমরা বলব রূপান্তর। 'পল এল্যুয়ারের কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় অরুণ মিত্র বলেছেন, 'ধ্বনিতে, চিত্রকল্পে, শব্দব্যঞ্জনায় মূলের মহত্ত্ব কতটাই বা বজায় রাখা যায় অনুবাদে? শুধু কিছু আভাস দেওয়া যায় এই যা।'[৭] তাঁর এই

উক্তির মধ্যে কবিতা-অনুবাদের নিহিত সমস্যা যেন সূত্রাকারে ধরা পড়েছে। ব্যবহারিকভাবে, অনুবাদ বলতে বোঝায়, কোনো একটি বাক্যের / বাচনের / রচনার 'অর্থ' (বক্তব্য / বার্তা) বা আধেয়কে ধারকভাষায় নির্মিত (বাক্য / বাচন / রচনার) আধার থেকে বিশ্লিষ্ট করে গ্রাহকভাষায় নির্মিত (বাক্য / বাচন / রচনার) দ্বিতীয় একটি আধারে উপস্থাপিত করা। কিন্তু কবিতা অর্থাৎ যাকে আমরা ব্যঞ্জক রচনা বলে নির্দেশ করেছি তার নির্মিতি বা আধার (=শব্দ-নির্বাচন, বাক্যবিন্যাস, ছন্দ, অলংকার) থেকে আধেয়কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আর কবিতার বক্তব্য বলতে সেরকম নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থবহ কিছু থাকে না। যা থাকে তা হল ভাষার বয়নে গড়ে ওঠা বহুমুখী ব্যঞ্জনা ; নির্বাচিত শব্দসমবায়, ব্যাকরণগত সংস্থান, ধ্বনিময়তা, ছন্দস্পন্দন, অলংকারের বৈশিষ্ট্য—কবিতার এসমস্ত উপকরণ অর্থবহ না হয়ে অর্থময় হয়ে ওঠে। এই অর্থময় বয়নই সৃষ্টি করে কবিতার ব্যঞ্জনা। এই অর্থময় বয়ন তথা ব্যঞ্জনাকে অনুবাদের প্রতিরূপ বা অনুরূপের আধারে ধরা সম্ভব নয়। যা সম্ভব, তা হল, ধারকভাষার কবিতার বাচনের চরিত্রকে উপলব্ধি করে গ্রাহকভাষায় সম্ভাব্য সমধর্মী একটা কবিতার বাচন নির্মাণ করা, যাকে আমরা সৃষ্টিশীল রূপান্তর বলে অভিহিত করছি। এই রূপান্তরের মূলে যে উপলব্ধি সক্রিয় থাকে, তা হল, ভাষ্যমূলক পঠন। বস্তুত, সাহিত্যের (তথা কবিতার) অনুবাদ এক ধরনের পঠননির্ভর লিখন অর্থাৎ পঠনজাত লিখন। বলা যায়, সাহিত্য-অনুবাদক একাধারে গভীর পাঠক, সমালোচক এবং সর্বোপরি সৃষ্টিশীল লেখক।

আবার সাহিত্য তথা কবিতার অনুবাদে উৎসরচনার সঙ্গে গ্রাহকরচনার যে অবশ্যম্ভাবী দূরত্ব গড়ে ওঠে তাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—স্থানগত, কালগত, ভাষাগত ও লিখনগত। স্থানগত দূরত্ব হল উৎসভাষা ও লক্ষ্যভাষার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষ্টিগত পার্থক্যের ফল। কালগত দূরত্ব উৎসরচনার কাল ও সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে লক্ষ্য-রচনার কালের ব্যবধান ও সম্পৃক্ত উপাদানের পার্থক্যের ফল। ভাষাগত দূরত্ব উৎসভাষা ও লক্ষ্যভাষার সংস্থানের পার্থক্যের ফল। লিখনগত দূরত্বের কারণ হল

উৎসরচনার লেখক ও ধারকরচনার লেখকের লিখনের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য। এখানেও আমরা পুনরুক্তি করছি, সাহিত্য-অনুবাদক অনুবাদে গ্রাহক-ভাষার সাময়িক সাহিত্যরীতি, ব্যাকরণগত বিন্যাস এবং গ্রাহকভাষায় নিজের লিখনকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কতটা ভাঙতে এবং নতুন করে গড়তে পারেন, গ্রাহকভাষার সমস্ত উপাদানের সম্ভাবনার সীমা কতটা প্রসারিত করে তাদের ব্যবহার করতে পারেন, তার ওপর তার সার্থকতা এবং গুরুত্ব নির্ভর করছে। প্রকৃতপক্ষে অরুণ মিত্রের অনুবাদের গুরুত্বের সূত্র এখানেই। আমরা তাঁর অনুবাদের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি :

১. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

'Au Lecteur', Charles Baudelaire

মূঢ়তা, প্রমাদ, কার্পণ্যের পাপে
পূর্ণ হৃদয়, দেহ তিলে তিলে ধ্বংস,
ভিখিরি যেমন পোষে উকুনের বংশ
আদরে জোটাই খাদ্য মনস্তাপে।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ৩

মূর্খতা, বিভ্রম, পাপ, কৃপণতা ক্ষুদ্র অসরল
আমাদের মন জোড়ে, শরীর জর্জর করে খালি,
আমাদের অনুতাপ আমরা অতি সযতনে পালি
যেমন ভিখিরি পালে তার ওই উকুনের দল।

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে আমরা দেখতে পাই, অনুবাদক-লেখক বাংলা আধুনিক কবিতার একটা সাময়িক ছকের মধ্যে বোদলেরের কবিতার রূপান্তর ঘটাচ্ছেন। বোদলেরের প্রকাশের অবলম্বন দীর্ঘবিলম্বিত লয়ের আলেক-

সঁত্র্যা ছন্দ এবং একই সঙ্গে গদ্যধর্মিতা ও কাব্যিক ভাষার সংমিশ্রণ। বুদ্ধদেব ৬+৬+২ ৩ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন যা একদিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেবের কবিতায় বহুচর্চিত হয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার অভ্যস্ত প্রকাশ-প্রকরণের অঙ্গীভূত এবং অন্যদিকে যার ছন্দস্পন্দনের চরিত্র উৎসরচনার থেকে ভিন্ন। ফলে বোদলেরের কবিতায় যেখানে একটা ধ্রুপদী উচ্চারণভঙ্গি রয়েছে, তা বুদ্ধদেবের রূপান্তরে অনেকটাই রোম্যান্টিক উচ্চারণভঙ্গিতে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার, ব্যঞ্জক রচনা হিশেবে কবিতার বাচনের অভিধাবৃত্তি বা এবং লক্ষণাবৃত্তি অনুপস্থিত থাকে না, প্রাথমিকভাবে এই দুই বৃত্তির গতিপথ ধরে এবং ক্রমে তা পার হয়ে ব্যঞ্জনার উপলব্ধি সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই বুদ্ধদেব যখন péché (পাপ) শব্দের স্বতন্ত্র অবস্থানকে বিলুপ্ত করে তাকে 'মূঢ়তা, প্রমাদ, কার্পণ্য'র সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্রে যোগ করে দেন, তাকে অন্য ভাববাচক বিশেষ্যগুলির যোগফলে পরিণত করেন, esprit (মন, মানসিকতা ;— চৈতন্য, অন্তরাত্মা ইত্যাদি) শব্দের অনুবাদে 'হৃদয়' ব্যবহার করেন, তখন অর্থান্তর ব্যঞ্জনার গতিপথ পালটে দেয়। আসলে, উৎসরচনার বোদলেরীয় উপলব্ধিময় মননপ্রবণতা, গদ্য ও কবিতার উচ্চারণের মিশ্রণ, ধ্রুপদী কণ্ঠস্বর — যে বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা কবিতার সাধারণ অভ্যস্ত চরিত্রের বাইরে—তার পরিবর্তন ঘটিয়ে বুদ্ধদেব রচনাটিকে বাঙালি আধুনিক কবিতার পাঠকের কাছে অভ্যস্ত গ্রহণযোগ্য আবেগময় অনুভূতিপ্রবণ 'কাব্যময়' রোম্যান্টিক উচ্চারণের কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। ফলে প্রথম অনুবাদটি সহজে বাঙালি পাঠকের কাছে 'কবিতার' আবেদন সৃষ্টি করে — কবিতার উপলব্ধিতে তার অভ্যাসজাত প্রত্যাশা মেটায়, কিন্তু এ অনুবাদ বোদলেরের কবিতার সম্পর্কে বেশ কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা দেয়। তুলনায় দ্বিতীয় অনুবাদটিতে অনুবাদক-লেখক বাংলা কবিতার সংস্থানের মধ্যে বোদলেরের কবিতার চরিত্রকে যথাসম্ভব সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন। সাধারণ পাঠকের অগভীর পাঠে অনুবাদটি প্রথম অনুবাদের তুলনায় 'অকাব্যিক' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মনোযোগী পাঠকের গভীর পঠনের উপলব্ধিতে এই অনুবাদ বোদলেরের রচনাটি সম্পর্কে একটা ধারণা, অরুণ মিত্র যাকে 'আভাস'

বলেছেন, তা দিতে পারে। বলা যায়, দুটি অনুবাদের মূলে রয়েছে উৎস-রচনাটির দুধরনের পঠন, বুদ্ধদেবের পঠন রোম্যান্টিকতা প্রভাবিত, অরুণ মিত্রের পঠন নিরপেক্ষ আধুনিক।

2. **J'ai embrassé l'aube d'été.**

Rien ne bougeait encore au front des palais L'eau était morte. Les camps d'ombres ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.

La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom.

'Aube', Arthur Rimbaud

আমি গ্রীষ্মের উষাকে আলিঙ্গন করেছি।

প্রাসাদের শীর্ষে তখন কিছুই নড়ছিল না। জল ছিল নিথর। ছায়ার শিবির বনপথ ছেড়ে যায় নি। প্রখর উষ্ণ নিঃশ্বাস জাগিয়ে আমি হেঁটেছি; মণিমানিক তাকিয়ে দেখল, ডানা উপরে উঠল নিঃশব্দে। মেটে পথ ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে তাজা অস্ফুট ঝলকে; তার মধ্যে প্রথম উদ্যম হল একটি ফুল, যে তার নাম বলল আমাকে।

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

আমি এ গ্রীষ্মের ভোর ধরেছি আশ্লেষে।

এখনো নড়েনি কিছু হর্ম্যের ললাটে। জলখণ্ড স্থির মৃত। বনপ্রান্তরেখা থেকে ছায়াদের তাঁবুগুলি গোটায়নি কেউ। জীবন্ত চঞ্চল উষ্ণ শ্বাসগুলি জাগাতে জাগাতে আমি চলি। মিনারে হীরকখণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখল, জেগে উঠল ডানারা নীরবে। ঠাণ্ডা লঘু ধূসর আভায় যেন কখন ভরেছে পথখানি। আমি পথ ধরি প্রথমে—একটি ফুল, সে আমায় বলল তার নাম।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদঃ

গদ্যে লেখা মূল রচনাটিতে বাক্যবিন্যাসে, বাক্যের পদক্রমে র‍্যাঁবো

ব্যাকরণের কোনো ব্যত্যয় ঘটান নি। নির্বাচিত শব্দগুলি সাধারণ, প্রচলিত। কিন্তু রচনাটির অসাধারণত্ব, শব্দ ও বাক্যের বিশেষ একটা শৃঙ্খলে বাচন তার ব্যবহারিক অর্থবহতা পেরিয়ে গেছে—ভাষাব্যবহার হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ভাষা থেকে আলাদা এক শিল্পভাষা—যেখানে শব্দ এবং বাক্যের অন্বয় সৃষ্টি করেছে একটা অর্থময়তা, বহু ভাষ্যের সম্ভাবনাময় ব্যঞ্জনা। অরুণ মিত্র উৎসরচনার চরিত্রকে ধরতে চেয়েছেন স্বাভাবিক পদ-ক্রমের গদ্যে। শব্দনির্বাচনেও তিনি প্রচলিত শব্দের সন্ধান করেছেন—শব্দ ও বাক্যের অন্বয়ে ব্যঞ্জনাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। অনুবাদে কোনো ব্যাখ্যা বা সংযোজন করে মূলের বিষয় বা বক্তব্যহীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন নি। দ্বিতীয় অনুবাদে অনুবাদক-লেখক অনূদিত বাচনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য গদ্য-বিন্যাসে উপস্থাপিত করলেও শ্রুতিগ্রাহ্য ছন্দ (অক্ষরবৃত্ত) ব্যবহার করেছেন। শব্দনির্বাচনেও তিনি উৎসরচনার ভাষাব্যবহারের চরিত্র থেকে সরে গিয়ে সাহিত্যিক স্তরের শব্দ (আশ্লেষ, হর্ম্য. ললাট, বনপ্রান্তরেখা ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন। ছন্দ রক্ষার প্রয়োজনে তিনি বাক্যে পদক্রমের স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেছেন (ক্রিয়া→কর্তা বা / এবং ক্রিয়া→কর্ম / বাক্যের সম্পূরক)। এই অনুবাদেও বাঙালি কবিতা-পাঠকের প্রথা ও অভ্যাসানয়ন্ত্রিত হৃদয়ে 'কবিতার আবেদন' সৃষ্টি করার চেষ্টা দেখা যায়—যা মূলের স্বভাবের অনুসারী নয়। অন্যদিক থেকে. বাক্যে যুক্তি-গ্রাহ্যতা তৈরির জন্য (মূলে অনুপস্থিত) কিছু সংযোজন, বিস্তার এবং পরিবর্তনও (জলখণ্ড, বনপ্রান্তরেখা,···গোটায়নি কেউ, জীবন্ত চঞ্চল. মিনারে হীরকখণ্ড, আমি পথ ধরি, ইত্যাদি) লক্ষ করা যায়। এখানেও দুই অনু-বাদের রূপান্তরের মূলে দুধরনের পঠন ক্রিয়াশীল—অরুণ মিত্রের পঠন এখানেও নিরপেক্ষ আধুনিক পঠন। আর শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পঠন 'কবিতা' সম্পর্কে পূর্বসংস্কারভিত্তিক পঠন।

৩. Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux

Elle s'engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.

'L'Amoureuse', Paul Eluard

তার পদপাত আমারই আঁখির পাতায়
আমার চুলেই মেশে তার গোছা চুল
আমার হাতের আকারে সে প্রাণ পায়
আমার চোখের তারার রং সে মাখে
আমার ছায়ায় আবৃত সে যে আঢুল
আকাশের গায়ে পাহাড় যেমন থাকে

বিষ্ণু দের অনুবাদ[৫]

ও আমার চোখের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে
আর ওর চুল আমার চুলের মধ্যে,
ওর আকার আমার হাতের আকারে,
আমার চোখের রংই ওর রং,
আমার ছায়ায় ও ডুবে যায়
আকাশে একটা পাথরের মতো।

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

সে আছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের পাতায়
তার চুল এসে মিশেছে আমার চুলে
আমার হাতের মতো অঙ্গের গড়ন হয়েছে তার
আমার চোখের মতো তার রং দেখেছি চক্ষু খুলে
তাকে আমি গ্রাস করেছি নিজের ছায়ায়
বিশাল আকাশে যেমন হেলানো পাহাড়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ[৬]

১৯২৪ সালে অর্থাৎ পল এলুয়ারের কবিজীবনের স্যুররেআলিস্ত পর্বে লেখা বিখ্যাত এই প্রেমের কবিতার উদ্ধৃত প্রথম স্তবক থেকে আমরা এই রচনাটির নির্মাণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে পারি। এখানে বাচনের যুক্তি-

গ্রাহ্য বিন্যাসের উপকরণগুলির অনুপস্থিতি উক্তির অর্থময়তার পরিধিকে প্রসারিত করেছে—ব্যঞ্জনাকে করেছে বহুমুখী। আবার রূপকের চিরাচরিত কাব্যিক ভাষাব্যবহার বর্জন করে এখানে ব্যবহারিক বাস্তবের ভাষাব্যবহারে রূপককে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অপ্রত্যাশিত আটপৌরে সাজে রূপক অনেক বেশি কার্যকর, ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃত অনুবাদগুলিতে নিম্নরেখ শব্দ বা শব্দসমবায়ের মধ্যে আমরা অনুভব করি ব্যাখ্যা, সংযোজন, সম্প্রসারণ এবং পরিবর্তনের দ্বারা যুক্তিগ্রাহ্যতা বা/এবং কাব্যভাষা তৈরির প্রয়াস যা উৎসকবিতার (স্যুররেআলিস্ত) চরিত্রের বিরোধী। লক্ষণীয়, অরুণ মিত্রের অনুবাদ ভিন্ন বর্গের, সেখানে কোনো সংযোজন বা সম্প্রসারণ নেই, পরিবর্তন যা দেখা যায় তা উৎসভাষা এবং লক্ষ্যভাষার মধ্যে বাক্য-রীতির পার্থক্যের ফল। উৎসরচনায় নিয়মিত কোনো ছন্দ নেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে মিলাভাস রয়েছে। অনুবাদ তিনটির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদের নিয়মিত ছন্দ (ছ মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত) এবং মিল ব্যবহার করা হয়েছে—এখানেও সেই অভ্যস্ত 'কবিতার' কাঠামো তৈরির ইচ্ছা হয়তো কাজ করেছে। অরুণ মিত্র আলাদা পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে আটপৌরে গদ্য ব্যবহার করেছেন, তবে বাক্যের স্বাভাবিকতা রক্ষা করার প্রয়োজনে মূলের মিলাভাসকে বর্জন করেছেন। আধুনিক কবিতায় ছেদ-চিহ্নের উপস্থিতি বা বিলোপ অর্থময় এবং উদ্ধৃত উৎসরচনায় নিয়মিত ছেদ-চিহ্ন রয়েছে—কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদে তা বিলুপ্ত, তৃতীয় অনুবাদে শুধু স্তবকের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি রয়েছে। সবদিক থেকে মূলের চরিত্রকে অনুসরণ করে অরুণ মিত্র তাঁর অনুবাদে পাঠকের পূর্বসংস্কার এবং অভ্যাসজাত কাব্যপ্রত্যাশাকে সহজপদ্ধতিতে তৃপ্ত না করে পাঠককে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত কাব্য-অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছেন।

৪. **Il y a**
ou plutôt
il y a eu
un homme qui a écrit ces mots
Demain sur nos tombeaux les blés seront plus beaux

c'est triste
c'est regrettable
parce que le blé ne pousse pas
précisément
sur les tombeaux des hommes qui sont tombés
pour que monte ou descende
le cours du blé

'Aux Champs', Jacques Prévert

আছে
বরং বলা যায়
ছিল
একটি লোক যে লিখে গেছে এই কথাগুলি পরপর
আগামী কাল আমাদের কবরের উপর ফসল হবে আরো সুন্দর
বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
যে ফসল জন্মাবেই
কারণ এমন নয় মোটেই
যারা প্রাণ হারায় তাদের কবরের উপরে
যাতে ওঠানামা করে
ফসলের দর···

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe
dans un cimetière l'hiver
le cri d'un être les doigts pris dans la portière...
une chanson
une phrase
toujours la même
une phrase

répétée

sans arrêt

sans réponse

l'homme la regarde ses yeux tournent

il fait des gestes avec les bras

comme un noyé

'Rue de Seine', Jacques Prévert

শীতার্ত কবরখানার কোন সমাধির উপরে

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে উঠছে এক নবজাতক···

দরজার পাল্লায় আঙুল চেপটে গিয়ে যেন ককিয়ে উঠছে কেউ

যে-গানের যে-কথার

কোন পরিবর্তন নেই

তারই পুনরুক্তি

কেউ তাতে বাধা দেয়নি

উত্তরও দেয় নি কেউ

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই ছেলে দৃষ্টি বিস্ফারিত

যেন অথই জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ

আর ডুবতে ডুবতে শুনছে সেই কথা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ ৭

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা একই রচনাংশের একাধিক অনুবাদের সাহায্যে কবিতা-অনুবাদের প্রকারভেদ এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে অরুণ মিত্রের কবিতা-অনুবাদের চরিত্র উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান দৃষ্টান্তে আমরা একই কবির দুটি পৃথক রচনাংশ এবং দুজন পৃথক অনুবাদকের করা তার অনুবাদ নিয়েছি। স্বভাবতই অনুবাদকদের একজন অরুণ মিত্র। তাঁর অনুবাদে আমরা প্রেভেরের কথ্য, কৌতুক ও কটাক্ষ -মিশ্রিত ফরাসি মানসিকতার প্রকাশক এবং অনলংকৃত লিখনের ছাঁচে বাংলায় একটা লিখন তৈরির চেষ্টা দেখি। তা ছাড়া উৎসরচনায় ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তছন্দ এবং পঙ্‌ক্তিশেষে মিল বা মিলাভাস। অরুণবাবু বাংলায় মুক্তছন্দের সমান্তরাল

পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তিতে ভেঙে বিন্যস্ত পদ্য ব্যবহার করেছেন আর তাতে যোগ করেছেন মিল বা মিলাভাস। বলা হয়, অনুবাদ কোনো ভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। আমরা বলব, তার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ কোনো ভাষার প্রকাশের সম্ভাবনার বিভিন্ন মাত্রার সন্ধান দেয়। অনিয়মিত ছন্দে মিলের ব্যবহার বাংলায় অজ্ঞাত নয় (অমিয় চক্রবর্তী একসময়ে তার চর্চা করেছিলেন)—কিন্তু তা বাঙালি কবিদের খুব-একটা আকৃষ্ট করে নি। আর মিলাভাস (যেমন মোটেই / জন্মাবেই) বাংলা কবিতার প্রকাশে অস্বীকৃত, মিলাভাস সেখানে অনিপুণ বা ত্রুটিযুক্ত মিল বলেই গণ্য হয়। কিন্তু আধুনিক কবিতার আটপৌরে কথ্যভঙ্গিমায় মিল অনেকসময় কৃত্রিম বলে বোধ হয়, আর মিলাভাস সেখানে ব্যঞ্জনার নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রেভেরের লিখনের ছাঁচ অনুসরণ করতে গিয়ে অরুণ মিত্র কোন ধরনের লিখনে মিল ও মিলাভাস ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে তার সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটন করেছেন। উদ্ধৃত দুটি অনুবাদেই আমরা যে শব্দ বা শব্দ-সমবায়কে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করেছি, তার দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রথম অনুবাদে মিলের স্বাভাবিকতা রাখার জন্য 'পরপর' এই শব্দটির সংযোজন করা হয়েছে, কথ্য আটপৌরে ভঙ্গি রাখার জন্য 'গম' (blé)-এর পরিবর্তে ফসল ব্যবহার করা হয়েছে, তবে 'প্রাণ হারায়' 'sont tombés'-র ভাবানুবাদ আর মূলে sur les *tombeaux* (স্যুর লে তোঁবো=কবরের ওপর) এবং qui sont *tombés* (কি সোঁ তোঁবে=যারা পড়ে গেল) শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিগত পর্যায়ে যে খেলা তৈরি করা হয়েছে তা বাংলায় রূপান্তর করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় অনুবাদের নিম্নরেখ পদগুলি সহ সমগ্র রচনাটির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রেভেরের লিখনের ছাঁচকে বাংলায় ততটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। প্রেভেরের লিখনের প্রত্যক্ষতা, মিতভাষণ, অনলংকৃতি অনুবাদক-লেখকের কাব্যধারণা তথা লক্ষ্যভাষার কাব্যরীতির সঙ্গে ঠিক মেলে না, এই বোধসমন্বিত পঠন থেকে অনুবাদে যুক্ত হয়েছে অলংকৃতি (শীতার্ত কবরখানা, শিউরে উঠছে একটি নবজাতক); প্রত্যক্ষতার জায়গায় এসেছে বক্রতা (যে গানের যে কথার / কোনো পরিবর্তন নেই / তারই পুনরুক্তি; কেউ তাতে বাধা দেয় নি / উত্তরও দেয় নি

কেউ) ; উৎসরচনার স্বাভাবিক পদক্রমের বদলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বা আলোকপাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে স্থানান্তরিত পদক্রম (শিউরে উঠছে এক নবজাতক, যেন ককিয়ে উঠছে কেউ, উত্তরও দেয় নি কেউ, তাকিয়ে রয়েছে সেই ছেলে, তলিয়ে যাচ্ছে কেউ, ডুবতে ডুবতে শুনছে সেই কথা) ; সংযোজন ও সম্প্রসারণ দ্বারা অসমাপ্ত বাক্যের সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করা হয়েছে (যে-গানের যে-কথার / কোনো পরিবর্তন নেই / তারই পুনরুক্তি / কেউ তাতে বাধা দেয় নি / উত্তরও দেয় নি কেউ) এবং রয়েছে পরিবর্তন (…দৃষ্টি বিস্ফারিত/যেন অথই জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ/আর ডুবতে ডুবতে শুনছে সেই কথা)। এজাতীয় অনুবাদ হয়তো কবিতা হিশেবে সুপাঠ্য হয়, কিন্তু উৎসরচনা সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় না।[৮]

৫. De l'éternel azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme la fleurs,
Le poéte impuissant qui maudit son génie
À travers un désert stérile de Douleurs.

'L'Azur', Stéphane Mallarmé

নিরপেক্ষ নীলিমায় নির্বিকার নির্মল বিদ্রূপ
মদালস পুষ্প যেন সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায়
অনর্থক বিড়ম্বনা অভিশপ্ত প্রতিভার যূপ,
যন্ত্রণার মরুপথে আমি কবি ছুটি নিরুপায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ[৯]

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমরা কবিতা-অনুবাদের আরেকটি সমস্যায় উপনীত হচ্ছি। অনুবাদক-লেখকের গভীর কাব্যসংস্কার এবং শৈলী অনেকসময় ধারকরচনা ও গ্রাহকরচনার মধ্যে এক ধরনের অনিবার্য এবং দুস্তর ব্যবধান তৈরি করে। এবং সেখানে ধারক ও গ্রাহক রচনার মধ্যে হয়তো 'অর্থের' ততটা দূরত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু লিখনের অপ্রশম্য বিরোধ ব্যঞ্জনার স্তরে বিপুল দূরত্বের কারণ হয়ে ওঠে। ওপরে উদ্ধৃত মালার্মের রচনাংশটিতে কোনো অপ্রচল বা / এবং বিশেষভাবে 'সাহিত্যিক' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। কবি শব্দের বিশেষ সংস্থাপন ও অন্বয়ে

'জনগোষ্ঠীর শব্দসমূহ'কে 'শুদ্ধতর এক অর্থ' দিতে চেয়েছেন। উদ্ধৃত অংশটি যে কবিতা থেকে নেওয়া, সেই কবিতাটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মালার্মে জানিয়েছিলেন : 'বিস্তৃততরভাবে শুরু করার জন্য আর পুরো ব্যাপারটাকে একটা গভীরতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম স্তবকে আমি নিজে দেখা দিই নি। সাধারণভাবে নীলিমা ক্ষমতাহীনকে নিপীড়ন করে।' তাছাড়া মালার্মে বলেছেন, আলোচ্য কবিতাটি 'আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে, কেননা আমার মাথার ভেতর বাসা বাঁধা অজস্র লাবণ্যময় মনোরম কবিতার পঙ্‌ক্তিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে, আমি অপ্রশম্যভাবে নিজের বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করতে চেয়েছি।' সুধীন্দ্রনাথের রূপান্তরে শব্দের নির্বাচন ও অন্বয় সাহিত্যিক, এবং আলংকারিক, লাবণ্যময় মনোরম কবিতার পঙ্‌ক্তির প্রতি আগ্রহও অলক্ষ্য নয়। অনুবাদক-লেখক তাঁর পঠনে মালার্মের কাব্যচিন্তার অবিচ্ছেদ্য ভাবাবেশ-সূচক impuissant (ক্ষমতাহীন) ও stérile (বন্ধ্যা) শব্দ-দুটির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেন নি, রূপান্তরে শব্দদুটির ধারণা বা অনুষঙ্গ অনুপস্থিত, 'নিরুপায়' impuissant-শব্দের দৃষ্টিকোণ পালটানো রূপান্তর। তা ছাড়া 'অভিশপ্ত প্রতিভার রূপ'-এর রোম্যান্টিক ধারণা এবং 'আমি কবি ছুটি'-র সক্রিয় উত্তম পুরুষের উপস্থিতি মালার্মের চিন্তার সমধর্মী নয়। অথচ কবিতা হিশেবে অনুবাদটি নিপুণ লিখনের নিদর্শন, কিন্তু সে লিখন অনুবাদক-লেখকের নিজস্বতায় চিহ্নিত। তাঁর অনবদ্য শৈলীর দৃষ্টান্ত।

অরুণ মিত্রের কবিতা-অনুবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ হল, আমরা কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রে যে পাঠভেদের এবং কবিতা-অনুবাদের যে প্রকারভেদের কথা বলেছি, তার দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন সুধীন্দ্রনাথ এবং অরুণ মিত্র। সুধীন্দ্রনাথের প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শৈলী তাঁর অনুবাদরচনাকেও একান্তভাবে সুধীন্দ্রনাথীয় করে তুলেছে। সুধীন্দ্রনাথের লেখক-সত্তা তাঁর অনুবাদক-সত্তাকে সম্পূর্ণ অধীন করেছে। অন্যদিকে সাহিত্য-অনুবাদক অরুণ মিত্র তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাঁর নিজস্ব রচনারীতিকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রসারিত করে বিভিন্ন উৎসরচনার চরিত্রকে গ্রাহকরচনায় ধরতে চেয়েছেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টায় সাফল্য গাণিতিক হতে পারে না। উৎসরচনার সঙ্গে একটা

মানসিক সাধর্ম্য রূপান্তরে তাঁর চরিত্রকে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে কার্যকর হয়ে ওঠে বলে আমাদের ধারণা।

৫. **Les sanglots longs**
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.

'Chanson d'automne', Paul Verlaine

কাঁদন আজি হায়
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি প্রাণ
যেন গো অবসান
নাহি এর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ[১১]

হেমন্তের বেহালায়
দীর্ঘ কান্না গুমরায়,
এবং আমার
হৃদয় কেবলই হানে
ক্লান্তি, অবিচ্ছিন্ন তানে
ক্লান্তির বিস্তার।

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

বিষাদ স্বর গায়
কে যেন বেহালায়
সে কি হেমন্ত,
করুণ ক্ষতগুলি
হৃদয়ে ভরে তুলি
ব্যথা নিরন্ত।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ ৪

মানসিক নৈকট্যবোধ কীভাবে উৎসরচনার পঠন তথা রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে তার উদাহরণ হিশেবে আমরা ওপরের তিনটি রূপান্তরকে উপস্থাপিত করেছি। উৎসরচনার ভিন্ন তিনটি ভাষ্যমূলক পঠনের প্রকাশ তিনটি রূপান্তরে সে-অর্থে মূলের চরিত্রবিরোধী কোনো সংযোজন, পরিবর্তন ইত্যাদি নেই—পার্থক্য যা আছে তা সমান্তরাল রচনার ব্যবধান হিশেবে নির্দেশ করা যায়। আবার, উৎসরচনাটির আধেয় বলতে প্রায় কিছুই নেই—অস্পষ্ট, বিষণ্ণতার বিধুর রোম্যান্টিক অনুভূতিই কবিতাটির অবলম্বন—অর্থের স্তরে কবিতার বাচনও প্রথানুগভাবে কাব্যিক। কিন্তু রচনাটির প্রকৃত আধেয় হচ্ছে শব্দের নির্বাচন ও অন্বয়, ছন্দস্পন্দন মিল ইত্যাদির দ্বারা বয়ন করা একটা ব্যঞ্জক ধ্বনিময়তা। এখন এই ব্যঞ্জক ধ্বনিময়তাকে গ্রাহকরচনার রূপান্তরে প্রতিধ্বনিত করায় তাঁরই সফল হওয়া সম্ভব যাঁর নিজস্ব রচনারীতিতে এই ব্যঞ্জক ধ্বনিময়তার প্রাধান্য দেখা যায়। সেদিক থেকে তিনটি রূপান্তরের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রূপান্তর আমাদের কাছে সবচেয়ে 'মূলানুগ' বলে বোধ হয়েছে। মানসিকতায়, বিশ্বাসে অরুণ মিত্র সম্পূর্ণ অন্যচরিত্রের লিখনের অধিকারী। তাই যদিও অর্থগত স্তরে তাঁর রূপান্তর মূলের প্রতি সবচেয়ে বিশ্বস্ত, তবু নিজস্ব লিখনকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করেও তিনি মূলের চরিত্রকে গ্রাহকরচনায় ধরতে পারেন নি। তৃতীয় অনুবাদ-রচনাটি অর্থগত ও ধ্বনিগত স্তরের মাঝামাঝি দ্বিধাগ্রস্ত।

অরুণ মিত্রের গদ্য-অনুবাদ

গদ্য-অনুবাদের ক্ষেত্রেও অষ্টাদশ শতকের ভলতের বাদ দিলে অরুণ মিত্রের অনুবাদের পরিধি প্রধানত বিশ শতক। প্রসঙ্গত গদ্য-অনুবাদে সাহিত্য-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রক উপাদানের কথা ভোলা উচিত নয়। কবিতার অনুবাদে ব্যক্তিগত পছন্দ বা উৎসরচনার সঙ্গে মানসিক সাধর্ম্য-বোধ যতটা সক্রিয় কারণ হয়ে ওঠে, গদ্যের অনুবাদে তা নাও হতে পারে ; বাইরের তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা, প্রকাশের সম্ভাবনা বা স্থিরতা অনেকসময় গদ্য-অনুবাদে রচনা-নির্বাচনের নিয়ামক হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে বাংলাভাষায় ঐতিহ্য-হীন অসংগঠিত প্রকাশনার জগতে এটাই হল বাস্তব। তাই গদ্যের অনুবাদে

কোনোরকম ধারাবাহিকতা বা বিশেষ ক্ষেত্র নির্বাচন করা প্রায় সম্ভব হয় না। সেই কারণে অরুণ মিত্রের গদ্য-অনুবাদের নির্বাচন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলেও এর অন্যথা হওয়ার যে উপায় ছিল না, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

গদ্যসাহিত্য, বিশেষ করে কথাসাহিত্যকে আমরা রচনা হিশেবে লক্ষক শ্রেণীভুক্ত করি। এই শ্রেণীর রচনায় (সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি উপকরণের যোগফল) প্রসঙ্গ রচনার লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করে। গ্রাহকভাষায় এই কৃষ্টিগত স্তরে অনুরূপায়ণ কেবলমাত্র বাচনের বাচ্যার্থের প্রতিরূপ নির্মাণে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গের উপলব্ধি ও অনুরূপায়ণের জন্য প্রথমত ধারকভাষার বিবর্তন ও বিবরণ সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন, তারপর গ্রাহকভাষাতেও এই দুই রূপের সম্যক ধারণা, এর ভিত্তিতে অনুরূপ রচনা সম্ভব। অন্যথায় অনুবাদে বিচ্যুতি, বিকৃতি বা অপ্রয়োজনীয় বিস্তৃতি ইত্যাদি ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া সাহিত্যে লিখনের দৃষ্টিকোণের মতন পঠনেরও একটা দৃষ্টিকোণ থাকে। অনুবাদ যেহেতু পঠনজাত লিখন, স্বভাবতই দুজন অনুবাদকের অনুবাদে উৎসরচনার প্রসঙ্গের উপস্থাপনা, ভাষ্যমূলক পঠনের ওপর ভিত্তি করে কৌণিক ভিন্নতা পেতে পারে। এই কথাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অরুণ মিত্রের গদ্য-অনুবাদের তিনটি অংশ উদ্ধৃত করছি। এখানেও আমাদের আলোচনা হবে প্রধানত তুলনামূলক।

১. Rien n'était si beau si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes caviron neufà dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se uonter à une trentaine de mille

âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque.

'Candide, ou L'optimisme', Voltaire

যাঁরা দুই সুশিক্ষিত সেনাদলকে ব্যূহ সাজিয়ে অপেক্ষা করতে দেখেন নি, তাঁরা তো সে-ব্যূহরচনার সৌন্দর্য বা কৌশলের তারিফে অক্ষম। তূরী, ভেরী, ঘোষক আর কামান-বন্দুকের গর্জন মিলে এমন এক স্বর-সঙ্গত জমে ওঠে, যার কাছে জাহান্নমও হার মেনে যায়। প্রথমে তো গোলন্দাজের তোপে দু'পক্ষের প্রায় ছ'হাজার মানুষ উড়ে গেল, তার-পরে রাইফেলের অগ্নি উদ্গার। তাতে দুনিয়া প্রায় ন'-দশ হাজার কুলাঙ্গারের ভারমুক্ত হল। রাইফেল ছ'হাজারের মোহড়া নিলে তার অকাট্য যুক্তিপ্রয়োগে। সংখ্যা এবার এসে দাঁড়াল প্রায় তিরিশ হাজারে। ক্যাণ্ডিড তখন দার্শনিকের মতোই থরহরি কম্পমান, এই বীরত্বের জবাই থেকে সে দূরে সরে গেল, যথাসম্ভব লুকিয়ে রইল।

অশোক গুহের অনুবাদ[১২]

ঐ দুই সৈন্যবাহিনীর মতো এমন সুন্দর, এমন তৎপর, এমন জমকালো, এমন সুশৃঙ্খল আর কিছু কখনো দেখা যায়নি। তূর্য, বাঁশী, শিঙা, দামামা ও কামানে এমন এক ঐকতান রচিত হল যা নরকেও কখনো শোনা যায়নি। কামানের গোলা প্রথম চোটে প্রত্যেক পক্ষে হাজার ছয়েক লোককে ধরাশায়ী করল। তারপর বন্দুকের গুলি সমস্ত জগতের সেরা এই জগৎ থেকে অপসারিত করল হাজার নয়-দশ পাপিষ্ঠকে যারা ধরাপৃষ্ঠ কলুষিত করছিল। সঙ্গীনও কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুর পর্যাপ্ত কারণ হল। সবসুদ্ধ হাজার ত্রিশেক আত্মার সদ্গতি হল। দার্শনিকের মতোই কাঁপতে কাঁপতে কাঁদিদ এই বীরোচিত নিধনযজ্ঞের সময় যথা-সাধ্য আত্মগোপন করে রইল।

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

অনবদ্য! অপরূপ! এত বীরত্ব, এত সামরিক সাজসজ্জা, এমন সুষ্ঠু সৈন্যবিন্যাস—এই দুটি বিবদমান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যা দেখা গেল

এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নি। তূরী-ভেরী, বাঁশী-সানাই, ঢাক-কামান—সব মিলিয়ে এমন একটি কর্ণতৃপ্তিকর মহাগীতের সৃষ্টি যুদ্ধক্ষেত্রে হয়েছিল তেমনটি নরকেও শোনা যেত না। উৎসব শুরু হল কামান দাগার সঙ্গে-সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি দলে ছ'হাজার করে লোক মা ধরিত্রীর কোলে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই পৃথিবীতে যেসব বদমাইশের দল মাছির মত ভন্‌ভন্‌ করছিল, বন্দুকের গুলি তাদের মধ্যে নয় থেকে দশ হাজার লোককে পরলোকের পথে উড়িয়ে দিল। তারপরে সামনে এগিয়ে এল সঙ্গীনের ঝাঁক। তাতেও খতম হল কয়েক হাজার। হতাহতের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। দার্শনিকের মত কাঁপতে লাগলো কাঁদিদ; এই বীরত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সময় যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রাখলো সে।

সুনীলকুমার ঘোষের অনুবাদ১৩

ভলতেরের রচনাংশে তিনটি প্রসঙ্গের সমন্বয় ঘটেছে: প্রথমত. কাঁদিদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার অনুকাহিনীর মাধ্যমে ঘটনা-পরম্পরায় গ্রথিত কাহিনীর অগ্রগতি; দ্বিতীয়, ভলতেরের যুদ্ধ-বিরোধিতা (ঐতিহাসিক পটভূমি: ফরাসি ও প্রুশীয়দের যুদ্ধ); তৃতীয়, লাইবনিৎসীয় মঙ্গলবাদী দর্শনের সমালোচনা। প্রথম প্রসঙ্গ বিভিন্ন বাক্যের সমন্বয়ে গড়া সম্পূর্ণ বাচনের যোগফল। ভলতেরের যুদ্ধবিরোধিতার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে **si leste, si brillant, si bien ordonné** (শব্দার্থ এমন চটপটে, এমন দীপ্তিময়, এমন সুশৃঙ্খল) এই বিশেষণ পরম্পরায়, ক্রিয়াবিশেষণ si (এত, এমন)-এর পুনরাবৃত্তিতে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে **canons** (কামান)-এর অন্বয়ে, **harmonie** (স্বরসাম্য, ঐকতান) শব্দের সঙ্গে **enfer** (নরক)-এর অনুষঙ্গের বৈপরীত্যে, খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যময় **âmes** (আত্মা=জীবাত্মা, মানুষ) শব্দের ব্যবহারে. নিরপরাধ মৃত সৈন্যদের সম্পর্কে **dix mille coquins qui en infectaient la surface** (শব্দার্থ: দশহাজার বদমাইস যারা ধরাতল সংক্রমিত / দূষিত করছিল) উক্তিতে, শেষবাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়ে গুরুত্ব পাওয়া **boucherie** (জবাই) নামপদ ও তার পরে অর্থের বৈপরীত্যময়

বিরোধযুক্ত বিশেষণ **héroïque** (বীরত্বপূর্ণ, বীরোচিত) শব্দের গ্রন্থনায়। আবার সাধারণভাবে দর্শন ও দার্শনিকদের প্রতি এবং বিশেষভাবে লাইব-নিৎসীয় দর্শনের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে নিরীহ সৈন্যদের হত্যার প্রসঙ্গে পৃথিবী সম্পর্কে **du meilleur des mondes** (শব্দার্থ : জগৎগুলির মধ্যে সেরা জগতের) শব্দসমবায়ের ব্যবহার, **la baïonnette** (সঙ্গিন)-এর সঙ্গে দার্শনিক পরিভাষা **la raison suffisante** (পর্যাপ্ত হেতু)-এর যোগে এবং **tremblait comme un philosophe** (শব্দার্থ : একজন দার্শনিকের মতো কাঁপছিল) জাতীয় কটাক্ষে।

বাংলায় প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদে অনুবাদকের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টি হল এক-মাত্র কাহিনীর অগ্রগতি। অনুবাদক-দ্বয় রচনাংশটিকে আংশিক অনুকাহিনী-মাত্র হিশেবে দেখেছেন। ফলে রচনাংশের বাকি দুটি প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত ভাষাগত উপাদানগুলিকে এই দুই অনুবাদে পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা হয়েছে। প্রথম অনুবাদটিতে উৎসরচনার দীর্ঘ বাক্যগুলির তির্যক ভঙ্গিমার পরিবর্তে গল্প-কথনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাবলীল গতিময়তা তৈরির জন্য বাক্য-বন্ধকে ভেঙে, নতুন ক্রমে সাজিয়ে তার চরিত্র পালটানো হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, বাংলা অনুবাদের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার থেকে বাংলা অনুবাদের প্রথাগত আদর্শের একটা ধারণা করা যায়। সেই আদর্শের কাঠামো হল : 'সাবলীল', 'তরতর করে পড়ে যাওয়া যায়' 'অনুবাদ পড়ছি বলে মনে হয় না' 'অনুবাদ অবান্তর উল্লেখ ও বর্ণনা বর্জিত' ইত্যাদি। তাই উৎসরচনা জটিল হলেও সাধারণ বাঙালি অনুবাদক তাকে পালটে সরল করার চেষ্টা করেন—প্রয়োজনে রচনার জটিল উপাদানগুলি বর্জন করে তাকে সাবলীল করেন। আলোচ্য অনুবাদের তৃতীয়টিতে কিছু-কিছু বাক্য সম্প্রসারিত ও ব্যাখ্যামূলক—কিন্তু প্রসঙ্গের কৃষ্টিগত ভিত্তি জানা না থাকায় সেসব ব্যাখ্যা ভ্রান্তিময়, ফলে রচনার প্রসঙ্গ-বিরোধী। প্রকৃত-পক্ষে এ দুটি অনুবাদে ভলতেরের রচনা তার দুটি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হারিয়েছে—এবং ভলতেরের লিখনের সঙ্গে দূরতম সাদৃশ্য রাখার কোনো চেষ্টাও তাতে নেই। একমাত্র অরুণ মিত্রের অনুবাদেই উৎসরচনার তিনটি প্রসঙ্গকে ভাষান্তরে রূপান্তরিত হতে দেখি। অবশ্য গ্রাহকভাষার বাগ্‌বিধির কারণে

তথা কৃষ্টিগত স্তরে কিছু অনিবার্য পরিবর্তন এসেছে (যেমন, boucherie পরিণত হয়েছে 'নিধনযজ্ঞ'-তে এবং 'সমস্ত জগতের সেরা জগৎ' ও 'পর্যাপ্ত কারণ' ঐতিহাসিক পটভূমি হারিয়ে ধারকভাষায় দার্শনিক অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িত শ্লেষের তীব্রতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে)।

২. অরুণ মিত্রের অনুবাদের চরিত্র বোঝার জন্য আমরা ধ্রুপদী অষ্টাদশ শতক থেকে আধুনিক বিশ শতকে চলে আসছি :

> Sesyeux restèrent accrochés là et sa voix reprit avec une violence gémissante :— Rien, rien, peronne ! » Et comme si nous n'avions pas compris encore, pas mesuré l'énormité de la menace : « Pas seulement vos modernes ! Pas seulement vos Péguy, vos Proust, vos Bergson...Mais tous les autres ! Tous ceuxlà ! Tous ! Tous ! Tous !
>
> Son regard encore une fois balaya les reliures doucement luisant dans la pénombre, comme pour une caresse désespérée.
>
> —Ils eteindront la flamme tout à fait ! cria-t-il. L' Europe ne sera plus éclairée par cette lumière !
>
> Et sa voix creuse et grave fit vibrer jusqu'au fond de ma poitrine, inattendu et saisissant, le cri dont l'ultime syllabe traîna comme une frémissante plainte :
>
> —Nevermore !
>
> 'Le Silence de la Mer', Vercors

সেইখানেই তার দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির আবদ্ধ হয়ে থাকে, তার পর কণ্ঠ দিয়ে মথিত গর্জনের মত ধ্বনিত হয়ে ওঠে, কেউ নয়, কেউ নয়, এদের কাউকেই বেঁচে থাকতে দেবে না !

তার সেই আশঙ্কার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা হয়ত বুঝতে পারি নি মনে ক'রে সে আমাদের বুঝিয়ে বলে, শুধু যে আপনাদের আধুনিক সাহিত্যিকেরাই নিষিদ্ধ, তা নয়।···ফরাসী সাহিত্যের, ঐ আপনার

আলমারীতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সবাই···সবাই নিষিদ্ধ···একজনকেও ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না !

সেই রাত্রির আধ-আলো-আধ-অন্ধকারে তার দৃষ্টি অসহায় মমতায় সেই বাঁধানো বইগুলির ওপর দিয়ে যেন স্পর্শ করে যায়। চীৎকার করে ওঠে, সারি সারি ঐ প্রদীপের আলো, ওরা সব নিবিয়ে দেবে ! এমনভাবে নিবিয়ে দেবে যে আর তাদের আলোয় য়ুরোপ উদ্ভাসিত হবে না !

তার সেই আর্ত কণ্ঠের সুগভীর আকুতি আমার অন্তরে এসে যেন আছড়ে পড়লো, আমার অজ্ঞাতে প্রতিধ্বনির মতন শুধু একটা কথা, আর্তনাদের মতন বেরিয়ে এলো,

—সব শেষ !

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ ১৪

তার চোখ সেখানেই নিবদ্ধ হয়ে থাকল এবং তার কণ্ঠস্বর একটা হিংস্র গোঙানির স্বরে বলে চলল, 'কিছু না, কিছু না, কেউ নয় !' তারপর, আমরা যেন বুঝতে পারিনি, যেন বিপদের গুরুত্বটা ঠিক ধরতে পারিনি, সেইভাবে '—শুধু আপনাদের আধুনিক লেখকরা নয়। আপনাদের পেগি, প্রুস্ত, বের্গসন নয়—সকলে। ঐ ওরা সকলে ! সব, সব, সব।' যেন এক প্রাণপণ স্নেহে সে বইয়ের বাঁধাইগুলোতে আর একবার দৃষ্টি বোলাল। বাঁধাইগুলো গোধূলির আলো পড়ে চিকমিক করছিল। 'ওরা শিখা নিবিয়ে দেবে একেবারে', সে চেঁচিয়ে বলল, 'ইওরোপ আর কখনও ঐ আলোয় আলোকিত হবে না।' তার গম্ভীর কাঁপা স্বর এক অপ্রত্যাশিত চমক-লাগানো চিৎকারে আমার বুকে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলল, সে-চিৎকারের শেষ ধ্বনিটা যেন দীর্ঘায়িত হয়ে কান্নার মতো হয়ে গেল। 'আর কখনও না।'

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

এই রচনাংশের প্রথম অনুবাদটিতে অনুবাদক-লেখক উৎসরচনার আবেগকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তবে এই অনুবাদে যে ত্রুটিগুলি রয়েছে তা বাংলা সাহিত্য-অনুবাদের প্রথাগত ত্রুটি—অর্থাৎ বর্জন ও সম্প্রসারণের ত্রুটি। দু-একটি ভ্রান্তির কারণ বোধহয় ইংরেজি অনুবাদের অবলম্বন। কিন্তু সাধারণ-

ভাবে এই অনুবাদেও দেখা যাচ্ছে : সাবলীলতার প্রথাগত কারণে অতি-কথনমূলক সম্প্রসারণ, কৃষ্টিগত কোনো প্রসঙ্গের বর্জন, সরলীকরণ—আসলে এ সমস্তই অনুবাদকে প্রত্যাশার ছাঁচে ফেলে নতুন ভাবে করার চেষ্টা (বাঙালি পাঠকের কাছে অপ্রয়োজনীয় বোধে পেগি, প্রুস্ত, বের্গসনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে—সরলীকরণের জন্য যোগ করা হয়েছে 'ঐ আপনার আলমারীতে যাঁরা রয়েছেন' বা 'সারি সারি ঐ প্রদীপের আলো')। অরুণ মিত্র ঐ সহজ সিদ্ধির পথে না গিয়ে বিদেশি প্রসঙ্গ বা এবং অনুষঙ্গকে ধারকভাষার সম্ভাব্যের সীমা ছুঁয়ে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। পাঠক তাঁর অনুবাদ পড়ে বিদেশি সাহিত্য পড়ছেন এ কথা মনে রাখবেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্তে আমরা কেবল অরুণ মিত্রের একটি অনুবাদ দিচ্ছি। এখানেও অরুণ মিত্রের অনুবাদের গুণগুলি বর্তমান। কিন্তু যে কারণে আমরা কোনো তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ না রেখে এই তৃতীয় রচনাংশটি উপস্থিত করছি, তা হল, অনুবাদক-লেখক হিশেবে অরুণ মিত্রের লিখনের স্থিতিস্থাপকতা দেখানো। একই লিখনকে তিনি প্রয়োজন অনুসারে কতটা বাঁকিয়েচুরিয়ে প্রাণময় করে নিতে পারেন, তার নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর করা ভলতের, ভেরকর এবং আরাগঁর অনুবাদ পড়ে।

Le Maréchal Tito continue à tracasser le boucher. Il m'agace à la fin, le boucher. Q'uest-ce que ça pent lui faire, au boucher, ce qu'il est Tito, puisqu'il se bat contre Hitler ? Comme je pensais ça, j'ai eu une espèce de frisson, il m'a semblé réentendre Emile, disant : ≪ Il est en h-Espagne, il se bat contre Hitler... ≫ Alors, j'étais comme le boucher...même pire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, se battre contre Hitler, ce qui me frappait, c'était la prononciation d'Emile, pas ce qu'il disait.

Et cette Yvonne avec ses yeux bleus... Elle est dans un camp...pas mal, somme toute...pas mal...Nous

sommes en décembre. Ce sera bientôt Noël. Les gosses de Rosette auront-ils un arbre de Noël, chez les grands-parents ? Quel âge ont-ils ? Le garçon, l'aîne doit avoir ses dix ans...La petite, voyons, la petite est nee quand...

'Les Rencontres', Louis Aragon

মার্শাল টিটোকে নিয়ে কসাই এখনো বিব্রত। শেষ পর্যন্ত সেও আমাকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছে, ঐ কসাই। টিটো কি—তাতে তার কি আসে যাচ্ছে, যখন তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছেন? ঐ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি কেমন কেঁপে উঠলাম! মনে হল আমি যেন এমিলের গলা শুনলাম, ও তার নিজস্ব উচ্চারণে বলছে. 'সে স্পেনে রয়েছে, সে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়ছে—, তাহলে আমিও তো কসাই-য়ের মত দেখছি। এমন কি আরো খারাপ। এমিল কি বলছে আমি বুঝতে পারছিলাম না, হিটলারের বিরুদ্ধে লড়া। আমার মনোযোগ যাচ্ছিল তার উচ্চারণের দিকে, সে যা বলছিল তার দিকে নয়।
আর সেই ইভন, তার দুই নীল চোখ—সে বন্দীশিবিরে—খারাপ নয় মোটের উপর—খারাপ নয়। এখন ডিসেম্বর। সামনেই বড়দিন। রোজেতের ছেলেমেয়েরা কি দাদু-দিদিমার বাড়িতে খ্রীস্টমাসের গাছ পাবে? কত বয়েস হল তাদের? ছেলেটা বড়, তার নিশ্চয় ছ-বছর হল—আর মেয়েটা, মেয়েটা তো জন্মেছিল যখন—

অরুণ মিত্রের অনুবাদ

অরুণ মিত্রের সাহিত্য-অনুবাদ সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছা সংবরণ করে আমরা এককথায় বলতে পারি, অরুণ মিত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অধিকারের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন—তাতে যোগ করেছেন ফরাসি সাহিত্যের একটুকরো ভূখণ্ড। তাঁর অনুবাদে ফরাসি সাহিত্যকৃতির যতটা পাওয়া যায় তা পড়ে ফরাসি-না-জানা বাঙালি পাঠক ইংরেজি অনুবাদের দ্বারস্থ না হয়ে রচনাগুলি অনুবাদে পড়েছেন দাবি করতে পারেন, ইংরেজি অনুবাদ না পড়ার হীনমন্যতা বোধের কোনো কারণ সেখানে থাকবে না।

বলা দরকার, অনুবাদের নির্বাচনে, ভাষ্যমূলক পঠনে, এমনকী সাধারণ-ভাবে ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালির মনোভাব ইংরেজির তথা ইংরেজের ফরাসি-সাহিত্য বিচার দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রমথ চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে অনেকের ক্ষেত্রেই তা সত্যি। অরুণ মিত্র এর ব্যতিক্রম। ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই ইংরেজের বা ইংরেজির দ্বারা প্রভাবিত হয় নি।

আর ফরাসি সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদক হিশেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম অরুণ মিত্র।

টীকা :

১. আমরা এই তালিকাগুলিতে ফরাসি নামের প্রতিবর্ণীকরণে অরুণ মিত্রের প্রতিবর্ণীকরণ অনুসরণ করেছি।

২. বর্তমান আলোচনাটির লেখা শেষ হওয়ার পর, অরুণ মিত্রের একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার চোখে পড়ল। সেখানে অনুবাদ সম্পর্কে অরুণবাবু যা বলেছেন তা অনুবাদ সম্পর্কে তত্ত্বগত তথা প্রয়োগগত দিকে তাঁর সচেতনতার প্রকাশ। আমরা তা উদ্ধৃত করছি :

আসল কবিতা অনুবাদে অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। কবিতার নির্ভর তো শব্দ। সেই শব্দই বদলে যায় অনুবাদে। মূল শব্দের যে ধ্বনি বা স্বাদ তা অনুবাদে থাকে না। তবু অনুবাদ করে মূল কবিতার খানিকটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ কবি কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করছেন বা কি ধরনের কথা বলতে চাইছেন, তার একটা ইঙ্গিত দেওয়া যায়। তবে অনুবাদকের সব সময় উচিত, যেটা আমি নিজে করি, অনুবাদে এমন কোন শব্দ বা ছন্দ ব্যবহার না করা, যা সেই কবির সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। সেই কারণে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্যে, তাঁকে ভালোভাবে জানতে হবে— কি তাঁর বৈশিষ্ট্য, কি তাঁর প্রকাশ-পদ্ধতি, কি তাঁর কবিতার কাঠামো, এসব ভালোভাবে জেনেই কবিতার অনুবাদ করা উচিত।

হয়তো কবি কোন কবিতা গম্ভীর ছন্দে লিখেছেন, সেটাকে অনুবাদক কখনই হাল্কা বা চটুল ছন্দে অনুবাদ করবেন না। তিনি হয়ত কখনই চটুল ছন্দ ব্যবহার করতেন না। সুতরাং তাতে কবিপ্রকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। অনুবাদ করতে গিয়ে আর একরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। মূল কবিতার মধ্যে অনুবাদক নিজে ঢুকে পড়েন অনেক সময়। বিশেষ করে অনুবাদক নিজে যদি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হন। অনুবাদক অনুবাদ করতে গিয়ে নিজেই কিছু সৃষ্টি করে ফেলেন হয়তো। এটা পরিহার করা খুব শক্ত। তবু অনুবাদ সার্থক করতে গেলে তা কষ্ট করে পরিহার করা উচিত। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেক কবি সম্বন্ধেই এই অভিযোগ তোলা যায়।

'তারুণ্যের কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে একটি সকাল', 'সমকালীন', আশ্বিন ১৩৯৩

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'। ১৯৬১।

৪. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব'। ১৯৬৩।

৫. বিষ্ণু দে, 'হে বিদেশী ফুল'। ১৯৫৬।

৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'অন্য দেশের কবিতা'। ১৯৬৭।

৭. শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), 'সপ্তসিন্ধু দশ-দিগন্ত'। ১৯৬২।

৮. উৎসরচনার একটি শব্দানুবাদ দ্বিতীয় রূপান্তরটির দূরত্ব বুঝতে সহায়তা করবে : শীতকাল কবরখানায় / একটা কবরের ওপর নবজাত একটি শিশু (যে) ঠক ঠক করে কাঁপছে / কপাটে আঙুল আটকে যাওয়া একটি লোকের চিৎকার / একটা গান / একটা বাক্য / বারবার বলা / বিরতিহীন / উত্তরহীন / লোকটি তার (মেয়েটির) দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখদুটি ঘুরছে / ডুবে যাওয়া কোন একটা লোকের মতো / দু হাত নাড়িয়ে সে যেন কিছু বলতে চায়।

৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রতিধ্বনি'। ১৯৫৪।

১০. আমরা Anthony Harleley-এর ইংরেজি শব্দানুবাদের সাহায্য নিয়ে তাকে পরিবর্তিত করে উৎসরচনার শব্দগত বিন্যাসে একটা অস্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করছি :

De l'eternel azur (of / from eternal azure) la sereine ironie (the serene irony) / Accable (overwhelms), belle indolemment comme les fleurs (indolenthy beautiful like the flowers), / Le poète impuissant (the impotent poet) qui maudit son génie (who curses his genius) / Ȁ travers un désert stérile de Douleurs (through a sterile desert of Pain / a desert sterile with Pain/s).

১১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'তীর্থরেণু'। ১৯০৭।

১২. অশোক গুহ অনূদিত 'ক্যাণ্ডিড'। ১৯৫৫।

১৩. সুনীলকুমার ঘোষ অনূদিত 'ভলতেয়ারের উপন্যাস'। ১৯৮২।

১৪. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'কথা কও'। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী। ১৯৫২।

সিদ্ধার্থ রায়

—

কবি ও তাঁর শেকড়বাকড়

গোলপার্কের এক বাড়িতে, দেড়তলার ঘরে, ১৯৭৬ সালের এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণ আমাদের কাছে হয়ে ওঠে বিপুল অর্থময়। কবি অরুণ মিত্র তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শোনাবেন। ঘরটিতে ঠাশা বই, নানা বিষয়ের। তারই একদিকটা খালি করে মাদুর বিছনো। সামনে পুবমুখো দুটো বড় জানলা। অনবরত গাড়ির হর্ন, রিক্সার আওয়াজ। তারই মধ্যে অরুণদা প্রায় গল্প বলার ধরনে পড়তে শুরু করলেন। উপন্যাসটির নাম ছিল, 'শিকড় যদি চেনা যায়'। অরুণদা পড়ছিলেন থেমে থেমে। যেন নিজের উৎসের দিকে যেতে যেতে ফিরে ফিরে দেখছেন স্মৃতিময় নানা ফলক। সেদিনকার অভিজ্ঞতা মনে পড়লে আজও অভিভূত লাগে।

এখন অরুণ মিত্রের কবিতার বই হাতে নিলে অনিবার্য চোখে পড়ে, সেই শেকড় খোঁজার আর্তি ; শেকড়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে কেন্দ্রের দিকে ধাবমান অস্তিত্বের দীর্ণ যন্ত্রণা তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতা জুড়ে। বা কবিতার শরীরময় ছেয়ে থাকে এক গাছেরই আবহ, যার শেকড়বাকড় নিয়ে সে ঢুকে যেতে চায় অস্তিত্বের গভীরে। একেবারে গোড়ার দিকের লেখা 'হে হৃদয়' কবিতায় শুনেছি,

> আশা-আকাঙ্ক্ষায় জাগা খর অনুভব—
> কম্বুরেখা ওঠে তার ঊর্ধ্বে অবিরাম ;
> অভ্রলিহ চূড়া আজ, লেগেছে সেখানে
> ঈগল নখরাঘাত, বিচ্ছিন্ন পল্লব

পাখ্‌সাটে উড়ে যায়, নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
হে হৃদয়, মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে।

অনেকের মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথও তো এমনই চেয়েছিলেন। নিজের মূল কেবল বর্তমানে নয়, সমস্ত বিবর্তনে ছড়িয়ে দেবার তীব্র আকুলতা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায়, চিঠিপত্রে। যেমন, 'ছিন্নপত্র'তে: 'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। ···তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ-জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত।'

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত উপলব্ধিতে এক গভীর অন্বয়ের বোধ আছে। প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসের উল্লাস, মূঢ় আনন্দে পল্লবিত হয়ে উঠবার সার্থকতাই যেন রবীন্দ্রনাথ বেশ মনে করতে পারেন। তাঁর ভূমি সেখানে উর্বরা, প্রজননক্ষম। কিন্তু সমগ্রতার এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে ভেঙে ছড়িয়ে গেছে অনন্বয়ের বেদনায়। চেতনায় ব্যাপ্ত খরায় তখন বিষ্ণু দে বলবেন জীবনদায়ী সেচের কথা, 'জল দাও, আমার শিকড়ে'। তখন এলিয়ট বলবেন, বন্ধ্যা এক জমির হাহাকারে,

Son of man...you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket
no relief
And the dry stone no sound of water.

অরুণ মিত্রের ভূগোলও অনেকটা এমনই। চারিদিকে আর্দ্রতাহীন 'বিদীর্ণ

পাষাণ', সেই জঠরেই শেকড় চারিয়ে দিতে চায় সমস্ত সত্তা ; কারণ সঞ্জীবনী রস ছাড়া পুষ্টিহীন মৃত্যু, শরীরে, মনে, বোধে। এই অনন্বয়ই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা করে তোলে অরুণ মিত্রের শেকড়বাকড়। ওই ১৩৫০ নাগাদই লেখা 'দোটানা'য় পড়ি.

> ঘূর্ণিত পতন আছে আশেপাশে যোজন-গভীরে,
> অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-ফাটা মাটি,
> দ্বিখণ্ডিত রশ্মি হায় নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

বেঁচে-থাকার, বেঁচে-ওঠার অতি-প্রয়োজনীয় তরল খুঁজে শিকড়ে মাটি-ফাটা। প্রায় শ্বাসকষ্টের মতো বুকে লাগে। দিগন্তও আর তত নির্দিষ্ট নয়। সমস্ত পরিণাহ খণ্ডিত আলোয় এলোমেলো। কিন্তু এ এক ধরনের আত্মপ্রক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথে পল্লবিত হয়ে উঠবার যে মানবায়িত রোমাঞ্চ, এখানে তা অমানবিক পরিবেশে নিষ্ঠুর। কবি নিজেরই ভিতর অনুভব করেন নঞর্থক অস্তিত্বের এমন মার। কিন্তু লাঞ্ছনা কেবল নিজের নয়, স্বজনেরও। পঞ্চাশের দশকে, আত্মপ্রক্ষেপ ছড়িয়ে যায় কবিতার 'তুমি'-তেও। 'দুপুরের সূর্য'তে বলে ওঠেন,

> দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
> তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
> তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
> অনুভব করলাম।

এখানে 'শস্যের শিকড়ে শিকড়ে' রূপকল্পে ফলে-উঠবার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু মানুষের প্রসঙ্গে তাকে অর্থে জারিত করে তোলা যায় না। সেখানে প্রেমিকার মুখময় খরা, শুষ্কতা। এই শুকনো জমি থেকে তাকাতে হয় স্মৃতিতে, বা ইচ্ছাপূরণের দিবাস্বপ্নে, অস্তিত্বের এই হীনতায় অমরতার কথাই তো আসে ফিরে ফিরে ; পঞ্চাশের অন্য এক কবিতায় তাই সে প্রয়াস.

> ...আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভরে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিও আমার বসতি যেখানে পোড়ামাটি ইঁটের ভিতরে রস ছিল অমৃতের মতো।

তখন প্রাকৃতিক আবহ উঠে আসে নিজেরই ভিতর। মাটি হয়ে ওঠে বুকের ছাতি-ফাটা চৌচির; রাবীন্দ্রিক পল্লবিত রোমাঞ্চের সমূহ পতন। কবির অস্তিত্ব-জোড়া গহন ধ্বংসের ট্র্যাজেডি। নিষ্পত্র ভুবনডাঙায়, আত্মপরিচয় আবিষ্কারের ব্যর্থতায়, নিজের জমি থেকে প্রাণদায়ী রস আহরণের আকাশে বুকভরা আকণ্ঠ তৃষ্ণার জ্বালা; তাই কবি যখন বলে ওঠেন, 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে?' —তখন সে-উচ্চারণ হয়ে যায় এই সামাজিক পরিবেশে বেঁচে থাকার তীব্র আর্তনাদ।

গাছের ফলনে এমন আত্মপ্রক্ষেপে অবশ্য অন্য এক অর্থে বৈজ্ঞানিক প্রতিধ্বনি আছে। মাটি ফাটিয়ে শিকড়ের পৃথিবীর গর্ভে যাত্রা বা জমি ফুঁড়ে একটি গাছের বেড়ে-ওঠার সফলতা-নিষ্ফলতার আওয়াজ আছে একরকম। আর্তনাদেরই মতো মনে হয় যন্ত্রে কাঁপিয়ে শুনলে। উনবিংশ শতাব্দীতে চীনে, ইয়াং সি কিয়াং নদীর ধারে সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এক পরিব্রাজক। পাশেই বাঁশবন। স্মৃতিচারণে তিনি লিখছেন, 'কাকভোরে কানে এল এক সমবেত আর্তনাদের আওয়াজ। পাশের বাঁশবন থেকে। সঙ্গীকে ডেকে সেই হাহাকারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে আমায় জানায়, বাঁশগাছের চারা মাটি ভেদ করে উঠে আসছে আলোয়। মাটি-ফাটা সেই আবির্ভাবেরই আওয়াজ এ সমবেত ধ্বনি। উষ্ণ, আর্দ্র সকালে বাঁশগাছ এমন উল্লাসে বেড়ে ওঠে।' এই বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক বিকাশের শব্দই অরুণ মিত্রের কবিতায় বদলে যায় ট্র্যাজিক দীর্ঘশ্বাসে; বিকাশ নয়, প্রাকৃতিক খরা যেন অস্তিত্বেরই বন্ধ্যা জমি আর সেখানকার ছড়ানো অঙ্কুরের ব্যর্থ প্রয়োগে কবিরই সত্তাসংকটের প্রকাশ। সে-এলাকায়, মানসিক পরিমণ্ডলে 'বুড়ো বটের অগুন্তি শিকড় দ্বিখণ্ড' করে দেয়।

আশা থাকে, ষাটের দশকে লেখা কবিতাতেও, 'পাথরের দিন ভেঙে'—

> শহরের ধুলো
> গহন মাটির কথা বলে চলে
> যেন কোনো বীজ থেকে অপরূপ রহস্য জন্মাবে।

এক দশক বাদেও, দেখি, বলছেন,

দু'একটা ঘাসের ডগা কখনো কখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে

ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি ছাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মধ্যে রূপান্তরিত হতে দেখব।

পৃথিবীর গর্ভের দিকে যাওয়া, উৎসের প্রতি এই দুর্নিবার আকর্ষণকে ফ্রয়েডীয়রা অবশ্য বলেন, মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় ফিরে যাবার ব্যর্থ আকুতি। এতে প্রটাগনিস্টের নিজের অনিরাপত্তাবোধই প্রকাশ পায় বেশি। কিন্তু শুধু শারীরিক অর্থে মাতৃগর্ভ নয়, ইয়ুং-এর ভাষায়, সমস্ত সভ্যতার অন্বয়ের দিকেই এই ঝোঁক। ইয়ুং-এর ছাত্র এম. এল. ফন ফ্রান্‌ৎস্‌, তাঁর 'দ্য প্রসেস অব ইনডিভিজুয়েশন' প্রবন্ধে লিখছেন, 'পাইনগাছের একটি বীজেই নিহিত থাকে পরিণত বৃক্ষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বীজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মাটিতে পড়ে। সে-মাটির নাব্যতা, ঢাল, পাথর, উর্বরতা, আলোবাতাসের কমবেশি আছে। বীজে নিহিত বৃক্ষের সম্ভাবনা এইসব উপাদানের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় সূর্যের দিকে উঠে, পাথর এড়িয়ে, চরিতার্থতা পায়। একটি নির্দিষ্ট পাইনের বেড়ে ওঠাতেই বৃক্ষের সমগ্রতা ধরা পড়ে। জীবন্ত সেই পাইন ছাড়া বৃক্ষের অস্তিত্বই বিমূর্ত।' মানুষের বেলাতেও অনেকটা তেমন ঘটে, ব্যক্তিমানুষের বিকাশেই মানবপ্রজাতির চরিতার্থতা। ব্যর্থতায় সে-সত্তা অর্থহীন। কেবল তাই নয়, ব্যক্তি-হিশেবে আত্মবিকাশের, আত্মআবিষ্কারের সমস্ত যন্ত্রণা, সব সংকট উপলব্ধি করে মানুষটি তার প্রজাতির সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রজাতির স্মৃতি, প্রজাতির যৌথ নির্জ্ঞানে। অরুণ মিত্রের কবিতায়, যাপিত জীবনের অনন্বয়ে যে-বেদনা, যে-ব্যথার অনুরণন গোটা মানবপ্রজাতির বিবর্তনে শোনা যায়, সেই হাহাকার ধরা পড়ে বৃক্ষের আবহে। যেন বৃক্ষেরই সঙ্গে তাঁর সমস্ত বেঁচে-থাকার প্রক্রিয়া গাঁথা। অঙ্গাঙ্গী অস্তিত্ব বলেই, অরুণ মিত্রকে লিখতেই হয় এমন লাইন,

> তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো ; এই মাটিকে একবার তুমি আদর ক'রে ছাখো।

মাটির গভীরে শেকড় চারিয়ে গাছের ফলনের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষ হিশেবে অস্তিত্বের প্রাণরস আহরণ করার সার্থকতা উপলব্ধির চলন অবশ্য পৃথিবীর নানা দেশে, নানা সংস্কৃতিতেই। বিভিন্ন লোকগাথায় দেখি, গাছের আয়ু আর মানুষের জীবন একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা। যেন গাছ শুকিয়ে গেলে মানুষটি আর বাঁচবে না, বা, ব্যক্তিটি মারা গেলে গাছও আর থাকবে না। পশ্চিম আফ্রিকার মবেঙ্গা উপজাতির লোকেরা, একইদিনে দুটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলে, সামনে খোলা জায়গায় দুটো গাছ পুঁতে দেন। সেই মুহূর্ত থেকেই গাছ-শিশুদ্বয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। যদি গাছ মরে, মবেঙ্গারা নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে, তাহলে শিশুদুটির যে-কেউ প্রাণ হারাবে। ক্যামেরুনেও এমন প্রথা প্রচলিত। ক্যালাবারের ওল্ড টাউনে অধিবাসীরা জানেন, নদীর ধারে ঝোপের মধ্যেই তাদের আত্মা লুকনো। ইওরোপীয়রা সেই ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে দিলে সে-মানুষেরা সমবেত শোকে মুষড়ে পড়েন। কারণ তাঁরা জানতেন, মৃত্যু অনিবার্য। যেন মাটি থেকে শেকড়ে শুষে নেওয়া রসে, গাছ নয়, তাঁরাই প্রকৃত বাঁচছিলেন এতদিন। পাপুয়ানরা জানেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই একটি গাছের শরীরে কোনো নুড়ি গেঁথে দিলে গাছের বিকাশই শিশুর গড়ন-গঠন নিয়ন্ত্রিত করবে। মাওরিদের ছেলেমেয়ে হলে তাঁরা নাড়িটা নিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে তার ওপর একটা যে-কোনো চারাগাছ লাগায়। সেই গাছই শিশুর প্রাণচিহ্ন। ফিজি বা ডাচ বোর্নিও-তে অধিবাসীদের বিশ্বাস গাছের সঙ্গে তাঁদের সন্তানাদির ভবিষ্যৎ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রাশিয়া, জর্মানি, ইংল্যাণ্ডেও বা ফ্রান্স-ইতালিতেও ভূমিষ্ঠ শিশুর নামে গাছ পুঁতবার রীতি আছে। সুইটজারল্যাণ্ডের আরাগাউ-রা পুত্রের জন্য আপেল গাছ ও কন্যার জন্য ন্যাসপাতি গাছ লাগান। এডিনবার্গের কাছেই, কাসল অব ডালহৌসিতে, একখানি ওকগাছ আছে, নাম 'এজওয়েল ট্রি'। রাজ-পরিবারের ভাগ্যের সঙ্গে এই গাছ নাকি ভীষণভাবে জড়িত। স্থানীয় লোকেদের মতে, রাজপরিবারের কেউ মারা গেলে বা মৃতপ্রায় হলে, গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে পড়ে। তাই ১৮৭৪-এর জুলাইতে, এক শান্ত দিনে যখন ওই গাছের একখানি বড় ডাল ভেঙে যায়, সেখানকার লোকেরা

নিশ্চিত জানতেন, আর্ল অব ডালহৌসি ফক্স মউল আর নেই। এবং সত্যিই উনি মারা যান।

স্যার জেমস ফ্রেজারের কাছ থেকে যখন আমরা এই তথ্যগুলো জানতে পারি যে, গাছ ও মানুষের বিকাশকে পৃথিবীর নানা জায়গায় কত গভীর বিশ্বাসে ওতপ্রোত করে তুলেছে মানুষ, গাছই মানবায়িত হয়ে ওঠে এক সময়, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না, নিজেকে গাছ হিশেবে ভেবে অরুণ মিত্র যে অস্তিত্বের শেকড় নামাতে চান আমাদের ঐতিহ্যে, ইতিহাসে, সমাজে, সে কেবল আলগা ভাবনা নয়। তা এই মানবজাতির এক গভীর বিশ্বাসের অচেতন বা মগ্নচেতনের সূত্র ধরেই যৌথ স্মৃতিতে আমাদের কাছে আসে। আর সামাজিক জমি থেকে রস আহরণের সাফল্যেই যেন নিহিত প্রেমের সার্থকতা, অর্থময় ব্যবহার ; পৃথিবীকে নতুন করে দেখবার দৃষ্টি খুলে যায়। 'ভাঙন' কবিতায় পড়ি তাই,

> টিমটিমে বাতিটা তুমি অষ্টপ্রহর আগলাতে
> সেটা অপরিমেয় গহ্বরে তলিয়ে যায়,
> তোমার মুহূর্ত-আলোর মুখ বুঝি অদৃশ্য হয়
> কিন্তু না
> তোমার অনির্বাণ কথার উজ্জ্বলতা নিয়ে
> আবার অপরূপ ফোটে,
> একটা ছেঁড়াখোঁড়া কাঁচা শিকড় রাত্তিরকে জড়িয়েছে
> তারই উপর তোমার মুখের নক্ষত্র :
> সেই আমার নতুন চোখ আজ।

অরুণ মিত্র 'দুই বছর' কবিতায় যখন বলেন, 'বুলার দুটো বছর সেই জমিটাকে শিকড় দিয়ে আশ্চর্যভাবে বেঁধে ফেলেছে', তখন গাছ আর শিশু আর জীবন আর প্রকৃতি মিশে একাকার ; একেবারে হালে, আশির প্রথম দিকে লেখা কবিতাতেও মানবায়িত বৃক্ষস্বভাবের ঝোঁক যায় না, বরং তা চারিয়ে যায় অনেক গভীরে। যে নতুন দৃষ্টির কথা 'ভাঙন'-এ শুনেছি, 'যে এসেছে' কবিতায় সে-কথাই আসে অন্যভাবে,

> কই আমার তো অন্ধতা নেই, আমি

চোখ রগ্ড়ে দেখতে পাই রাস্তার উপর
আর একটা জলজ্বলে দিন,
পাতাগুলো বাতাসের গায়ে
বাঘবন্দী ছক কাটে, যত ঘাম ঝরেছিল
যত মূর্ছা ছিল শুষে নিয়েছে শিকড়,
সবুজে এমন ধার ঝল্‌কে ওঠে
যেন আকাশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে
অথবা স্পর্শের হাত রক্তে ভিজবে।

প্রটাগনিস্টের কাছে যে আসছে বা এসেছে, সে যদি উন্মূল হয়, যদি তার কোনো শেকড় না থাকে, তবে তার অস্তিত্বও যেন অস্পষ্ট, অর্থহীন তার অস্তিত্ব,

যে এসেছে সে খুব আপনার লোক
অথচ সে আপাদমস্তক অস্পষ্ট রয়েছে।···
সে কি তবে মাটি না ছুঁয়ে এসেছে ?

শুধু প্রেমিকাই নয়, শিল্পায়নকেও কবি মিলিয়ে নিতে পারেন না বীজ-মানুষের একাত্মতায়। তারা মেলে না কবির চেতনায়,

আমি বীজের সঙ্গে
মানুষের সঙ্গে
এই ইস্পাতকে কি ক'রে মেলাই ?

অর্থাৎ কবি হিশেবে অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে, চেতনায় যত সমৃদ্ধ হচ্ছেন তিনি, অতীতের স্মৃতিময় পরিপ্রেক্ষিত যত দীর্ঘ হচ্ছে, তত বেশি করেই অরুণ মিত্রের নিজস্ব ভূগোলের অরণ্যায়ন বাড়ছে ; যেন এক বিশাল বটের ঝুরির মতো তিনি শেকড় নামিয়ে দিতে চান চারপাশে, বেঁচে থাকার শেষ রসবিন্দুও যেন শুষে নেওয়া যায়। নিজের ফলনে এমন আর্তি, এমন গভীর উৎকণ্ঠা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে বিরল। পর পর কবিতায় তার প্রত্যক্ষ প্রতিধ্বনি।

১. ভিত পর্যন্ত শিকড় নামতে নামতে অন্ধকার কতখানি গভীর হবে কে জানে।

'রাস্তায়'

২. চরের শিকড়ে শিকড়ে রোদ নামে বৃষ্টি নামে
রক্তের অলিগলি বেয়ে নামে,
বুকের পাটা জুড়ে ভবিষ্যৎ সবুজে ঘনিষ্ঠ সূর্যে।

'গম্ভীর শহরে'

৩. আমি যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়েছি
সেখানে শিকড়ের উসখুস

'আমি যেখানে'

৪. মাটির সঙ্গে বাঁধন আর একটা চারার সঙ্গে অমনি ক'রে বীজ পর্যন্ত টেঁকা, কোনো কথার গর্জন নেই কাতরান নেই নাবাল জমিতে ওই এক ধুকধুক।

'বিরতি'

৫. আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দুএকটা বীজ ভিজে ওঠে

'নিসর্গের বুকে'

আসলে, পরাধীনতা, দেশভাগের ছিন্নমূল অস্তিত্ব, স্বাধীনতা, রাজনীতির টানাপোড়েনে অরুণ মিত্রের এই দীর্ঘ জীবন এখন সংহত আবেগের ভূমি। তাঁর জীবন জুড়েই বিধৃত ইতিহাস। আর এই ঐতিহাসিকতায় আত্মপরিচয় খুঁজে যান তিনি, বৃক্ষের স্বভাবে। সে-স্বভাব তাঁর কাছে প্রতীকী। অথচ সময়ের বদলে সামাজিক ভূমির নিবিড় রস শুষে নিয়েছে অর্থনীতি, শিল্পায়ন, জীবনের নানা বাস্তবতা। তাই নতুন আর্থিক নিয়মের অঙ্কেই তৈরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনিরাপত্তাবোধ অরুণ মিত্রের কবিতায় ছেয়ে আছে। সে অনিশ্চয়তা উনি কাটাতে চান কখনও কল্পনায় ঈপ্সিত কোনো ভূগোলের স্বপ্নে নিজেকে যুক্ত করে, কখনও বর্তমানের অসম্ভব সংকটে সে অসহায়তার যন্ত্রণা জানিয়ে। তাঁর শিকড় স্বভাবতই এই দুই মেরুর মাঝখানে ঘুরে চলে। এই টেনশনের এক অনিবার্য দহন আছে। সে দহনে খাক হয়ে যায় বুক। অরুণ মিত্রের কবিতায় সেই জ্বলন। খরাক্লিষ্ট মাঠে একটি অসহায় গাছের মতো শিরা-উপশিরা-কাণ্ডে-শিকড়ে তৃষ্ণার শুষ্কতা নিয়ে, মাটি-ফাটিয়ে মূল কেন্দ্রের দিকে ধাবিত করে, সমস্ত দহন নিজেরই ভিতর সইয়ে, এখনও অরুণ মিত্রের প্রধান জিজ্ঞাসা, 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে'।

সিদ্ধেশ্বর সেন

—

পাথরে ঝর্নার ছোপ পাথরে গুঞ্জন

কবি অরুণ মিত্র সেই বিরলতম জ্ঞাতা-র একজন, বহু আগে থেকেই, তিন দশকেরও ওপর তো হবেই, আমাদের বলে আসছেন, 'তবু আশ্চর্যকে জেনো'।

বলেছেন, 'জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।' এটা বলা তাঁর 'অমরতার কথা'য় ('উৎসের দিকে')।

বলছিলেন, 'তার চারপাশে আদ্যিকালের গল্প···'।

কীভাবে, 'আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে' এইসব আবিষ্কারের গরজ জন্মেছিল, সে কাহিনীও: 'চলো, ঝর্না কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে পাহাড় বন মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম।··· তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। ···তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজখবর আমাদের দেবে'।

এ পর্যন্ত।

ঠিক এর পরের উক্তিতেই কি কবির বলায় সংশয় বাসা বাঁধছিল? তাতে আবার লিখতে হল: 'কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্য-মনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।'

'অন্তরঙ্গ'তে তবে কি তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমরা? 'অন্যমনস্কতা'? মনোযোগের কোনো তারতম্য তখন কি তাঁর নজরে পড়েছিল?

তাই ফিরে-ফিরে তাঁকে এমন কথাই বারবার বলে যেতে হচ্ছিল : 'এই এতগুলো পাতা আমি জড়ো করেছি, এত ডালপালা। দ্যাখো তো এরা তোমাকে আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।'

সেই 'কপালের রক্তচিহ্নটা', যা দেখে এক-একবার অভিভূত হচ্ছিলেন কবি, বললেন, 'তুমি হয়তো বুঝবে। মানুষের লক্ষণগুলো তুমি হয়তো ঠিকঠিক জেনে এসেছ।'

মানুষ চেনবার ও চেনাবার একটা ঝিলিক কি জানান দিচ্ছে ? কিন্তু কেন ?

বোঝালেন, 'তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো…'।

কোনদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে চাইছেন কবি ?

এতক্ষণে আমরা 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' পৌঁছে গেছি। এ বইয়ের প্রকাশকাল ১৯৭০। এই কথাটা, তাঁর কবিতাশরীরের ওই মর্মাত্মা প্রকাশ-মান হচ্ছে যখন, সেটা 'উৎসের দিকে'র কাল। এ বইয়ের আদি সংস্করণ ১৯৫৪-য় পরিবর্ধিত হল ১৯৫৭-তে। তার মানে তখন প্রায় ষোলো থেকে পরে আরও উঠতি বছরের মধ্যে ওই আলোটা ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মাঝ-খানে 'ঘনিষ্ঠ তাপ' বেরিয়ে গেছে ১৯৬৩-তে। 'অন্তরঙ্গ' কবিতার উদ্ধৃতি সে-বই থেকে। 'উৎসের দিকে' থেকে তার ব্যবধান ন বছরের। 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' আবো সাত বছর পরে। অর্থাৎ তখন প্রায় দু-দশক ধরে তাঁর কবিতায় আসা-যাওয়া করছে ওই অত্যাশ্চর্য !

কথাটার শেষ হয় না, শেষ নেই বলে।

এর পরে, আরো অনেক পরে, প্রতিবারের মতোই এই কবি একেবারে হালেরও, ১৯৮৬-র সমকালীনতার জমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সপ্তম ও সাম্প্রতিক-তম কাব্যগ্রন্থ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ পৌঁছে, ভিন্ন প্রেক্ষিতে আরেক প্রাসঙ্গিকতায় চিনিয়ে দিচ্ছেন আমাদের 'সময়ের খাতে'র কথায়, 'আকাল', 'দৈববাণী'র কথায় : 'ওই দ্যাখো সঙ্কেত কখন থেকেই উঠে আছে'।

তিনি তখন এলাহাবাদে অধ্যাপনায়,—আগেও বলেছি, অনেক দিনের কথা—স্নেহ ও আলাপপরায়ণ, তাঁর সেই ছোট্ট ছবির মতো বাড়িটি থেকে (আমার তাই মনে আছে) এগিয়ে দিতে দিতে কবিতার কথায় এসে বলেন : এই ছোট্ট গাছটি যেমন (রাস্তার ধারের একটা হেলানো শাখার), তার ছায়ার মধ্য দিয়ে যাবার আগের ও পরের একই মানুষ কি একটু বদলে যায় না ?

কবি অরুণ মিত্র দীর্ঘ সাড়ে-চার কি কাছাকাছি পাঁচ দশক—প্রায় আমাদের কাব্যের অভিজ্ঞতা।

তুলনাহীন তাঁর চলা।

সেই 'যাত্রাশুরু চলা'—কবির নিজের ভাষাতেই, এতটা 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ এসে পিছনের কতটা, মনে করেই কি লিখছেন : 'যাত্রাশুরু চলা—অক্ষরের ভিতরে এত রক্তপাত ফুটন্ত শিশির এত তাত বাড়ন্ত ছায়া …যাত্রাশুরু চলা—সব অক্ষর আমার কব্জির দপ্‌দপ্‌ নাড়ীতে আমার বুকের জখমে আমার পাগল সমুদ্রে…'

এ তো শুরু হয়েছিল তাঁর প্রথম বই 'প্রান্তরেখা' থেকে। ১৯৪৩-এ প্রকাশ। কবিতাগুলি রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল তার বেশ আগে থেকেই। সে এক প্রবল সময়ের সাড়া। সেটা চল্লিশের দশকের টালমাটাল, দেশ-কাল সচেতনতার (মনে পড়ে, কিছুটা আগে-পরে বিষ্ণু দে-র 'সাত ভাই চম্পা' ও 'সন্দ্বীপের চর'-এর পর্ব—'লোকায়তে বাঁধো লোকোত্তরের তীর্থ প্রসাদ', সুকান্তের তপ্ত-মথিত, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি', 'পদাতিক'-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জনযুদ্ধের গান')।

আমরা তখন সবে কেউ কৈশোর বা কৈশোরোত্তীর্ণে। তিনি তরুণ যুবা। সে-কথায় পরে আসছি। তবে বলে রাখতে হবে আজকের যে অরুণ মিত্রের অনন্যতা, সে-কণ্ঠস্বর তিনি বাংলা কবিতায় যোজনা করছেন 'উৎসের দিকে'র থেকে। 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩) ও 'উৎসের দিকে'র (১৯৫৪) প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দশ বছরের। যদিও ১৯৪৪-৪৭ সালের মধ্যে আরও কিছু কবিতা লিখেছেন। পরে বিদেশপ্রবাস ১৯৪৮-৫১, ফরাসি দেশে, অধ্যয়ন ও সাহিত্যগবেষণা নিয়ে। স্বভাবতই,

ওই সময়টা আমরা তাঁকে পাই নি। পেলুম একেবারে ১৯৫৪-র দ্বিতীয় বইতে, ১৯৫১-র থেকে লেখা ও 'স্মরণকাল'-এর কবিতাগুলি যার অংশ। পেলুম ও তিনি এলেন আমাদের আরেকভাবে জিতিয়ে দিতে।

'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮) কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৯-তে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার'-এর সম্মাননার উপলক্ষ হল। তাঁর লেখার বয়স তখন (গ্রন্থের প্রকাশকালের হিসেবে) প্রায় ৪০ ছুঁই-ছুঁই এবং তাঁর নিজের শারীরিক বয়সও প্রায় ৭০-এ পা দেবার। সে-সময়ে, 'পরিচয়'-এ (১৯৭৯) সে-প্রসঙ্গে লিখেছিলাম : তুলনাহীন তাঁর চলা। এতদিনে পুরস্কার তাঁর নাগাল পেল।

'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর পর ১৯৮০-তে, এখনও পর্যন্ত তাঁর শেষ ও সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থটির আগে। তাঁর পারাপারের নৌকাটিতে ফসলের খুব ভার কি ? কিন্তু সব ফসলই এত স্বর্ণ পাকা ! আমাদের তা মনের অন্ন, স্বাভাবিক, অনিবার্য বাড়তির দিকে পুষ্টি : 'সেই যৌতুক আমরা চাই / অন্ধ জীবনের কাছে…' ('ছয় ঋতু সঞ্চয় করি')।

আর তাঁর হাত থেকে যৌতুক, জীবনেরই যৌতুক, কিন্তু তাঁরই হাত-ফিরতি হয়ে তা নিতে তাঁর কাছে আমাদের যাওয়াটাও হয় বড় কিছু আবিষ্কারের মতোই। মনে হয় বুঝি বেশ সহজ ; কিন্তু অরুণ মিত্রের কবিতা আপাত সহজের আড়ালে আমাদের এক কঠিন বিপন্ন সময়ের আর তা থেকে উৎরে জীবনের স্বতোৎসারিত এক নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে পাথরে এই নির্ঝরের মুখ, সে কিন্তু শক্ত নিখাদ পাথরই। এক প্রচ্ছন্ন অথচ খর দ্যুতিতে তাঁর কবিতা অনেক কিছুই তখন আমাদের দেখে-জেনে নিতে বলে। আর এই কবি এক প্রগাঢ় মমতায় আমাদের সেই ধরাছোঁয়ার জগৎটিতে পৌঁছে দিয়ে যান।

কবি অরুণ মিত্রের জগৎ এই ধরাছোঁয়ার জগৎই, এবং আরও বলি, তার হঠাৎ চকিত উদ্ভাসনের। আধুনিক বাংলা কবিতায়, এইখানে তাঁর জুড়ি নেই। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বিশেষ করে স্পর্শগ্রাহ্যতা। মাপা-বাঁধা ছন্দের বাঁধনটি শেষ পর্যন্ত তিনি খুলে দেন ('প্রান্তরেখা'-পর্বের

অক্ষরবৃত্ত ঘনবদ্ধ সনেট চতুর্দশপদী অষ্টাদশপদী বা নিপুণ মাত্রাবৃত্তের), চলে আসেন বাক্‌প্রতিমার গদ্যছন্দের আটপৌরে, ঘরোয়া এক বিন্যাসে, অন্তরঙ্গ কথকতার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার এক আশ্চর্য রূপবদল ঘটিয়ে দেন, কবিতার পঙ্‌ক্তি বদলে যায় গদ্যের অনুচ্ছেদে, 'মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে / তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।'

অথচ এই বিশ্বাস তাঁর ও সেইসঙ্গে আমাদের অনেক ভাঙ্‌চুরের পথ বেয়ে আসে। সেই যে গোড়ার দিকে আমাদের তিনি দেখিয়ে দেন : 'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার', কি ভূমিকায় লেখেন, 'তীক্ষ্ণ বাঁশীতে সুর কেটে গেছে সকালবেলা — / রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো'···শোনেন ও আমাদের শোনান 'কসাকের ডাক', কিন্তু তার কিছু পরেই 'শিশুর কান্নার ঘর', যেখানে, 'এ কী ভাষা / মৃতবৎসা পৃথিবীতে / এ কী আশা / শিশুর কান্নার ঘরে', কিংবা 'পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয় / জলে ভিজে,/ দৈত্যের প্রকাণ্ড লুব্ধ মুঠির আকারে' ('বর্ষমাণ'), অথবা 'পুরোনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বাঁচে···' ('এ জ্বালা কখন জুড়োবে'), 'প্রতিমাগুলো বয়ে এনেছিলাম / মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে / তারা এখন ভাঙল···', আমরা এসবও দেখতে পাই।

'উৎসের দিকে' থেকেই আমরা সেই প্রার্থনাময় পদবন্ধ পেয়ে যাই : 'আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি / তুমি প্রসন্ন হও···আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি··· / তুমি প্রসন্ন হও' ; সমর সেনের তীক্ষ্ণ নাগরিক ধার, ধূসরতা. 'সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন'-এর উঁকি সত্ত্বেও. সে-নেতির শ্লেষের বিপরীতে অরুণ মিত্রের মাটি-ছোঁয়া দুর্মর আস্তিকতা আমরা জেনে নিই।

তিনি এর পরেও আমাদের দেখাবেন যে জগৎ, যেখানে 'আমি এক পলকেই দেখে নিই / ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর / ভরসার সমস্ত দুর্গ / কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধূলিসাৎ করে' ('আমার কাছে বদলে যায়'). আমাদের আশ্বস্ত করে বলবেন 'আমি হাটে হাটে ভেসে এসেছি / মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি,' মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন 'এই তো নিশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ' ('আর এক আরম্ভের

জন্য'), তখন আমরা বুঝে যাই যে এই কবি আমাদের দোসর মেনেছেন, সঙ্গী করে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁর সেই ধরাছোঁয়ার আর-এক জগতে, প্রত্যক্ষতাই যেখানে তার নির্যাস।

ধরাছোঁয়ার জগৎই তো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর কেবলই তা ছাপিয়ে যাওয়া, যেমন করে তিনিই একমাত্র বলতে পারেন 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে বলো। আমার স্নায়ুতন্তু-ধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ করে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন করো এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বকমুখের অন্ধকারে রাখো তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাবো।…দু-একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি দ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাবো।' ('প্রাজ্ঞের মতো নয়', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এ অসাধারণ কবিতার প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলাম। অরুণ মিত্রকে আমি 'জ্ঞাতা' বলতে চেয়েছি। কারণ তাঁর কবিতা এখন আমাদের যে-জগতে এনে ফেলেছে, সেখানে আর সবই বাহুল্য, শুধু এই তীব্র মুগ্ধতা, 'মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধহয় কোনো এক সময় আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন করে গড়ে দিতে পারবে?' ('বৃষ্টির দেশ থেকে এলে')। বলছেন, আমরা প্রায় স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে এখন কবিকে না শুনে পারি না :

'…সময়ের গম্বুজের নিচে আমি দাঁড়িয়ে
পাথরগুলো খুঁটিয়ে দেখি
যদি কোনো ঝর্নার ছোপ কোথাও লেগে থাকে,
তাদের উপর বার বার কান রাখি
যদি তারা গুঞ্জন করে।…'

'উন্মুখ', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'

তাহলে কী ! ঝর্না নেই, কিন্তু তার 'ছোপ' পাথরে লেগে । জলধারা নেই, কিন্তু তার অলুপ্ত 'গুঞ্জন' ।

তুলনায় নয় । তবু এ যুগের দুই প্রধান বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দের কাছে এই ঝর্না ও জলের প্রতীক-অনুষঙ্গ কীভাবে আসে তা কি আমরা একবার জেনে নেব ?

বিষ্ণু দে তাঁর 'অন্বিষ্ট' কবিতায় (১৯৪৭-৪৯) :

'...সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যাহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না...'

এ তো বহু বর্ণালির নির্ঝর, 'রঙের ঝর্না' আর 'বাঁচার বিস্ময়ে' অগাধ তার ছড়িয়ে পড়া ;—আর, আত্মসচেতনতার তীব্র অভিযানে 'গোবি মরুভূতে এক যাত্রা', '...মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধ মেরু' সেই তাঁর চির উজ্জীবনের 'জল দাও আমার শিকড়ে' ।

'বেলা অবেলা কালবেলা'র জীবনানন্দে :

'...আঁধারের থেকে...
...ভেদ করে শোনা যায় শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি'—

তখন সব ঝরন-ধ্বনি নিয়েই আমাদের আরোগ্য চেয়ে নির্গলিত হতে চেয়েছে ।

ষাট-সত্তরের অরুণ মিত্রে সে-ঝর্নাই নেই । কিন্তু, তাই-ই আবার আবিষ্কারেরও লক্ষ্য । আমরা বেরিয়ে পড়েছি তারই খোঁজে । তার শুকিয়ে যাওয়ার দাগ দেখতে পাওয়া গেছে প্রত্যক্ষ পাথরের গায়ে, সেই 'ছোপ' যেখান দিয়ে ঝর্না বেরিয়েছিল । কান পাততে হয় আজও তার 'গুঞ্জন' রয়েছে কি না শুনতে, আবার সেই পাথরেই ! একই প্রতীক-অনুষঙ্গ আমাদের এই তিন কবির ব্যবহারে চিনিয়ে দেবে আমাদের সময়ের বদল, কবিতা ও অনুভূতির যোটক তার তীব্রতা, একই সঞ্জীবনীর খোঁজ এই রূপান্তরের জগতে । কিন্তু কতই ভিন্ন করে তার সন্ধান !

অরুণ মিত্র নিজেও জানতেন সে-অনিবার্যতা : 'জল টের পাবার স্পর্শ

নিয়ে এক দুর্বোধ্য ঋতু / নিরুদ্দেশে গেল…আর দেরি কেন / দাও আমার কপালে যন্ত্রণার রাজটীকা দাও / আমার জন্যে এই সময়ই তো নির্ধারিত হয়েছে' ('দূর দূরান্তের পর')।

হতবাক হয়ে যাই আমরা কবির এমন করে সব বলতে থাকায় : 'এই কথার পর ঘুনধরা হুড়কোটা নামিয়ে আমরা বেরোই।…এক এক জায়গায় রোদ জমে জমে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চীৎকারের এক বিশাল প্রপাতের সামনে গিয়ে পড়ি।…শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আকাশ রাঙা। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নম্র হয়ে আছে, তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মগ্ন গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু জমছে।'……('ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')।

এই বইয়েরই আরেক অংশ 'বেনামা সময়ে' আমরা তাঁর কাছ থেকে 'উপরে-ওঠা' 'পুতুলনাচ' কি 'মুখোশ খুলে রেখেছি'র মতো ('আমি মুখোশ খুলে রেখেছি / এখন আমি তোমাদের মতো নই') তিক্ত তির্যক কিছু কবিতা পাই বটে, কিন্তু 'ঘরের পৃথিবীতে' এসে আমরা আবার ফিরে পাই তাঁর সেই প্রশান্তি, বুলার দুটো বছরকে ঘিরে, 'খরজ বদলে বদলে নতুন সুর। কথার রাজ্যে টলমল করতে করতে যে পা দিয়েছিল, সে যেন এক জাদুকরী।'

এই অরুণ মিত্র। 'শুধু রাতের শব্দ নয়' বইতেও তাঁর নানা মেজাজের কবিতা, যেমন 'স্বস্তির কথা কে বলে' ('আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে ? দ্যাখো না আমার হাসিমুখ বুলা হঠাৎ হঠাৎ কি যন্ত্রণায় মূর্তি হয়।'), যেমন 'দেয়ালের বাইরে' ('আমি আঙুল মুঠো করে ইঁটের উপর মারছি আর আমার বুকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে'), যেমন 'সাইকেলে ভর করে' ('যতবার সে উচ্চারণ করেছে "ব্রাউন" ততবার তার চোখমুখ বিরল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে')।

কিন্তু 'গর্জনের সামনে' কবির সেই চলাটিকেই আবার আমরা দেখতে পাব যেখানে তিনি বলে যাচ্ছেন, 'আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি ?

যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ওই তারা এখন কাঁপছে, আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।'

অরুণ মিত্রের চলার বাঁকে বাঁকে এমনি সব চরিত্রপাত ঘটে। নিকট-সম্ভাষণে 'তোমাকে' 'তুমি', 'বুলা'র শৈশব, কিংবা তাঁর শেষতম 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ এসে 'কামিলার দিনরাত'।

কত দূরে তাঁর যাওয়া, কত ''নিসর্গ' মাড়িয়ে ? কোন 'ঝড়ের কেন্দ্র' ঘুরে ? অনেক বড় কবির কবিতার নন্দন তাঁদের কাব্যেই নিহিত থাকে। এই অরুণ মিত্রই যেমন বলেন, তাদের আলাদা করে আর আমি বলতে পারি না।

একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, একটিই কবিতা লিখিত হওয়ার কথা সারাজীবন। 'আওয়াজ আসছে সাতরঙে অন্ধকার ফাটছে টাটকা গলায় গান না কান্না···কিছুই স্তব্ধ নয় এই ফের আরম্ভ।' কিংবা 'এক সুত এধার-ওধার এই শোক এই আহ্লাদ / আর সমস্তক্ষণ ছিলেটান জাগা।' ('অপেক্ষা')

'প্রথম পলি শেষ পাথর' বইতে তাঁর স্বীয় প্রকরণ, লেখনশৈলী, পদ্য-গদ্যের সীমালোপ, বিষয়টিতেও আসেন ; 'কিন্তু কে আমার ভর নেবে ? গদ্য ? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়।···তার প্রশ্রয়ে এক এক সময়, কী যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চলকে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভিতর প্রক্ষালিত হতে থাকে। অবিশ্যি হাড়ের ঠকঠকানিও ওঠে। তবু তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।' ('পুরোনো নতুনের টানে গদ্যপদ্য')।

কিন্তু এই গদ্য অরুণ মিত্রেরই নিজের কবিব্যক্তিত্বের খুব অংশ, আমার ধারণা। অনেক চলতি আকাঁড়া শব্দ অবশ্য তিনি তুলে নেন, নুড়ি যেমন করে লোকে তুলে নেয় প্রস্রবণের ধার ঘেঁসে চলবার বা পাহাড়ি ঝোরা পার হবার সময়। বা নদীমাতৃক দেশের পলিমাটি, মানুষ তাঁকে এই অফুরান তাজা শব্দের যোগান দেয়। তাতে করে তাঁর কবিতার স্বর কখনোই সদ্য হয়ে-ওঠা না হয়ে পারে না।

'শব্দ' কবিতায় নিজেই বলেছেন : '...এমনিই টান। কবে জল পড়ছিল পাতা নড়ছিল শব্দ গড়াচ্ছিল চালের বাতায় ছুঁয়ে আসছিল পুকুরপাড় ঘেঁটুঝোপ আমি মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে ভেসে গিয়েছি মাঠের চিৎকারে সন্ধেরাত্তিরের ফিসফিসে গেঁয়ো মেলার ডাকে মার ঘুমপাড়ানিতে। রক্তের শিকড় অভিধান থেকে নেমে প্রথমভাগ থেকে নেমে...'।

এই শেষ দু'টি কাব্যগ্রন্থেই, বিশেষ তাঁর এখনও পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ পৌঁছে দেখছি তার গদ্যও বদলে গেছে, বাক্‌রীতি, গঠনক্রিয়া, গদ্যের মধ্যে এমনকী গান ঢুকে যাচ্ছে ('দুইঠাট'), গদ্যছন্দের মধ্যে ঢুকে পড়ছে গতিহীন ব্যাকরণ-পালানো গদ্য বা ভেতরে ভেতরে পদ্য-ধ্বনির মিলমিশোল ইত্যাদি, যাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি নিজেই আঁচ করতে পারছিলেন : 'তাদের এ ইন্দ্রজালে আমি ভিড়ে আছি তারা আজ ফুরন্ত দুপুর বিকেল আমাকে অনবরত বাজিয়ে দিচ্ছে।' বলছেন কি 'ফুরন্ত', তবে? পঁচাত্তরে পা আমাদের এই অফুরান 'উৎস'র অবাক-মানা, অবাক-করা কবি!

এমনকী বুক পেতে যে আঘাত নিচ্ছেন, সইছেন, ক্ষয়িত পরিপার্শ্বের আরও ক্ষতিক্ষয় বিকারের, বিনাশের মুখভঙ্গী দেখে দেখে যে 'মলাট খুলতেই বেরিয়ে এল চেনা মানুষ আর চেনা রাক্ষস', এই প্রশ্ন তুলছেন, 'চেনা কেন, তবে কি আমি মৃতদের মধ্যে রয়েছি? চেনা কেন, তবে কি আমি অবিনশ্বর মানুষ ও অবিনশ্বর রাক্ষসদের মধ্যে রয়েছি?' ('ছবিগল্প')।

তবু, তাতেও যে, প্রায়-রিক্তের, সবহারার, খোয়ানোর নির্মোহ স্বগতোক্তি কবি করছেন, উলটোভাবে তাও কি তাঁর কাছ থেকে আমাদের বাঁচার রহস্যময় আশ্বাস ও আশ্রয়ের মতোই এক ঠাঁই-পাওয়া হয় না!

: 'আমি এত বয়সে গাছকে বলছি
তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
হাঃ হাঃ আমি গাছকে বলছি...
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হাঃ হাঃ আমি নদীকে বলছি...

খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দু'একটা বীজ ভিজে ওঠে
হাঃ হাঃ যদি দু'-একটা — ···
ঝিঁঝিঁ হুতোম প্যাঁচা শেয়াল
অস্থায়ী আর অন্তরায় রাত শুনছে
আমি বলছি এক মাঠ ধান···
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

'নিসর্গের বুকে', 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'

—অবিশ্বাস্য! কতখানি বুকফাটা, ফাঁকা, বুকের ফোকরের কতটা শূন্যতা উপুড়-করা হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওই বিদারণ! তবু তাই-ই আমাদের রক্তে ভিজে-ওঠা বীজ, মাঠ আর ধানের কথা শোনাতে পারে! অরুণ মিত্রের কাছে বসে এইসব কবিতার পাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা হয়তো জেনে গিয়েছেন এই কবি ও তাঁর কবিতা,—অভেদ।

ওই 'প্রান্তরেখা', কী তিরিশের প্রান্ত ছাড়ে বলেই! তারপর চল্লিশ, পঞ্চাশ, দশক-দশক উজিয়ে, 'উৎস' থেকে—পাহাড়-পাথর-উপল ডিঙোনো স্রোতোমুখে এই আশি'র উচ্চাবচ উপান্তে পৌঁছে!

স্বতই, সে উৎসারণের সরল-অসরল ও ঘুরপথটি যতটা তাঁরই দেখানো-চিহ্ন ধরে ধরে, জ্ঞানত সরে না গিয়ে, আমার মতে সে প্রবাহের মূল একটি ধারাকে আমি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, এতক্ষণ। আমার মতো করে।

আমার মতো করেই কবির কথিত 'অন্ধ জীবনের কাছে যৌতুক' বুঝে নিতে হাত বাড়িয়েছিলুম।

সে-ই প্রথম কতটা জেনে কত না জেনে, অঞ্জলি পেতেছি—মার্জনীয় হবে বোধ হয় এখন আমার কিছুটা ব্যক্তিগতভাবে এই বলা—সেটা ছিল আমাদের অগ্রজদের—বিষ্ণু দে, সমর সেন, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়—এঁদের এবং কবিকনিষ্ঠ সুকান্তের সেই চল্লিশ,—ঠিক ঠিক বলতে গেলে, আমার পক্ষে, মাঝ-চল্লিশের গমগমে কাল। সেটা আমাদের গড়নের মুখ।

১৯৭৯-তে 'পরিচয়'-এ আমি একটি কবিতা লিখি 'ঘুঙুর', দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কাহিনীকে রূপকাশ্রয়ে নিয়ে ও রূপক ভেঙে, তাতে ব্যক্তিস্মৃতি উথলে ওঠে এই শতকের ইতিহাসের ওই অন্তর্বহির্মুখী সন্ধি-র দশকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় : 'চারিদিকে বিদ্রোহের দিনপঞ্জী লেখার গৌরবে / কবিকিশোরের / …আকালেও / নবান্ন-উৎসবে, অবেদিন-স্কেচে, সন্দ্বীপের চরের / মৃত্যুহীন / নবজীবনের মতোই জাগ্রতের গানে· ·/ তিন-পুরুষের আশ্লেষ মেনে / —এমনকী কবিতাভবনেরও কবিতার / নিরিখের তর্কে— / কসাকের ডাকে—…'।

আমি তখন এ-ও জানতুম না, অনেক পরে জানতে পারি ও স্নেহ পাই অগ্রজ কবি অরুণ মিত্রের (যেমন বিষ্ণুবাবুরও পেয়েছিলুম), ১৯৪৫-এর এপ্রিলে 'অরণি'তে এই তখনকার-অজানা একজনের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি 'প্রস্তুতি', প্রকাশ পায় তাঁরই হাত দিয়ে, 'অরণি'র কবিতা দেখার দায়িত্বে তখন তিনি। (শুধু আমার নয়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও কবিতা প্রথম 'অরণি'তে তিনিই ছেপেছিলেন, এ কথা বলতে ভালোবাসেন কবি)।

কবিতাভবনেরও কথা ওঠে, কারণ সে-সময়, সেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক আন্দোলনের, প্রগতির-ই দৈবে ও সাড়ায় বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (প্রথম সংস্করণ) তখন আমাদের হাতে এসে পৌঁচচ্ছে (তাঁর 'কবিতা'য় আমার লেখা বেরিয়েছে সেই '৪৫-এই, অক্টোবরে),—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ-করা সে-সংকলনের সম্পাদকদ্বয় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত দুটি পৃথক ভূমিকায়—বিশুদ্ধ না ফলিত, কাব্যতত্ত্বের এই নান্দনিক বিতর্কসমেত। সে-পর্ব কবি অরুণ মিত্রের জানা।

সে-সময় 'কসাকের ডাক', 'ভূমিকা', 'লাল ইস্তাহার', 'আন্তর্জাতিক'-এর কবি অরুণ মিত্রের অনেক কবিতার ছত্র আমাদের মুখে মুখে ছিল এবং এরকম বাক্যবন্ধের স্মরণীয়তা : 'পক্ষাঘাতের শিলা গেল খসে / বাহুপদ ঝঙ্কার', 'ঘূর্ণির ফুৎকার ভরা উচাটন', 'ম্যাজিক / বাতির দুর্বল ছায়ানাচ,'

'জলন্ত মশালমুখ', 'কঙ্কালমুঠি বাড়াও। / নির্বোধ দ্বিধা···', 'জনসাধারণ অসাধারণ' এবং এরকম আরও প্রবচন।

তাঁর এইসব স্ফুরিত বাক্যবন্ধে তো তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছিলুম এক-একটা সমর্থক ভঙ্গিই যেন, যেমন সংকল্পিত কেউ পা মিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—'পদনখে উড়ালাম ধুলা', হাত-পায়ের ছন্দ বাজছে—'বাহুপদ ঝঙ্কার' বা এইরকম ; চল্লিশের সমাজ-সচেতনতায় কবিতার বিষয়মুখী শব্দটানের এক-একটা রূপ। কবিরা অংশ নিচ্ছেন সমাজ ও চেতনার রূপান্তরণের আন্দোলনে, কবিতাকে সরাসরি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া,—এই অভি-প্রায়ে। পরে, 'উৎসের দিকে' থেকে আমরা জেনে যাব তাঁর কবিতার এই শারীরিকতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, কোথায় অনুভবের কোন্ উত্তরণে এগিয়ে দিতে পারে।

তবু, অরুণ মিত্র, ছন্দকুশলী সেই কবি, পদ্যছন্দ ছেড়ে দিলেন, চলে এলেন গদ্যকবিতায়, যা পরে তাঁর হাতেই অনেক রূপবদলও ঘটাবে আমরা দেখতে পাব। কখন থেকে ঘটল এই বদল ?

আবার বাংলা কাব্যে এমন ঘটনার প্রতিতুলনা মনে আসে। জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নজরুল-মোহিতলাল ছোঁয়া প্রথম বই 'ঝরা পালক' থেকে দ্বিতীয় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সেই 'বোধে', '···মাথার ভিতরে এক বোধ কাজ করে'তে বদলান কতদূর! প্রায় এক ভিন্ন প্রতিভা ও কবিত্বেরই এষণা ও বিকাশ ঘটে যায় যেন সে-ব্যবধানে!

অরুণ মিত্রে এমনটা বলা যাবে না, মোটেই। তাঁর বলার স্বর, উচ্চারণ বদলেছে, কবিতার বিন্যাসে বাহন এল কথ্যগদ্য, কিন্তু তাঁর বলবার কথা, শিল্প ও জীবনের কাছে এই কবির মৌল দায়, আদপেই সরে না। বরং তো গদ্যের বাহনে তাই-ই হয় আরো হার্দ্য, গাঢ়, তন্ময়, কথোপকথনে ঘরোয়া সম্বোধনে অন্তস্পর্শী, দ্যুতিময়। তাঁর কবিতার কথকতার সামনে একজন ঘনিষ্ঠ শ্রোতার উপস্থিতি আমরা সব সময়ই টের পাই।

অরুণ মিত্রের কবিতায় টানা গদ্যশৈলীর এই অভিঘাত দেখা দেওয়ার মুখপাত-সময়ের কিছু যেন আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি।

আমাদের বন্ধু কবি সুকান্তের জীবন নিভে গেল ১৯৪৭-এ। দেশের

স্বাধীনতার আগেই। এই অসামান্য কবিকিশোরের অকালমৃত্যুতে, ক্ষতিতে, সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্য-জগৎই বিচলিত হয়েছিল সেদিন। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতায় লিখলেন : 'বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে / সে কিসের বসন্ত ?') সেদিনের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় অরুণ মিত্রের কবিতা পেলুম আমরা :

> ···ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে···রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত।'

এই উন্মথিত গদ্যকবিতা 'সুকান্ত', এখন তাঁর 'স্মরণকাল'-এর ('উৎসের দিকে') অন্তর্ভুক্ত।

আমার একটি পরম সৌভাগ্য হয়, অনেক পরে, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিরোপার মতো। সেটা ১৯৮১-র শীতকাল হবে। কলকাতায় বইমেলা বসেছে। তার মধ্যে আমরা বসেছি, — আমি তো লজ্জা-সংকোচেই, — সেবারে 'পরিচয়'-এর বইয়ের স্টলে। আমার এতদিনের না-গাঁথা লেখা জড়ো করে 'পরিচয়'-এর লেখকবন্ধুরা দরদী উৎসাহে বার করেছেন সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি, এবং কবি-লেখক-বন্ধুসমাগমের সে-সুধীসভায়, কৃতজ্ঞ আমি, বইটির প্রথম কপি গ্রহণ করলুম আমার আকৈশোর প্রিয় কবি অরুণ মিত্রের হাত থেকে। তিনি, প্রগাঢ় ভালোবাসায় সহাস, বলেছিলেন, এই বই আজ বের হল ৮০-তে এসে, 'আশি'-র কবিই আমি তাকে বলছি. তার প্রথম কবিতা আমি ছেপেছিলাম 'অরণি'তে সেই ১৯৪৫ সালে!

এই একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল এক অগ্রজের সঙ্গে এক অনুজের সম্পর্কের।

তাঁরই দেওয়া বলে এই আশির অভিধাও রইল আমার সরস চাপা গর্বে!

(পরে আমার একটি বই 'তোমার শুধু মানুষ' যখন তাঁকে উৎসর্গ করি, তাঁরই একটি কথা তুলে দিয়ে 'মানবিক অবস্থা মনে রেখে', — খুশি হন কবি।)

উৎসের, আর তারও আগে থেকে তাঁর চলা দেখছি, অবাক হয়ে।

'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' কি তবুও কম, আরও দূর বিস্তার পর্যন্ত-ই তো তাঁর সঙ্গে যেতে তৈরি। 'একালের কবিতা'র (বিষ্ণুবাবু তাঁর বাংলা কবিতা সংকলনের জন্যে কালচিহ্নিত ওই নামই বেছে নেন, 'আধুনিক' যথেষ্ট নয় আর বোঝাতে) কতস্তর ঐশ্বর্যে তিনি তাঁর নিজের দান জমা দিয়ে চলেছেন। তাঁর ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করেছি আমরা।

যে 'আশ্চর্যে'র কথা তিনি বলেছেন, বার্ধক্যে সুন্দর তরুণ অরুণ মিত্র নিজেই তো আমাদের কাব্যের সেই এক আশ্চর্য !



পবিত্র সরকার

—

'সুকান্ত'

মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত ? যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি তা একদিন হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ি পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে। কিন্তু ততদিন আমার মাঝে মাঝে মনে হবে, মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত ? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত !

'সুকান্ত', 'উৎসের দিকে'

সব কবিই, অন্তত সব গণনীয় কবিই, একটি নিজস্ব ব্যক্তিগত ইডিয়ম তৈরি করেন, অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান তাতে। সে-ইডিয়ম নিহিত থাকে তাঁদের শব্দে ছন্দে মিলে বাগ্‌বন্ধে কবিতার অলংকার-নির্মাণে— বিশেষত সাদৃশ্যের ব্যবহারে। এই নিজের ছাঁদ তৈরির কাজটা একদিনে হয় না, অনেকেই কোনো প্রিয় কবির পদ্যবন্ধ থেকে শিক্ষানবিশি আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে নিজস্বতার ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে থাকেন, এবং শেষে নিজস্বতার এমন একটি শিখর গড়ে তোলেন যা অন্যদের শিখরগুলি থেকে দূরবর্তী, স্ব-তন্ত্র এবং নিজের মহিমায় দীপ্ত। ওই শীর্ষের দিকে তাকিয়ে

আমরা বলি, ওই কবি ওই স্থানটিতে একেবারে নিজের তৈরি জমিতে, নিজের নিজস্বতম ধ্বজাটিকে প্রোথিত করেছেন। এবারে তিনি নিজেকে আবার ভাঙতে পারেন, অন্য কোনো অধিত্যকা নির্মাণ করতে পারেন, কিন্তু অপটু শিষ্য ছাড়া আর তাঁর কোনো শঙ্কা নেই। ওইটি তাঁর নিজের বাড়িঘর।

অরুণ মিত্রের কবিতার নিজের বাড়িঘর, আমার বিচারে, তাঁর গদ্য-পঙ্‌ক্তিমালায়। আমি তাই বলে তাঁর প্রথম দিককার মিশ্রবৃত্ত (তথাকথিত 'পয়ার') ছন্দের মুক্তবন্ধ কবিতাগুলিকে—যা সংখ্যায় অনেক বেশি, কিংবা সরল কলামাত্রিক (বা 'মাত্রাবৃত্ত') ছন্দে লেখা—যা সংখ্যায় অনেক কম—কবিতাগুলিকে গৌণ করে দেখছি না। এগুলিতে অরুণ মিত্র নিঃসন্দেহে নিজস্বতায় পৌঁছেছেন, বিশেষত নিসর্গ-বদ্ধ সাদৃশ্যের আরোপে, কিন্তু এখানে তিনি তাঁর সমসাময়িক বা সামান্য অগ্রজ দু-একজনের হাঁকডাকের চৌহদ্দির মধ্যেই আছেন, প্রীতি-সম্ভাষণ চলছে তাঁদের সঙ্গে। যে অরুণ মিত্র নীচের ক পঙ্‌ক্তি সাজিয়েছেন, তিনি তখনো অন্যের সৌহার্দ্যবদ্ধ, যদিও নিজের জমিতে নির্ভুল পা রেখেছেন—

> শেষ বর্ষায় মরা গাঙে দেখি এল প্লাবন।
> আজকে তোমার অধরে হাসির ভরা জোয়ার;
> গ্রীষ্মের জালা বিছানো যে-মুখে প্রতি রেখায়
> ফুটল সেখানে ঘন আনন্দ রস-মধুর।

আমি যে অরুণ মিত্রকে চিনতে চাই তাঁর নিদর্শন সূচনায় উদ্ধৃত কবিতাটি: 'সুকান্ত'। গোটা ওই কবিতাটি এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়া কতকগুলি আত্ম-গত কথা। এ কবিতায় 'এ জালা কখন জুড়োবে' বা 'অমরতার কথা'র মতো প্যারাগ্রাফ ভাগ করা নেই, গানের তুক-এর মতো সাজানো প্রসঙ্গান্তর নেই। কিন্তু কবিতাটির শুরু একটি প্রশ্ন দিয়ে।

এ প্রশ্নটি নেহাৎ বাগ্‌বন্ধের একটা আলাদা ভঙ্গি নয়, এ প্রশ্ন বহন করছে 'মৃত্যু' নামক একটি ভয়ংকর শব্দ। সুকান্ত নামে কবির এক প্রিয় মানুষের, পরে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর এক প্রিয় মানুষের মৃত্যু, কিন্তু নামটা

বাক্যের একেবারে শেষে এসে যে আঘাত তৈরি করে, বাক্যের প্রথমে বসলে সেই আঘাত তৈরি আদৌ হত না। অথচ গদ্যের সিন্‌ট্যাক্‌সে কর্তৃপদের বাক্যের প্রথমে বসাই নিয়ম। 'মৃত্যু' এই আবেগ-ভারাক্রান্ত শব্দটি প্রথমে বসিয়ে একটা মর্মান্তিক সময়কে প্রথমে এগিয়ে দিলেন কবি, তারপর আনলেন ভাবনার কথা প্রশ্নের আকারে—'কী ভেবেছিল?' একেবারে শেষে এল ক্রিয়ার ওই কর্তাটির নাম। এই নামটা এসে পড়ামাত্র আমরা টানটান হয়ে বসি। যদি এই প্রশ্নেই থেমে যাই, তাহলে এক লহমার জন্য আমাদের মনে আরেকটি প্রশ্ন জেগে ওঠে: এই কবি কি তাহলে জানেন সুকান্ত কী ভেবেছিল ওই ভয়ংকর মুহূর্তগুলিতে? তাঁর কাছে কি কোনো গভীর সংবাদ ধরে রাখা আছে? তিনি কি এবার কোনো চমকপ্রদ তথ্য উপহার দেবেন আমাদের, যা একইসঙ্গে তাঁর কবিতা ও সুকান্তর জীবনচরিতের উপাদান হয়ে উঠবে? এই ভাবনাগুলি অন্য কারো নয়, স্বয়ং সুকান্ত ভট্টাচার্যের ; যে-সুকান্তের মৃত্যুও রুটিনবাঁধা মৃত্যু নয়। ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকা ওই তরুণটি জানত মৃত্যু ক্রমশ এগিয়ে আসছে. তার বেঁচে-থাকাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে সে-মৃত্যুর ছায়া। এখন আমরা বইপত্রে Terminal disease-এর রোগীদের নানা প্রতিক্রিয়ার প্রণালীবদ্ধ বিবরণ পাই, ড. এলিজাবেথ কুব্‌লার রস্ 'অন ডেথ অ্যাণ্ড ডাইয়িং' নামে বইই লিখে ফেলেছেন ওই গবেষণার ভিত্তিতে, সেই ১৯৬৮-তে, কিন্তু সুকান্তর মনের কথা তো কেউ জানায় নি আমাদের। এই কবি কি তাহলে এমন কিছু জানেন যা আমরা জানি না?

পরের বাক্যেই অবশ্য সমস্ত প্রশ্ন নিরস্ত হয়ে যায়। না, সুকান্তর ভাবনার খবর কেউ জানতে পারে নি। এ বাক্যে একটু মেটাফর মিশিয়েছেন কবি, 'নিঃশব্দ' আর 'ডাক'—এই দুটি শব্দের বিরোধকে খেলিয়েছেন একটু, 'শেষ' বিশেষণটি এনে আরেকবার আঘাত করেছেন আমাদের, কিন্তু তাঁর সংবাদ চূড়ান্ত। এবার শুরু হল কবির বিরোধাভাসের প্রলম্বিত ব্যবহার। 'ছোট্ট' বুক আর 'ছোট্ট' মাথার 'নিঃশব্দ শেষ ডাক' একদিন 'চীৎকার' করে উঠবে। এই 'চীৎকার' শারীরিক আর্তনাদ নয়, তার আক্ষরিক অর্থ কবির লক্ষ্য নয়, তবু দেখি ওই 'চীৎকার'-কে শারীরিকতা দিচ্ছেন অরুণ মিত্র,

সুনির্দিষ্ট স্থানিক বর্ণনার সাহায্যে—'যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ি পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে।' কবির বিবৃতি থেকে এখনই যেন সেই 'নিঃশব্দ' চিৎকারের গমগম আওয়াজ আছড়ে পড়তে শুনছি আমরা সেই হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে। পরক্ষণে কবির দেখিয়ে দেওয়া ভবিতব্যকেই আমরা অনুসরণ করি, তিনি শারীরিক চিৎকার থেকে আমাদের নিয়ে আসেন অবস্তুক 'ভাষা'য়, তার সঙ্গে যুক্ত করে দেন আমাদের বাঁচার সব আবেগবদ্ধ অনুষঙ্গ—ভালোবাসা, আশা, নৈরাশ্য, মৃত্যু, আরোগ্য, সংগ্রাম। এখানেও বিপ্রতীপকে বাজিয়েছেন কবি—আশা নৈরাশ্য, মৃত্যু আরোগ্য। ভালোবাসা···সংগ্রাম। 'হারানো ভাষা'··· 'ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে'।

এই সম্ভাবনা চিত্রিত করেই আবার ভিন্ন একটি বিরোধের আশ্রয় নিতে দেখি কবিকে। ভবিষ্যকথন তিনি ছেড়ে দেন এক মুহূর্তে। যেন প্রস্তরোৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের বৃত্তের ক্রমশ ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ধরিয়ে দিয়েই, থিমকে একটা গতি ও বিস্তারের দিকে ঠেলে দিয়ে, আবার আমাদের উন্মুখতাকে প্রতিহত করেন হঠাৎ, ফিরে যান সেই প্রথম প্রশ্নে—'কী ভেবেছিল সুকান্ত ?' আগের মতো এ বাক্যটিতেও 'মৃত্যুর আগের দিন' আর 'পড়ন্ত রোদ' বর্ণনা আর ব্যঞ্জনায় সমান্তরাল হয়ে ওঠে। ওই প্রশ্নের সামনে মাথা-খুঁড়তে-থাকা কবি হঠাৎ নিজের শেষ মন্তব্যে আমাদের আর্তনাদকেই ফুটিয়ে তোলেন : 'রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত!' আবার সেই বিপ্রতীপের আন্দোলন—'রোদের একটা ঝলক' আর 'সুকান্তর অন্ধকার ফুসফুস!' এই 'যদি'-র সংকেত কবিতাটির প্রাচীর ভেঙে দেয়, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ওই অলৌকিক সম্ভাবনাটা আমাদের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। একদিকে মৃত্যুর স্পষ্ট অবিস্মরণীয় ঘটনা, তার মুখোমুখি ছুঁড়ে-দেওয়া কবির ওই 'যদি'। আমরাও ভাবতে থাকি, যদি, যদি, যদি···।

কবিতাটির গঠন খুব জটিল নয়। একটি প্রশ্ন, তার প্রচ্ছন্ন নেতিবাচক উত্তর। সেই উত্তরকে উপহাস করে, মৃত্যুর পরাভবকে ক্রমশ দুর্ধর্ষ করে তোলা, সুকান্তর শরীরী বিলয়ের পটভূমিকায় তার কাব্যিক অস্তিত্বকে

অনশ্বরতার মধ্যে স্থাপন। কিন্তু আবার প্রশ্নে ফিরে যাওয়া, কারণ কবির খ্যাতি বা সমাদর তো তার জীবনের অপচয়ের ক্ষতিপূরণ নয়, সেখানে এক খণ্ড সান্ত্বনাহীনতা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে ওই 'যদি'-র মধ্যে। অরুণ মিত্র কথ্যতার খুব কাছাকাছি থেকেছেন এ কবিতায়, সাজানো ভাষার শরণ নিয়েছেন কদাচিৎ, বিশেষণ ব্যবহার কথ্যতার সীমানা অতিক্রম করে নি। অরুণ মিত্রের যে চারটি পদ্যপঙ্‌ক্তি আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি, তাতে 'অধরে' কথাটি আছে,—এটি একটি 'কাব্যিক' শব্দ। এ ধরনের কোনো শব্দ 'সুকান্ত' কবিতায় নেই। 'ছোট্ট' 'পড়ন্ত' 'উদ্দাম' 'হারানো'—এর কোনোটিই সাজানো কাব্যিক বিশেষণ নয়। বিশেষ্যগুলিতে নেই আভিধানিক উৎকলন। সজ্ঞান অলংকরণের চেষ্টা খুবই সামান্য, একমাত্র 'ভাষা'-র **Personification** ছাড়া। কবির প্রধান অস্ত্র বিরোধ, তাকেই তিনি নানা ভাবে এখানে ওখানে লাগিয়ে একটি ঋজু ও আর্ত কবিতা তৈরি করেছেন।

সুরজিৎ ঘোষ

—

'অন্তরঙ্গ'

ঠাহর ক'রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ। প্রথম সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে সবুজ তোরণের নিচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম। বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রক্তে সমস্ত দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, আমাদের মন সমস্ত দূরত্ব নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। কেউ একজন (আমিই কি ?) হঠাৎ বলেছিল, চলো, ঝর্না কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে পাহাড় বন মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু পাইনি। অত উঁচুতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েও আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে. আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে। তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। অন্য কথা আর কে শুনবে ? তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখী, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজখবর আমাদের দেবে। কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।

আমার চারপাশে তারা আবার ভিড় ক'রে এসেছে। এ জায়গায় বিপুল জলের ভাঙন লেগেই আছে, স্পষ্টতার এলাকা এটা নয়। ভাল ক'রে দেখে তবে তাদের চেনা গেল। তাদের আলাদা আলাদা নাম আমি আর বলতে পারি না। আমার মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে। তাদের

মুখগুলো নিয়ে গিয়েছে, তাই সেখানে কিছুই পড়া গেল না। তবু আমার বক্তৃতা আমি তাদের কাছে রাখলাম, তাদের কথা জানতে চাইলাম। কোন্ সম্বল নিয়ে তারা এতদূর হেঁটে আসতে পারল এই প্রশ্ন শুনে তারা চেটোগুলো খুলে হাতের রেখা আমার সামনে মেলে ধরল। কোনো রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে আমি জানতাম না। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।

তারা সব আমার রক্তের দোসর।

'অন্তরঙ্গ', 'ঘনিষ্ঠ তাপ'

যে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছি, 'ঘনিষ্ঠ তাপ'-এর প্রথম কবিতা 'অন্তরঙ্গ', সেই কবিতাটিকে আমি অরুণ মিত্রের সমগ্র কাব্য-অভিজ্ঞতার একটি চাবি-কবিতা বলে মনে করি।

অরুণ মিত্রের শিল্পসৃষ্টির সাধারণ আবহাওয়া প্রতিদিনের বাস্তব জীবন এবং এর প্রধান উপজীব্য মানুষ। এই মানুষের দিকে বিকীর্ণ ভালোবাসার তাপ অনুভব করা যায় অরুণ মিত্রের সমস্ত কবিতার পরিমণ্ডলেই। তবু আমার মনে হয়, তার ঘনতম, ঘনিষ্ঠতম রূপটি পাওয়া যায় 'ঘনিষ্ঠ তাপ' গ্রন্থে। সেই বইটির প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আছে এই কবিতাটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রিয় মানুষের মতো। সন্দেহ নেই, মানুষটি অরুণ মিত্র, প্রথম আলাপেই যিনি ঠাহর করে দেখা আর বোঝার কথা বলেন। ভিড়ের মধ্যে যারা আছে, পাঠকও নিশ্চয়ই, তাদের তিনি শুরুতেই জানিয়ে দেন তাঁর উপলব্ধি যে তারা প্রত্যেকেই তাঁর খুব অন্তরঙ্গ। এটা কোনো ফাঁকা আওয়াজ বা স্বপ্ন-বিশ্বাস নয়, এটা তাঁর বিচার-বিবেচনাপ্রসূত উপলব্ধি। কী আছে তাঁর এই বিবেচনার পিছনে ? আছে স্মৃতি, যাকে নিয়েই কবিতার সংসার। তিনি বলেন, 'প্রথম সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে সবুজ তোরণের নিচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম।' এই স্মৃতিবিদ্ধ বর্ণনা-অংশে একটু থেমে দুটি শব্দকে বিশেষভাবে লক্ষ করা যাক সমস্তটার পটভূমিকাতেই : 'প্রথম' এবং 'সবুজ'। ভালোবাসা বা অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যাপারটা অনিবার্য।

যাকে ভালোবাসি তার কাছে যে কোনো ব্যাপারেই প্রথম হওয়াটা প্রায় আবশ্যিক। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে সতীনাথ ভাদুড়ির 'অচিন রাগিণী', যেখানে ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বে পিলে ফাস্ট, তুলসী সেকেন আর আমি··· । ঐ প্রথম হওয়ারই ব্যাপার। অনুষঙ্গ এক-একজন পাঠকের ক্ষেত্রে এক-এক রকম হবে, কখনো হয়তো খুবই ব্যক্তিগত, তবু সন্দেহ নেই প্রথম দিকের যে-কোনো একটা বা অনেকগুলো সকালের কথা না বলে 'প্রথম সকালটা'র উচ্চারণই অন্তরঙ্গ আবহাওয়াটা তৈরি করে ফেলে, যেটা না থাকলে কবির সঙ্গে সকলের হাত ধরাধরি করে বাইরে আসাটা একটা সত্যি অনুভব না হয়ে স্লোগানের মতো হয়ে পড়তে পারত। এবং 'সবুজ'। অবশ্যই সবুজ তোরণ এখানে বাধাহীন এক চলাচল-দ্বারের তরুণ দ্যোতনা হয়ে ফুটে ওঠে, যার অভাবে সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারে না। এবং এরপর যখন কবি বলেন 'বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রক্তে সমস্ত দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, আমাদের মন সমস্ত দূরত্ব নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল।'—তখন ওই 'আমাদের' মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে কারোই আর দেরি হয় না।

কিন্তু প্রথম 'সেই সকালটা'তে আরও অনেক কিছুই ঘটেছিল। কেউ একজন হঠাৎ বলেছিল, 'চলো, ঝর্না কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি।' এরপরে 'হৈ হৈ ক'রে প্াহাড় বন মাড়িয়ে' সকলে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কবির কথায় : 'কিছু পাইনি। অত উঁচুতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েও আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে, আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে।' আপাতসরল এই কবিতার বর্তমান অংশ থেকেই জটিল রহস্যময়তার চোরাটান অনুভব করা যায়। 'কেউ একজন' বলার পরেই কবি বন্ধনীর মধ্যে 'আমিই কি?' বসিয়েছেন কেন? প্রথমত বন্ধনীর মধ্যে রাখার থেকেই মনে হয় যে এই প্রশ্নটি স্বগত, কিছুটা উচ্চকথিত মাত্র। ঠিক বাইরের কাউকে নয়, নিজেকেই যেন এই প্রশ্ন। তাছাড়া এর মধ্যে দ্বিধাও বড় বেশি। এই দ্বিধা কেন? ঝর্নার উৎসমুখ খোঁজার প্রস্তাব কি তবে খুবই বিশেষ কোনো তাৎপর্য বহন করেছিল? প্রচার-বিমুখ কবির এ তাই স্বভাববিনয়—যদিও আসলে তাঁর

ঠিকই মনে আছে যে ওই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি তিনিই দিয়েছিলেন। নাকি সত্যিই অন্তরঙ্গতা সেই প্রথম সকালে এমনই ঘনিষ্ঠ মাত্রায় ছড়িয়েছিল যে কারো কণ্ঠস্বরই আর আলাদা করে দেখার কথা মনে হচ্ছিল না, নিজের উচ্চারণ দিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল অন্যকে, অন্যের কণ্ঠস্বর নিজের বলে ভাবতেও দ্বিধা হচ্ছিল না। এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট ও অসংশয়ী উত্তর এ কবিতার কাছ থেকে হয়তো পাওয়া যাবে না, কবিতার ক্ষেত্রে সবসময় তা পাওয়া যায়ও না, আশা করাও উচিত নয়। বরং সবাই মিলে উপরে ওঠাটা যে হৈ হৈ করে হয়েছিল এই ঘোষণাই যথেষ্ট প্রাপ্তি বলে মেনে নেওয়া যায়। অবশ্য কিছু পাওয়া যায় নি। বরং অত উঁচুতে শ্বাসকষ্টই হয়েছিল শুধু। তাই আরও উঁচুতে ওঠার ব্যাকুলতা যতই তীব্র হোক না কেন, সমতলেই নামতে হয়েছিল সকলকে। বলা হয়েছে 'এই সমতলে' অর্থাৎ বর্তমান কবিতার ভূমি বাস্তবে ; এবং এর একটি বিশেষণও দেওয়া হয়েছে, 'আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে'। উঁচুতে ওঠার ব্যাকুলতা যে সকলেরই ছিল এটা কীভাবে অনুভব করেছিলেন কবি সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও এত-ক্ষণে এই কবিতার বর্তমান আবহ কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। প্রথমত তা 'সমতল' এবং দ্বিতীয়ত তা 'আকাঙ্ক্ষার পোড়ামাটি'র উপর দাঁড়িয়ে। এবং কবির চারদিকে ভিড়। পোড়ামাটি বললেই যে শক্ত শিল্পকর্মের উপাদানটির কথা অনুষঙ্গে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা শব্দটি যুক্ত হয়ে এখানে এক অন্যতর আবেগের শরীরী মাত্রা এসে যায় যা ভবিষ্যতের আর এক ব্যাকুল-তায় অস্থির। স্মৃতিচারণাতেও দেখি যে 'তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।' কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই খুব একটা সায় পাচ্ছে না কবির দিক থেকে, না হলে খানিকটা হতাশাখিন্ন-স্বরেই বা কেন তিনি লিখবেন, 'অন্য কথা আর কে শুনবে ? তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখী, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজ-খবর আমাদের দেবে। কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।' আসলে চেষ্টার এবং ধরাছোঁয়ার জগতের বাইরে থেকে আসা কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর উপর কবির সারাজীবনের দুর্মর অনীহা, এই পঙ্‌ক্তিকটির মধ্যেও তারই সুর স্পষ্ট। তাই তিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির

জগৎ থেকে আশ্বাসের উপকরণ সংগ্রহ করে দেখাতে চেয়েছিলেন বন্ধুজনদের, তাদের বিশ্বাস ন্যস্ত করতে বলেছিলেন 'নতুন বৃষ্টি, পাখী বা চোখের মণি'র উপর। কিন্তু সেদিন সেই প্রথম সকালটিতে অন্তরঙ্গতা ক্রমশ তরল হয়ে আসছিল, ঔদাসীন্য ঘিরে ধরছিল সম্পর্ককে, তাই তাঁর কথা 'গভীর অন্য-মনস্কতার ভিতর তলিয়ে গেল।' লক্ষ করা দরকার যে কবি যদিও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে তখনও 'আমাদের' ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু যে কয়েকটি কথা তলিয়ে গেল তা 'আমার' মাত্র এবং নিশ্চিতভাবেই 'আমার' —অন্তরঙ্গতা ক্রমেই এক অনিবার্য অন্যমনস্কতার ভিতর দিশা হারাচ্ছে এবং যে অন্যমনস্কতা গভীর। গভীর এবং রহস্যময় এই প্রয়োগ। অন্য অনেকের বহু কবিতায় ব্যবহৃত অগভীর নিরর্থক ছিটিয়ে দেওয়া শব্দ হিশেবে 'গভীর' এখানে আসে নি। এবং এই 'আমার' কথা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পূর্বোক্ত (আমিই কি?) এই স্বগতভাষণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অনুমানটিই সম্ভবত ঠিক ছিল।

এর পরেই এই কবিতায় একটি নতুন প্যারাগ্রাফ এসেছে। কবিতার স্তবক নয়, একেবারেই স্বভাবী গদ্যের প্যারাগ্রাফ। প্রচলিত অর্থে গদ্যছন্দে রচিত কবিতার স্তবক-বিন্যাস হলে এই পরিসরে তা অন্তত আরও তিনবার করা যেত। তা না করে এই যে পুরোপুরি গদ্যের প্যারাগ্রাফ, এর ফলে গদ্যকেই কবিতা করে তোলা হয়েছে। অরুণ মিত্রের এই বিশেষ আঙ্গিক-সিদ্ধি আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার এক অম্লান দৃষ্টান্ত। যাই হোক, এই নতুন প্যাবাগ্রাফে এসে আমরা দেখি যে এর মধ্যে অনেক সময় চলে গেছে এবং আবার কবির চারপাশে জমেছে 'ভিড়'। কিন্তু এই ভিড়ের চেহারা খুব স্পষ্ট নয়। 'বিপুল জলের ভাঙন' স্পষ্টতার সীমারেখা ধুয়ে মুছে দেবার জন্য 'এ জায়গায়' উপস্থিত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অরুণ মিত্রের সবচেয়ে প্রিয় অনুষঙ্গ বোধ হয় 'জল', যে জলের স্বর এবং প্রবাহ তিনি নানাভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে জল যেমন ভাবেই আসুক না কেন, সে আসা বড় অমোঘ, বড় ব্যাপক তার অর্থময়তা। উদাহরণের অবকাশ এখানে নেই। শুধু বলে রাখা যায়, এই বিপুল জলরাশি অরুণ মিত্রের কবিতাকে সর্বত্রই এক অন্তর্মুখী টানে বইয়ে দেয় বুকের ভিতরে, যেমন দিয়েছে এখানেও।

তবু এই অপ্রতিরোধ্য টান অতিক্রম করেই চলে অন্বেষণ। ভালো করে দেখতে হয়, ঠাহর করতে হয়, তবে তাদের চেনা যায় ঠিকই। অবশ্য এখন আর তাদের নাম আলাদা করে বলা যায় না। সত্তার স্বাতন্ত্র্য এই ভিড়ে লুপ্ত। প্রতি মুহূর্তে দ্বিধায় অবিশ্বাসে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবাই আজ নিঃসঙ্গতার শিকার। অরুণ মিত্রের আশ্চর্য রূপকল্প বলে: 'আমার মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে।' কী ভয়ানক এই অবস্থা। কবি বা শিল্পীর কাছে তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্য অপরিসীম। অথচ বর্তমান যন্ত্র-মালিক-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাস্তব সে বিষয়ে নির্বিকার। ফলে ব্যক্তি হিশেবে যে কোনো শিল্পীই আজ বিপর্যস্ত, কোনো অবস্থাই তাঁর আয়ত্তে নয়। এ কারণে অনেক সময় কবির মধ্যে নিজের সমাজ সম্পর্কে অনাত্মীয়তার বোধ দেখা দিতে পারে যা আত্মানুসন্ধানের নামে কবিকে ঠেলে দিতে পারে দুর্জ্ঞেয় মনোজগতের উদঘাটনে, নয়তো মৃত্যু বা যৌনচিন্তায় কিংবা সমগ্র ইন্দ্রিয়বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। আমাদের সৌভাগ্য, অরুণ মিত্রের ক্ষেত্রে তা হয় নি।. উৎসের মুখে যে দম-আটকানো অপরিচয়ের, অনাত্মীয়তার পাথর বসানো থাকে তা তিনি খুলে দেন তাঁর কবিতায়। এই কবিতাতেও তেমনি তিনি অতিক্রম করে যান মানুষের অসহায় একাকিত্বকে, সম্মিলিত অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতাকে। মানুষের ভবিষ্যতের অন্য এক রূপাভাস তাঁর রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁর আধুনিকতার উৎসার ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা এবং সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধ নিরসনের আকাঙ্ক্ষার পোড়ামাটি থেকে। তাই নিবে যাওয়া অপাঠ্য মুখগুলোর কাছে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুতা রাখলেন, জানতে চাইলেন তাঁদের কথা। 'কোন্ সম্বল নিয়ে তারা এতদূর হেঁটে আসতে পারল এই প্রশ্ন শুনে তারা চেটো-গুলো খুলে হাতের রেখা আমার সামনে মেলে ধরল। কোনো রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে আমি জানতাম না।' কবিতা যতই শেষ হয়ে আসছে ততই বিষণ্ণতার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে তার আবহাওয়ায়। তবু এখানে অসহায় ভবিষ্যনির্ভরতা যেমন আছে, তেমনই আছে বহুদূর থেকে হেঁটে আসতে পারার কথা। এই পারাটাই অরুণ মিত্রের কবিতাকে চিনে নেওয়ার অভিজ্ঞান।

ঘুমের দরজা ঠেলে, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে, সার্কাসে টান-দড়ির খেলা দেখিয়ে সারাজীবন তাঁর বন্ধুরা সাঁকো পারাবার করে সবাই তুমুল পথে আসে না, তবে আসে এটাই সত্য। আজ তারা হয়তো কিছুটা বিভ্রান্ত, ভাগ্যনির্ভর. চল্লিশ থেকে ষাটে আসবার পথে অনেকেরই হাতের চেটো থেকে হয়তো ভাগ্যরেখা ছাড়া আর সব সম্বলই হারিয়ে গেছে, তবু কবির যে 'ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর' তাঁর হাত রাখার, সেটাও সত্য।

এর পরেই একটা ঘোষণা আছে : 'তারা সব আমার রক্তের দোসর।' এটা নিঃসন্দেহে ওই হাত রাখার ইচ্ছার কারণনির্দেশ নয়। এ একটা আলাদা প্যারাগ্রাফ। সমস্ত কবিতার সামগ্রিক উপলব্ধি। অনুত্তেজিত, বাহুল্য-বর্জিত, কিন্তু নিশ্চিত প্রত্যয়। জ্ঞানের কথা নয়. যুক্তিতর্কের কথা নয়, অনুভবের কথা। ঠাহর করে দেখলে বোঝা যাবে, এই জন্যই তাঁর কবিতা এত অন্তরঙ্গ। 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে' বলেন বলেই তাঁর কবিতা দুধ-রক্তের মতো মিশে থাকে আমাদের সত্তায় ; এই কবিতা থেকে আর-এক কাবতায়, উৎস থেকে খুঁজতে খুঁজতে বহুদূরে যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকে তরুণ বন্ধুটির মতো। তারা সব আমার রক্তের দোসর। এবারে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিই নি। কেননা অরুণ মিত্রের প্রস্বরে হলেও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এটা আমার অনুভবের স্বীকারোক্তি।

সুনীলকুমার নন্দী

—

'পোল পার হওয়ার সময়'

> পোল পার হওয়ার সময় আমার এক ধরনের ভাবনা হয়। পায়ের নিচে খিলেনটা ভেঙে পড়বে, তা নয়। বা লোহার মুঠোয় আমার নিশ্বাস আটকে যাবে, তা নয়। আমার ভাবনা হয় আমি কিভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি। এখন নতুন চিহ্ন তৈরি করতে হবে যা দেখলে নিজের বুকের ধুকধুক প্রিয় শোনাবে। যা দেখলে টের পাব টকটকে ইস্পাতের মুখে হাত রেখেও আমি শীতলতায় আছি।
>
> আর, খুব পুবোনো কথা মনে আসে। যেমন, নগরীতে প্রথম পা ফেলা। ভীষণ রোদেব মধ্যে শুনলাম 'তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটছে।' পদ্ম পদ্ম পদ্ম। এই একটা শব্দ কেবলই আমাকে ধ্বনিত করেছে। যখন মনে হল আমি আরেক আগুনে, তারপরও। এবার যদি সমস্ত মাটি সীসের মতো হয় তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব?
>
> 'পোল পার হওয়ার সময়', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'

কবিতাটি আদ্যন্ত গদ্যে লেখা।

কবিতায় অরুণ মিত্র কেন মূলত গদ্য-আঙ্গিকের আশ্রয় নেন, তা আমরা জেনে গেছি তাঁর কবিতা-সম্পর্কিত আত্মকথনে: 'আসলে ছন্দের বদলে গদ্যকে বাহন করতে বাধ্য হলুম তখনি, যখন আমি টের পেলুম আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে ছন্দ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' ('কলেজ স্ট্রীট', শ্রাবণ ১৩৯০)।

তেমন এক কঠিন অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিকে,

নিতান্ত নিরাভরণ গদ্যে ভর দিয়ে, তিনি এই কবিতাটির শরীরে চারিয়ে দিয়েছেন। ভেতরমাত্রাটি পেতে কবিতাটি বারকয়েক পড়েছি। কখনো মনে হয়নি, কবিতা হয়ে ওঠার গঠন-প্রক্রিয়ায় কোথাও এসেছে সামান্যতম আড়ষ্টতা বা ছড়িয়ে-পড়া শৈথিল্য। হালের বাংলা গদ্যকবিতা যাতে ভয়ংকর-ভাবে আক্রান্ত।

গোটা কবিতা বুঝে নিতে প্রথমেই চোখ রাখছি দ্বিতীয় স্তবকে ব্যবহৃত 'আগুন' শব্দপ্রতিমাটির ওপর। যা হয়তো বিস্ফরিত হয়েছে বিশেষ সময়-সন্ধিকে বোঝাতে গিয়ে। বলা ভালো, কোনো অবস্থার মৌল সীমাবদ্ধতা খুলতে দায়বদ্ধ যে-গণউত্থান, সময়ের এই অগ্নিময়তা আসলে তারই ইঙ্গিত-বাহী। মেধায় ও মননের দিক থেকে কবি যার প্রত্যক্ষ শরিক। তবে প্রশ্ন হতে পারে, পোল বা সময়সন্ধি পার হওয়ার সময় তাঁর এত 'ভাবনা' কেন? ভাবনার উৎসে তাঁর আগেকার বাস্তব-অভিজ্ঞতা। তিনি যে এরকম সময়-সন্ধির মুখোমুখি আগেও হয়েছেন, তা বেশ বোঝা যায় কবিতার প্রথম স্তবকের চতুর্থ বাক্যে এসে, 'আমার ভাবনা হয় আমি কিভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব।' এখানে 'আবার' শব্দটি লক্ষণীয়, অর্থাৎ এমন বিকল্প বাতাস তিনি ইতিপূর্বেও অনুভব করেছেন।

তবে বর্তমান সময়সন্ধি নিয়ে যেন অধিক সচেতন, সংলগ্ন—তিনি লেখেন, 'এখন নতুন চিহ্ন তৈরি করতে হবে যা দেখলে নিজের বুকের ধুকধুক প্রিয় শোনাবে।' যা দেখলে টকটকে ইস্পাতের মুখে হাত রেখেও তিনি টের পাবেন—'শীতলতায় আছি'। শীতলতা এখানে কী? নিশ্চয়ই বেহালাবাদক নীরোর উদাসীনতা নয়। আমার ধারণা, লক্ষ্যের স্থিরতা-সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়। তুমুল অস্থিরতা, টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখার মতো ঠাণ্ডা মাথা, যা তিনি খুবই জরুরি মনে করেন এই সময় পার হওয়ার পক্ষে। আর কেন 'নতুন চিহ্ন' তৈরি করার কথা তাঁর মনে এল, তা আছে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে।

সময়চেতনার এই যে অগ্নিময় উপলব্ধি, মেঘ দেখে মেতে ওঠার মতো এ কোনো ভাসা-ভাসা আলটপকা ময়ূরী আবেগ নয়। এর নিশ্চিত পরম্পরা আছে, শেকড়বাকড় আছে। আমরা জানি, নগরীর মুঠোয় যে-কোনো

পরিবর্তনের দিকনির্দেশিকা, নগরীই তো সারাদেশের রূপকার। সেই নগরীতে প্রথম পা ফেলার মুহূর্তকালীন অভিজ্ঞতা—'ভীষণ রোদের মধ্যে শুনলাম "তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটছে"।' এখানে 'ভীষণ রোদের মধ্যে' চিত্রকল্পটিতে জেগে ওঠার যে-রহস্যময় আবহ ব্যবহার করেন, তা কবির বিশেষ স্মরণযোগ্য অনুভূতি—মূলস্রোতে নিজেকে মেলাতে পারার এক আত্মনিশ্চয়তা রয়েছে এর মধ্যে ; মনের উত্তাপ যেন খুঁজে পেয়েছে সমকালীন জাগরণের বিপুল সিম্ফনি। এবং 'তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটছে'—এ যে নতুন স্বদেশের স্বপ্ন সেকথা বেশ মনে হতে পারে। নাহলে তিনি কেন লিখবেন 'পদ্ম পদ্ম পদ্ম' আবেগময় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে ? শতমুখী বিকাশের প্রতীক এই পদ্ম, স্বাধীন ভারতের জাতীয় পুষ্প। যে কিনা সমস্ত পাঁক ও ঘোলাজলে মন্থিত হয়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে শতদলে মাথা তুলে ধরে।

'পদ্ম পদ্ম পদ্ম। এই একটা শব্দ যা কেবলই আমাকে ধ্বনিত করেছে। যখন মনে হয় আমি আরেক আগুনে, তারপরও।' এই অংশটি খুবই অভিনিবেশ দাবি করে, কবির রচনা-সময়ের মননক্রিয়ার অন্তর্লীন প্রবাহের ঘনিষ্ঠ হতে। পদ্ম—এই শব্দটা দেখছি এখনো তাঁকে ধ্বনিত করছে, কেন ? বিচিত্র সব প্রতিবন্ধকতার ঘোলাজলে পাঁকে অন্ধকারে ধ্বস্ত এদেশ, আজও শতদল পদ্মের মতো সার্বিক বিকাশের দিকে সত্যি তো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি। তাই কি মনে হয় না 'আরেক আগুনে' সেই জাগরণের আবার সাড়া পেয়ে, কবি নতুন আশায় যাত্রাপথের অমোঘ বিন্দুগুলো ঠিক করে নিতে চাইলেও, সেখানে বিঁধে যায় সংশয়ের কাঁটা ?

তারপরই সুদূরপ্রসারী এক প্রজ্ঞায় মেশা কবিতাটির অন্তিম বাক্য। যার তির্যক উক্তি যেন এদেশের পরিবর্তনকামী স্রোতগুলির ব্যর্থ কর্মকাণ্ডের দিকে আঙুল তুলে ধরেছে, 'এবার সমস্ত মাটি যদি সীসের মতো হয় তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব ?' মাটি সীসে হয়ে যাওয়ার চিত্রকল্পটি ধরে আছে প্রকৃত সৃজনক্ষমতার অবলুপ্তি। ক্রমাগত অসাফল্যে ও অ-প্রযুক্তিতে সময়চেতনার মাটি যখন সীসের মতো ধাতব-কঠিন নিষ্ফলা, তখনো পরিবর্তনের বৃথা আস্ফালন শুনে যাওয়ার যে দুঃসহ যন্ত্রণা, তা কবির ওই তিক্ত আর্তিতে প্রতিধ্বনিত।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

'কেমন ক'রে দিন যায়'

কেমন ক'রে দিন যায় ছাখো.
ভোরে মাটিতে একাকার রং
স্বপ্নের রঙিন গুঁড়ো সেখানে ধুলো,
রাস্তার দুপাশে কাঁটাঝোপ আর বাচ্চারা
মাঝখান দিয়ে ভেঁপু-গাড়ি,
একসময় ডানবাঁয়ে ওলটপালট হঠাৎ হায় হায়,
ধুলোর মেঘের মধ্যে রক্তের ফোয়ারা।

সাজানো আলোর ঘের,
শিলান্যাসের অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করে
জ্বলজ্বল করতেই থাকে
যখন চারপাশে আচমকা ধস নামে,
উল্‌টে পড়ে ঘরদোর বাসিন্দা,
বাতাস জুড়ে বাঁচাও বাঁচাও
আর সেই সঙ্গে কাছেই জোর ঘুঙনাচ।

'কেমন ক'রে দিন যায়', 'পরিচয়' ১৩৯৩ শারদীয়

কার শান্তি? কীসের নিরাপত্তা? ফ্যাসিস্টবিরোধী আর্নস্ট টলার-ই সম্ভবত সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্নদুটি তুলেছিলেন তাঁর নাটকে।

শ্রেণীগত অবস্থান থেকে দেখতে গেলে যে-কোনো বাস্তবতার অন্তত দুটো মুখ তো বেরিয়ে পড়েই. পরস্পরকে ছোবল হানতে উদ্যত দুটো মুখ।

বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, উন্নয়ন ও শোষণ, উৎসব ও সর্বনাশ সেখানে হয়ে পড়ে সমার্থক। এমনকী নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতা জাতীয় শব্দও হয়ে ওঠে রীতিমতো সন্দেহজনক, এদের শরীরে একটু ঠাহর করলেই দেখা যায় কম্প্রাদর বা কোলাবোরেটর-এর পোশাক।

প্রশ্নে ও সংশয়ে চৌচির এমনই এক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর সম্প্রতি 'কেমন ক'রে দিন যায়' নামে একটি কবিতাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন ছিয়াত্তর বছরের ছিমছাম তরুণ কবি অরুণ মিত্র।

না, অনুপ্রাসের ঝুমঝুমি বাজানোর জন্য নয়, খুব ভেবেচিন্তেই আমি অরুণ-এর আগে 'তরুণ' শব্দটি বসিয়েছি। যতই বয়স বাড়ছে কবির, ততই টাটকা আনকোরা দৌড়বাজ হয়ে উঠছে তাঁর কবিতা—ভাষায়, ভাবনায়, সময়-লগ্নতায়। যা ছিল কবির একান্ত প্রিয়, অলংকরণ চিত্রময়তা ও শব্দের সূক্ষ্ম কারুকাজ, সেসব ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে নির্বাচন ও বর্জন -নির্ভর অন্তরের কণ্ঠস্বর। তাঁর কবিতার ও অনুভবের উষ্ণতা আমাদের ত্বক সরাসরি স্পর্শ করছে।

'কেমন ক'রে দিন যায়' কবিতাটির কথা হচ্ছিল। 'দিন যায়' বললেই লালাবাবুর বৈরাগ্য না হোক, আমার গলায় উঠে আসে রাবীন্দ্রিক ইনটোনেশন-এ 'দিন-ও যায়'। ওই দীর্ঘ আপ্লুত স্বর পেয়ে যাই মেধায় ও সংস্কারে।

কিন্তু তারপরই, অরুণ মিত্রের কলম থেকে ছাড়া পেয়ে নেমে আসে সেই মর্মান্তিক অশনি, 'স্বপ্নের রঙিন গুঁড়ো যেখানে ধুলো'।

'প্রান্তরেখা' থেকে 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'—না, কোথাও পাই নি এই মার-খাওয়া বাসনার ছবি, যেখানে সমস্ত আশা ও বিশ্বাস গুঁড়িয়ে চৌপাট, যেখানে নবজাতকদের সঙ্গে তুলনা করা হয় কাঁটাঝোপের—এই হিংস্রতার নজির। শোণিতের অন্তর্গত সর্বনাশ লাফিয়ে ওঠে এমন অমোঘ পঙ্‌ক্তিমালার মুখোমুখি দাঁড়ালে—'একসময় ডানে বাঁয়ে ওলটপালট হঠাৎ হায় হায়, / ধুলোর মেঘের ভেতর রক্তের ফোয়ারা।'

'ডানে বাঁয়ে ওলটপালট' আমাকে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে। একবার মনে হয় ডান ও বাঁ বলতে ভেটারান, রাজনীতিমনস্ক কবি নিশ্চয় দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার কথা বলছেন ; বিষণ্ণ চোখে দেখছেন, ফলিত প্রয়োগের ব্যর্থ-

তায় কীভাবে ডান-বাঁ মানুষের কাছে একাকার হয়ে যায়। অনিবার্যভাবেই স্মরণে আসে আর-এক বামপন্থী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যাশা-হত উচ্চারণ, 'লাল জামা আসে, নীল জামা যায়, / শুধু পোশাকের রং বদলায়, / রাজা বদলায় না।'

তারপরই মনে হয়, দিক-অন্ধ-করা সেই আঁধির কথা, যা সত্য-মিথ্যে ভালো-মন্দ একাকার করে দেয়। বিভ্রান্তির অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরে যায় উন্মাদ তারুণ্য বা হত্যা করা হয় তাদের। সেই নিহত যৌবনের মালার্মীয় ট্রান্সফার হিশেবে যেন পেয়ে যাই 'রক্তের ফোয়ারা' শব্দদুটি। এই উৎসারকে ঢেকে দেওয়ার জন্য 'ধুলোর মেঘ'-এর ষড়যন্ত্র, এক ধরনের মানে না-টেনে-বুনেই বের করা যায় বৈ কী।

আর, ভাবি, 'রক্ত'-র কোনো পেলব বিকল্প শব্দ নেই। এই ভাবনার ওপর আচম্বিতে ছায়া ফেলে যায় সত্তর-একাত্তরের যুবমেধের দুকূল-ওপচানো স্মৃতি। এমনই সর্বস্পর্শী সেই স্মৃতি যে সামাজিক কবিতা রচনায় সম্পূর্ণ অনাগ্রহী এক তরুণ কবিরও তখন না লিখে বোধহয় উপায় ছিল না — 'পাথরে লেগেছে রক্ত, / সেই রক্ত সূর্যাস্ত দেখেছে।'

আত্মাহুতির কথা লিখতে গেলেই কেন 'রক্ত' শব্দটি অনিবার্যভাবে চলে আসে, জানি না। এমনকী অরুণ মিত্রের মতো ঘরোয়া ভালোবাসায় নিবিড় কবিও এড়াতে পারেন না ওই মর্মান্তিক শব্দের মায়াটান, তাঁর কবিতার যাবতীয় সংকেত ও আভাস অসহায় ভাবে ভেসে যায় ক্রুদ্ধ, নিহত তারুণ্যের অ্যানার্কিক ক্ষিপ্ততার লাল বন্যায়। এ-সবকিছুর ভেতরে দাঁড়িয়ে আমি কীরকম নির্ভুল শুনতে পাই জোসেফ ব্রডস্কি নামে রুশি তরুণ কবির 'শিকল' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটির বুক ভেঙে উঠে আসা রাগী গলার স্বর: 'তোমরা যদি একে বামপন্থা বলো / আমি সে বামপন্থা প্রত্যাখ্যান করি' ('বিটার হারভেস্ট' কাব্যসংকলন)।

কবিতাটির মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে একটি 'ভেঁপু-গাড়ি'। দুপাশে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাচ্চারা এই মজাদার, শব্দবাজ বাহনটিতে বসে থাকতে দেখছে কিছু আমোদ-গেঁড়েকে, পয়লা নজরে এরকম মনেও হতে পারে। কিন্তু, যা স্বভাব শিশুপালের, এখানে তার বিপরীত ঘটে যায়।

তারা গাড়িটির পেছন পেছন ছোটার আনন্দে যায় না। ফলে এই 'ভেঁপু' হ্যামেলিনের বাঁশির বিকল্পও হতে পারে না। মূঢ়, মুর্খ, নড়বড়ে ওই জরদ্গব খেলনা তাদের নয়। তারা বড়জোর ভয় পেয়ে থতমত দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্বিতীয় স্তবকের মাথায় কবি যখন পরিয়ে দেন 'সাজানো আলোর ঘের' তখন 'সাজানো' শব্দটিতে আমার চোখ আসক্ত হয়ে থাকে। মনে হয়, এ-আলো আন্তরিক বা স্বাভাবিক নয়, যার উৎসার সংকল্পবদ্ধ কাজ ও তার সফলতার ঘনিষ্ঠ তাপ থেকে। বা উলটোভাবে, প্রথম স্তবকের স্থায় থেকে ভাবতে তৈরি হয়ে যাই, অপদার্থতার অন্ধকার ঢাকবার জন্যই এত মেকি-উজ্জ্বলের উৎসব।

ভুল ভাবা হয় নি—এমন ধারণা নিশ্চিত শরীর পেয়ে যায়, যখন দেখি 'চারপাশে আচমকা ধ্বস'-এ উলটে-পড়া 'ঘরদোর বাসিন্দা'র সর্বনাশের ওপরে চূড়ান্ত, কৌতুকের প্রথায় জ্বলজ্বল করতে থাকে, 'করতেই থাকে' 'শিলান্যাসের অক্ষরগুলি'—ঝুরি ঝুরি মিথ্যে প্রতিশ্রুতির পাথরে বাঁধানো বর্ণমালা।

ঠিক তখনই, ধ্বসের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে শুনি দেশময় আর্ত মানুষের হাহাকার, 'বাতাস জুড়ে বাঁচাও বাঁচাও'। মুহূর্তে পুরাশ্রয়ী হয়ে যাই। শুনতে পাই বিপুল ঢাকঢোল কাড়ানাকাড়ার ক্যাকোফোনিতে সতীদাহের শিকার অসংখ্য কিশোরী-যুবতীর মর্মছেঁড়া, ফলহীন আর্তনাদ। বীভৎস উল্লাসের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া সত্যের অশ্রু চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামতে থাকে পাতালের শিকড়ে।

কারণ, 'বাঁচাও বাঁচাও'-এর সমান্তরালেই শুরু হয়ে যায় 'জোর ঘুরনাচ'। মানুষের সমূহ সর্বনাশের ওপর মিথ্যের পাঁয়জোর দিয়ে বাঁধানো এই তোয়াক্কাবিহীন ঘূর্ণিনৃত্য আমাকে এক লহমায় যেন টেনে নিয়ে যায় সেই ফরাসি নেপোলাইট-অভিজাতদের বল্‌রুম-এ, যাঁরা মানুষের প্রগতি ও সমাজবিপ্লবের শপথ নিয়েই রাজবংশ ও তাঁদের অনুগামীদের ঘাড়ের ওপর গিলোটিন শানিয়ে ছিলেন।

পাছে কবিতাটি একমাত্রিক হয়ে পড়ে, তাই আমাদের সমর্পিত আশার হন্তারকদের নৃত্যপর শরীর লক্ষ করে যবনিকার আড়ালে ট্রিগারে তর্জনী রাখা ভবিষ্যের কথা হয়তো সকারণেই আর উল্লেখ করেন নি কবি অরুণ মিত্র।

অমিতাভ গুপ্ত

—

‘কত যে হেঁটেছি’

কত যে আমি হেঁটেছি তার ইয়ত্তা নেই,
জোর কদমে চলবার পাকা সড়ক
তৈরিই ছিল
হাওয়ার হাততালি ছিল
আর পাতাবাহার দেখে বুঝেছিলাম
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিনোদন।
এরই নাম রাজপথ।

কিন্তু যে-দিগন্তে আমার দৃষ্টি
তা যে-তিমিরে সেই তিমিরে
আর রাস্তাটা লম্বা হতে হতে শেষ নাগ
যেন পৃথিবীটাই গিলে খাবে।

এ-রাস্তায় আর কতকাল চলা যায়?
সেই কবে থেকে হাঁটছি তো হাঁটছিই
কোনো আভাই আমাকে আদর করে না
আমার মাটিকেও না।
তবে কি ভোরের পথ
কাঁটাবনের বুকে?

‘নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫’, ‘মাঝি’

এই কবিতাটি দিয়েই শুরু হয়েছে 'নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৫' সংকলন, স্মরণিকা-অংশটির পরে উদ্দিষ্ট সংকলনের এই যথাযথ শুরু। যথার্থ শুরুও, নিশ্চয়ই। 'মাঝি' ত্রৈমাসিক কবিতা-সময়পত্রের এই বিশেষ সংকলনটি প্রস্তুত করবার সময়ে সম্পাদকমণ্ডলীর হয়তো মনে পড়ে নি, কিন্তু কোনো কোনো পাঠকের অনিবার্য মনে পড়ে যাবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার তুলনা। পলগ্রেভ তাঁর ইংরেজি গীতিকবিতার স্বর্ণ-কোষাগারের চতুর্থ অংশটি উদ্‌বোধন করেছিলেন, সমস্ত ডেকোরাম ভেঙে, কীট্‌সের লেখা চতুর্দশপদী দিয়ে। 'মাঝি'-সম্পাদকমণ্ডলীর ডেকোরাম ভাঙতে হয় নি, যেহেতু অরুণ মিত্র বয়েসের বিবেচনাতেও অগ্রগণ্য। সে যাই হোক, ডেকোরাম ভাঙুক কিংবা থাকুক, ১৯৮৫ সনের নির্বাচিত কবিতাসংকলনের এর চেয়ে নির্ভুল শুরু আর কী বা হতে পারত।

একথার অর্থ নয় যে কীট্‌সের রচনাবলিতে চ্যাপমানের হোমার-সংক্রান্ত সনেটটি যেমন বিশিষ্ট, অরুণ মিত্রের সমগ্র কবিতার প্রেক্ষিতে 'কত যে আমি হেঁটেছি' তেমন-কোনো দাবির অধিকারী। সেসব দাবিদাওয়া ও তৎসং-ক্রান্ত কূটতর্ককে সরিয়ে রেখে আমরা বরং বর্তমান রচনার ভাষাপ্রয়োগ বা প্যারোলটি লক্ষ করবার চেষ্টা করি। যে-অবয়ব এই প্যারোলকে বিধৃত করেছে তাও লক্ষণীয়। তিনটি স্তবকে সতেরোটি ছত্র। সাত-চার-ছয়: এভাবে ভাগ করা হয়েছে ছত্রগুলিকে, তিনটি অংশে। এই অবয়ব স্পষ্টত আধুনিক কবিতার লক্ষণকে মনে পড়িয়ে দেয়। 'কালোঘোড়া' কবিতাটিতে, কিংবা 'পুনশ্চ' পর্যায়ে অথবা তার আগেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, যে স্তবকে যতটুকু বলবার সেই স্তবকে ঠিক ততটুকুই বলতে হবে। গাণিতিক হিশেব মেলানোর উৎসাহ আধুনিক কবিতায় না দেখানোটাই ভালো।

হিশেব-না-মেলানোর অনায়াস সাহসে শুরু হয়েছে 'কত যে আমি হেঁটেছি', শেষপর্যন্ত বজায় রয়েছে তার গরহিশেবি অপূর্ব গঠন, কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতের আগে যা দেখা যায় নি। একে শক্তি দিয়েছে কথ্যচালের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি, স্বত-উৎসারিত মিশ্র ক্রিয়াপদ কথ্যভঙ্গিকে দিয়েছে ঘনিষ্ঠ সংলাপের আকরণ। অরুণ মিত্রের কবিতার পাঠকেরা জানেন, কথ্যভাষার প্রগতিশীল উৎস থেকে শক্তি গ্রহণ করে নিতে তিনি

সবসময়েই তৎপরতা দেখিয়েছেন। বর্তমান আলোচনাসূত্রটি তার ব্যতিক্রম নয়, বস্তুত তাঁর কোনো কবিতাই ভাষাব্যবহারের এই প্রগতিচিহ্ন থেকে চ্যুত নয়।

সচেতন, ইতিহাস ও স্বকাল উভয়ের সম্পর্কেই পূর্ণ বৈদগ্ধ্য নিয়ে কবিতা-রচনা করেছেন অরুণ মিত্র—ফলে আলংকারিক রাজশেখরের অভিপ্রেত শ্রেষ্ঠ কবির গুণ তাঁর রচনায় লক্ষ না করে উপায় নেই। বর্তমান আলোচনা-সূত্রটি অনন্য নয়, কিন্তু এর বিশিষ্টতা এখানেই যে প্রায়-ব্যবহৃত, হয়তো ঈষৎ ক্লিশেদুষ্ট, একটি থিমের প্রকল্পেও সেই গুণটি সম্পূর্ণ বজায় রইল। বাংলায়, বাংলাভাষার বাইরে, পথকে প্রধান বা অপ্রধান থিম করে, কিংবা পথহাঁটাকে প্রথম বা দ্বিতীয় রূপক মেনে অপরিমাণ কবিতা রচিত হয়েছে। রাজপথের রচনায় পাতাবাহার কিংবা হাওয়ার হাততালি যেমন অপ্রত্যাশিত নয়, ভোরের পথটিও যে কাঁটাবনের বুকে রইবে এরকম বিশ্বাস পাঠকের মনে আগে থেকেই ছিল। রাস্তার সর্পিল, মিথিকাল দীর্ঘতাও বোধহয় একেবারে অচেনা নয়। তাঁর অন্যান্য অনেক কবিতার মতো এখানেও অরুণ মিত্রের কবিকৃতি সুপরিচয়ের জগৎকে, কাব্যজগৎকে, স্পষ্টভাবে ছুঁয়ে থাকে। যে জগৎটি আমাদের সকলেরই। লেখকের, পাঠকেরও। আবহমানকাল যে জগৎটি প্রস্তুত হতে থাকে আমাদের প্রত্যয়ে অবিশ্বাসে রূপকল্পে ধ্বংসে ও পুনর্বিন্যাসে। এবং, এই কৃতির উৎসমূলে কবি অরুণ মিত্র ধীরেধীরে কবিদের শিক্ষক হয়ে ওঠেন।

'অধিকাংশ মানুষ যদি লেখাপড়ার সুযোগ না পায়, বইকেনার বদলে চালডাল কিনতেই নাজেহাল হয়, তবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কী করে হতে পারে এবং কবিরই বা বিশেষ কী ভূমিকা থাকতে পারে' বলেছিলেন তিনি ('স্বনির্বাচিত', ১৯৭০), এবং সাতবছর পরে একটি সাক্ষাৎকারে আরো জানিয়েছেন, 'যদি বামপন্থা মানে হয় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা, জীবনের সংকট সম্বন্ধে অনুভূতি, নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনা এবং তা উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, তাহলে আমায় কবুল করতেই হবে আমি বামপন্থী কবি। দলীয় রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিলে সে তো মানবিক সংবেদনার এলাকা' ('গাঙ্গেয়পত্র', অগাস্ট ১৯৭৭)। এই অরুণ মিত্রের পক্ষে সম্ভব নয় কোনো

অদৃষ্টপূর্ব কিংবা অচিন্তনীয় কাব্যজগতের সোনার মৃগ খুঁজে ফেরা। চল্লিশ বছর আগে লেখা কবিতায় যে 'শুভ্র বিশাল পুষ্পের' উল্লেখ তিনি করেছেন, এবং ভবিষ্যতে যার ফুটে ওঠার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি—১৯৮৬ সনের অক্টোবরের কবিতায় 'চারপাশে আচম্‌কা ধস' তারই মতো ভ্রান্তিহীন। পুষ্পও সত্য, ধসও সত্য। উভয়েই আমাদের অনেক চেনা। মাঝখানের চল্লিশ বছর যেন একটি ছায়া-যবনিকায় দুলে উঠছে যাকে তাঁর নির্মল হাতে সরিয়ে দিয়ে যান অরুণ মিত্রের মতো কোনো সম্পূর্ণ কবি। সেই অনেক চেনার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার আগে এবং পরে ভোরের পথ ফুটে ওঠে কাঁটাবনের বুকে। আবার আমাদের মনে পড়ে যায় একটি পুরনো কথা : সাহারায় গোলাপ ফোটাতে চেয়েছিলেন মায়াকোভস্কি। মায়াকোভস্কির অসংখ্য অপরাজেয় আইভ্যানকে যেতে হয় না কি এই কাঁটাবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

কাঁটার সঙ্গে গোলাপের অনুষঙ্গ, কিংবা রক্তগোলাপের মতো একটি ভোরের ছবি বিশদ হয়ে ওঠে নি বর্তমান আলোচনাসূত্রে। বলা ভালো, বিশদ হয়ে ওঠার কোনো প্রয়োজন হয়নি। বর্তমান আলোচনাসূত্রটি অরুণ মিত্রের কাব্যজগৎ সম্পর্কে এই ইঙ্গিত যেন অপ্রতিরোধ্য করে তোলে, 'দা লাইট ছাট নেভার ওয়াজ ইন হেভন্ অর আর্থ' নয়—মানবালোকের যে চিরকালীন আভায় কবিচেতনা ঝল্‌সে ওঠে তা-ই তাঁর জগতের চরমসত্য।

কী চেয়েছিলেন কবি ? শেষ স্তবকের প্রারম্ভিক তিনটি ছত্রের আর্তির অভিজ্ঞানে আমরা যদি চিনে নিতে চাই অরুণ মিত্রকে, তাঁর কবিস্বভাব ও পর্যটনকে, তা হলে আমাদের মনে হবে না কি পথেরই চরিত্রে ছিল বেদনা ও ক্লান্তির হেতু। পূর্বরচিত রাজপথ নয়, অরণ্য নিষ্কাশন করে নিজের শ্রমে ও মেধায় গড়ে নেওয়া পথই ছিল প্রিয়, অভিপ্রেত ? আমাদের সংশয়ে, অধৈর্যে ধীরে ধীরে মধুর হয়ে ওঠে অরুণ মিত্রের কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা। মম্মটভট্টকে ছুঁয়েও যারা মায়াকোভস্কির, আধুনিকতা পেরিয়ে উত্তর-আধুনিকের, তাদেরও প্রয়োজন এই অভিজ্ঞতা। 'কাব্য-ব্যাপারে অলৌকিক মহিমার ফলে অরমণীয় পদার্থও রমণীয় পদার্থে পরিণত হয় ; অহৃদ্য বস্তুও অলৌকিক আহ্লাদ উৎপন্ন করে।' অলৌকিক কোনো মহিমার প্রয়োজন

নিশ্চয়ই নেই অরুণ মিত্রের, তবু তাঁর পাঠক যথার্থ জেনেছেন অরমণীয়কে রমণীয় করে তোলার অভিজ্ঞতার স্বরূপটি। লোকোত্তর নয়, লোকায়ত এই পর্যটনচর্যা কয়েক দশকের কালসীমায় মেলেছে নিজেকে—আসন্ন কয়েকটি যুগের জন্য বাংলা কবিতার পটভূমি রচনা করে দেবে বলে। তিনি, কিংবা তাঁর মতো ঋত্বিকের কাছে, দ্বন্দ্বে ও দ্বিধায় দৃঢ় হতে হতে পথের অরমণীয়তাই শিল্পশ্রী অর্জন করে। ক্লেদমলিন, ধ্বস্ত এই জীবন! ভাবলে অবাক হতে হয় শ্রেণীগত অবস্থান ও সামগ্রিক সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন একজন লেখককে কী অপরিসীম গ্লানি সইতে হয় সারাজীবন। সেই গ্লানির উপর দাঁড়িয়ে, শেষ নাগের বিকট হাঁ-মুখের দিকে তাকিয়ে, একজন লেখক ধীরে ধীরে অরুণ মিত্র হয়ে ওঠেন। পাঠকের রসনির্বৃতির কোনো বৈকল্যও ঘটে না।

ভাস্কর চক্রবর্তী

—

'এখন দ্যাখো'

ট্রামের দুনম্বর থেকে আমরা
গান ছড়ালাম,
আমাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছিল
যেন সমুদ্রের ঢেউ,
তখন বেশ রাত হয়েছে
আমরা ভাবলাম এই তো আমাদের হৃদয়
অদৃশ্য তরঙ্গে ভেসে চলল,
আমরা জানলা দিয়ে দেখি নি
গান ঝাঁপিয়ে পড়ল কিনা রাতের গভীরে
কিংবা কোন দরজায় গিয়ে ডাক দিল,
কত দূরে পৌঁছল সে-খোঁজও আমরা নিই নি।
ট্রামের কামরার হাওয়া
পৃথিবীর ফুসফুসে খেলছে যেন,
আমরা তাই দারুণ একাত্ম হয়ে
দৃষ্টিতে বাঁধলাম অনেক দূরের দিনগুলো।
আমরা বুঝতেও পারি নি
আমাদের পাঁজরার হাড় ঘুনে খাওয়া
আমরা টেরও পাই নি আমাদের হাত
হন্তারক হবে ব'লে উঠে আছে।

দ্যাখো কত ছিন্নভিন্ন কথা এখানে ওখানে
দ্যাখো চারদিকে কত খিল-আঁটা ঘর
দ্যাখো রাস্তার ধার ঘেঁষে চুপিসাড়ে হাঁটা
দ্যাখো চোখে-মুখে উপ্‌চোনো গরল।

'প্রতিক্ষণ', শারদীয় ১৩৯২

এই স্তব্ধতায় চুপচাপ কে আসে
ফসলফলানোর কথা বলে ?

কোনো কবিকে অস্বীকার কবতে লাগে দুচার মিনিট, স্বীকার করতে বোধ-হয় বেশ কয়েকবছর লেগে যায়। আজ এই সিন্থেটিক কবিতাচর্চা আর মসৃণ মন্তব্যচর্চার দিনগুলোয় যখন একটু মুষড়েই পড়তে হয়, অরুণ মিত্রকে তখন আমাদের আরো বেশি করে মনে পড়ে। আমরা যারা কবিতা পড়ি, কে না জানি, বাস্তবতা যেখানে বিষাদনীল, কয়েকজন কবি কথা বলা শুরু করেন প্রায় সেখানে থেকেই। তাঁর প্রথম বয়সের বেশকিছু কবিতা অবিখ্যাত হলেও যদি মনে পড়ে আমাদের, আমরা দেখতে পাব একটা ঋজু আলোকরেখা বরাবরই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে : 'এবার কপালে / চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার : / অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার'।—এসব, তা অনেকবছর আগের কথা-বলা। সেই দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের শুরুতেই। —তারপর ? তারপর কোন্ সময় এসেছে আজ, কোন্ সময়কে আলো জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছি আজ আমরা ?

সময় যা এসেছে, আমাদের রক্তে যেন তার অনবরত ফিসফিসানি শুনি : 'ভূমিকম্পের আব দেরি কত ?' যুদ্ধ আর দেশভাগ আর আবার যুদ্ধ-আশঙ্কায় ভরা এই শতাব্দীর শেষ বছরগুলো থমথম করছে এখনো! যে স্বয়ংক্রিয় আনন্দ কবিদের রক্তে ভেসে থাকে তারাই রাস্তাঘাট আর জানালা থেকে মাথায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে ঘরবাড়ির টুকরো দৃশ্য, মুখের টুকরো মিছিল, আর নিরুপায়ভাবে এসে পড়ে তখনই সময়, আমাদের এই ভাঙা পৃথিবীর নিরুজ্জ্বল ভাঙা-সময়, আর আমরা জেগে উঠতে দেখি তখনই চুপসে-যাওয়ার মতো এক বেদনাবোধ যা কবিদের গানগুলোকে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দেয়।

চারপাশে যখন তাকিয়ে দেখি, স্বীকার করছি যে বিস্মিত হতে হয়, সার্থক প্রকাশভঙ্গিতে পৃথিবীর দু-চারজন প্রেমিক কবিরাই, কবিরাই এখনো আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন কোথায় অবিচার, অন্ধকারই বা কোথায়, কোথায় দমবন্ধকর আবহাওয়া আর আমাদের দুয়োরানীর সেই শিশির-ফুটফুট ছেলে ভালোবাসাই বা কোথায়। আমাদের ভাষায়, অরুণ মিত্র, সেইসব কবিদের নিশ্চয় প্রথম-সারির একজন।

...

আমি শুধু জানি আমি এক তাপের মণ্ডলে থাকি
আর আমার রাতের বিছানায় কাঁটা গজায়

সারল্যের মতো জটিল বোধ হয় আর কিছুই নয়। আপাতনিরীহ এই কবিতাটির শরীর বেয়ে হাজার শাখা-প্রশাখার জটিলতা ছড়িয়ে, ঘুরে, নেমে গেছে যেন কোথায়! শহরজাত এই কবিতাটি পড়লে আমরা লাইন থেকে লাইনে সরতে-সরতে প্রথমেই স্পর্শ পাই এক থমকানো আনন্দের যা ভারি গাঢ় এক ব্যাপ্ত-বিষণ্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ট্রাম [হায়, ট্রাম] এবং দুনম্বর, প্রথম দুটো শব্দ থেকেই পর্দা দুপাশে সরতে শুরু করেছে—মঞ্চ প্রস্তুত—দুনম্বর, যা এখনও কেড়ে নিতে পারে নি সজীবতা, বেঁচে-থাকার আর জীবনকে অনুভব করার গান, আনন্দ—'তখন বেশ রাত হয়েছে···', রাত্রির রূপরহস্যে কোন কবি না মুগ্ধ? রাত্রি যেন মা-র হাতের আলতো ছোঁয়া, যেন সুন্দর পাখির সেই শব্দহীন ডানা মেলা, কোন কবি যেন বলেছিলেন: রাত্রি হচ্ছে কবিদের আর একটা দেশ! কবিতাটির এই অংশে পরপর লাইনগুলোর সুন্দর অভিনব গঠনভঙ্গি আমাদের আরো টানে—যে টান অবশ্যই হ্যাঁচকা নয়, যাতে সামান্য কোমলতা মিশে রয়েছে।

—ট্রাম চলেছে, ঘরের দিকে না স্টেশনের দিকে তা নিয়ে নিশ্চয় আমরা সময় নষ্ট করব না কেননা দুটোর গন্তব্যস্থল তো একই বিন্দুতে যখন ঘর আর পথ ভালোবাসায় একাকার। এখানে আর একটু কথা বলার প্রয়োজন পড়ছে—ভালোবাসার গান ভালোবাসার জন্যে, একটু টোকা-দেওয়ার জন্যে। হিসেবি যাঁরা, তাঁরা এখানে দরদাম কষেন একটু। তাঁদের

ভাবখানা অনেকটা এইরকম : কী হে, তোমাকে যে টাকাটা দিয়েছিলাম ঠিকঠাক কাজে লাগছে তো ? আর কে না জানে, এঁরাই টাকা জমান, কেননা এঁদের কোনো মৃত্যুবোধ নেই।—আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করি, গান গাওয়াই এখানে তাঁর আনন্দ, তিনি জানতে তত আগ্রহী নন সেই গান কোথায় গিয়ে ডানা মুড়ল।

আমাদের কবিতা এখন মর্গ থেকে সেলুন পেরিয়ে আরো কিছু দূরে ভ্রমণ করতে চাইছে। সেই কিছু-দূরের একটা সুন্দর ছবির মধ্যে এবার আমরা আস্তে-আস্তে ঢুকে পড়ছি। ট্রামের কামরাই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর miniature। সহযাত্রীরা আত্মীয়সমান। কিন্তু ভালোবাসাহীন এক ভয়াবহতার অন্ধকারে আমাদের আর আছেই বা কী দাঁত আর নখের এই পৃথিবী ছাড়া ? আত্মীয়রা এখন হয়ে উঠেছে, একে অপরের শত্রু—দাঁত আর নখের এই পৃথিবী কথাবার্তা শুরু করে আসর জমিয়ে বসেছে।

নিশ্চয়, এক মিনিট নীরবতা এখানে। শেষ স্তবকের শেষ চার লাইনের আগে যখন আনন্দ এসে দুঃখের হাত ধরেছে। ক্যানভাস প্রায় তৈরি ছিল। এবার শোনা যাচ্ছে যেন পুলিসের ভারি বুটের শব্দ। যেন-বা বেয়নেটের খোঁচা। —বড় কবির মধ্যে হয়তো এক মাতৃহৃদয় লুকিয়ে থাকে। সামান্য অন্ধকারও তাঁকে দুঃখিত করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার ভাঙা কিছু অন্ধকারের ছবি। মনে পড়ছে পল সেলানকে, বিশেষত তাঁর সেই বিখ্যাত লাইন : 'He speaks truly who speaks the shade'।—কবিতাটিকে শাদা তুবড়ির মতো উপরে উঠে আমরা ছড়িয়ে পড়তে দেখেছিলাম প্রথম স্তবকে। এখন দেখছি তাকে ঝরে পড়তে তার আলোর সুন্দর ফুলকিগুলো সমেত। আর এখন, বেশ একটু বিষণ্ণভাবেই। সেই আনন্দস্বর এখন উধাও। হাড়জিরজিরে সময় এখন মুখের পর্দা সরিয়ে তার অর্ধনগ্ন মুখ দেখাচ্ছে। আর টুকরো-টুকরো আয়নায় যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের নিজেদেরই টুকরো-টুকরো মুখ !

পৃথিবীর দক্ষিণা বাতাস কি এইভাবে
দীর্ঘশ্বাস হয়ে যায়
এইভাবে ?

অধিকাংশ কবিতাই অরুণ মিত্রের গদ্যে লেখা। অন্ত্যমিল তো ইদানীং নেই-ই। তবুও ছন্দ তো থেকেই যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, থেকে যাচ্ছে একটা দোলানি। এই কবিতাটিও পড়ে যদি তা আমাদের অসুবিধে হয় বুঝতে তাহলে সাহস করে কীভাবেই বা আর বলব—গদ্যে লেখা এই কবিতাটি একটি অনুভূতি-সংগীত।

ভেবেছিলাম আপত্তি তুলব, কবিতার নামটা এমন দায়সারা গোছের কেন, বিশেষত যখন আমরা জানি, কবিতার নামকরণও কবিতা লেখার একটা অংশ। কিন্তু অরুণ মিত্রের কবিতার সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, তাঁর কবিতার কবিতাময় নাম স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে, নাম-গুলোকেও তিনি সহজভাবে গদ্যের দিকে একটু সরিয়ে দিয়েছেন।

কবিতাটি রহস্যজনকভাবে তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে নেই। মহৎ কবিতার থেকে কবিতাটি একটু কম, এরকম হয়তো ভাবতেও পারেন তিনি. কিন্তু কবিতাটি যে চমৎকার কবিতার থেকে হাজার গুণ বেশি সেকথা ভাবতে তো আমাদের কোনো বাধা নেই?